আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
১৯৯২

মূল্য : ৭৫.০০

2307 B—প্রথম সংস্করণ—১৯৮২

PRINTED IN INDIA
PRINTED AND PUBLISHED BY PRADIPKUMAR GHOSH
SUPERINTENDENT, CALCUTTA UNIVERSITY PRESS
48, HAZRA ROAD, CALCUTTA—700019.

"Let knowledge reach the ignorant mind as air goes to the tired lungs and water the parched lips." — Sir Asutosh

"WHO HAS DEVELOPED THE UNIVERSITY OF CALCUTTA INTO A TEACHING UNIVERSITY AND HAS THUS HELPED TO REALISE IN A LARGE MEASURE THE INSPIRING MESSAGE OF OUR GRACIOUS SOVEREIGN,

WHO HAS FURNISHED THE WILL AND FOUND THE WAY TO ACHIEVE THIS END BY THE ESTABLISHMENT OF THE UNIVERSITY LAW COLLEGE, THE FOUNDATION OF THE UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE, THE ORGANISATION OF THE UNIVERSITY CLASSES FOR POST-GRADUATE STUDIES, THE CREATION OF THIRTEEN UNIVERSITY CHAIRS, THE EXTENSION OF THE UNIVERSITY BUILDINGS AND THE EXPANSION OF THE UNIVERSITY LIBRARY,

WHO HAS BROUGHT THE STUDENT OF THIS UNIVERSITY INTO PERSONAL CONTACT WITH MASTER-MINDS FROM FOREIGN LANDS AND HAS STIMULATED ORIGINAL RESEARCH BY INDIAN SCHOLARS,

WHO, BY HIS BRAHMANICAL ENTHUSIASM AND UNSELFISH DEVOTION, HAS ATTRACTED MAGNIFICIENT GIFTS FROM PRIVATE INDIVIDUALS AND GENEROUS GRANTS FROM PUBLIC FUNDS FOR THE EXECUTION OF HIS SCHEMES, AND HAS THUS ENABLED HIS ALMA MATER TO FULFIL HER DESTINY,

WHO, KNIGHTED BY HIS EMPEROR, HAS PROVED HIMSELF A TRUE AND VALIANT KNIGHT IN THE SACRED CAUSE OF THE ADVANCEMENT OF LEARNING AND THE DISSEMINATION OF KNOWLEDGE, AND HAS CARRIED OUT THE MANDATE OF HIS SOVEREIGN TO EFFECT A FUSION OF THE CULTURE AND ASPIRATIONS OF EUROPEANS AND INDIANS,

WHO HAS BEEN THE BRAIN OF THE NEW CONSTITUTION OF THE UNIVERSITY AND HAS WITH DISTINGUISHED ABILITY PLAYED THE PART OF A JESSEL IN ITS INTERPRETATION AND ADMINISTRATION, AND

WHO, WHILE HE HAS WITH FEARLESS COURAGE UPHELD LAW AND DISCIPLINE, HAS BEEN EVER READY TO REDRESS GRIEVANCES, AND HAS THUS EXHIBITED IN THE UNIVERSITY, AS HE DOES ELSEWHERE BY HABIT, THE ENDLESS RESOURCES OF JUSTICE."

[আশুতোষের প্রিয় ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের যৌথ উদ্যোগে দ্বারভাঙ্গা সৌধের সোপানাবলীর শীর্ষদেশে স্থাপিত ও অধুনা বেদীচ্যুত আবক্ষ মর্মরমূর্তির পাদদেশে ক্ষোদিত]

ভূমিকা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা এবং বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা—মূখ্যতঃ এই দু'টি বিষয় অবলম্বনে বর্তমান গ্রন্থের অবতারণা। আশুতোষের জীবন ও কীর্তিকাহিনী নিয়ে অজস্র লেখালেখি হয়েছে পত্রপত্রিকা পুস্তকাদিতে। তবে যে সমস্ত তথ্য লোকলোচনের অন্তরালে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট সিণ্ডিকেটের কার্যবিবরণীর জরাজীর্ণ পাতায় বিধৃত থেকে ক্রমাবলুপ্তির পথে এগোচ্ছে, মূলতঃ সে সবের উপর ভিত্তি করেই আলোচ্য বিষয়কে পরিস্ফুট করে তুলতে চেষ্টা করেছি।

শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে আজীবন সমর্পিতপ্রাণ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে দু'টি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। প্রথমতঃ, এই শিক্ষানায়কের ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবন এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত যে, তার একটি থেকে আরেকটি আলাদা করে দেখা কিংবা লেখা সত্যিই দুরূহ। সব সময় সতর্ক থাকতে হয়, শিক্ষাগুরুর শিক্ষাচিন্তার পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন না হয়ে, তা তাঁর গতানুগতিক জীবনকাহিনীতে পর্যবসিত হয়ে না পড়ে যেন।

দ্বিতীয়তঃ, আশুতোষ শিক্ষা সম্পর্কে কেবলমাত্র বাণী দিয়ে দায় সারেন নি। তিনি ছিলেন একাধারে চিন্তাবিদ ও প্রয়োগবিদ ; কল্পনা ও কর্মকুশলতার এক অত্যাশ্চর্য আধার। তিনি তাঁর চিন্তাধারাকে যথাসম্ভব হাতে কলমে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা বহুক্ষেত্রে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িয়ে ছিল। তাই উপাচার্য হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার নীরস রোজনামচা যেন আলোচনার উপর বেশী পরিমাণে ছাপ ফেলতে না পারে, সেজন্যও যথাসাধ্য সতর্ক থাকতে হয়েছে।

এই উভয় ধরনের সম্ভাব্যতা যথাসম্ভব এড়িয়েই বক্তব্য উত্থাপন ও বিশ্লেষণ করতে হয়েছে। বক্তব্যের সমর্থনে অন্যান্য লেখক ও ভাষ্যকারদের টিকাটিপ্পনী মন্তব্যের উপর অতিরিক্ত নির্ভর না করে, স্বয়ং আশুতোষের বক্তৃতা ও রচনা থেকেই প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে প্রচুর পরিমাণে।

এই দেশের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও হিতকরী শিক্ষা ব্যবস্থা এবং শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অভিমতে এক আশ্চর্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। শিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগর তাঁর চিন্তাধারা ব্যক্ত করেন ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কৃত কলেজ পুনর্গঠন প্রশ্নে ও ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রসঙ্গান্তরে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-চিন্তার পরিচয় মেলে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'পত্রসূচনা' প্রবন্ধে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে। আর আশুতোষ তাঁর 'গুরু' স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমতে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে যখন সিনেট প্রস্তাব মাধ্যমে তাঁর শিক্ষাচিন্তার প্রথম রূপরেখা তুলে ধরেন, বিদ্যাসাগর তখনো জীবিত এবং আশুতোষের প্রস্তাবে সাগ্রহ সমর্থন জানান স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র।

জনশিক্ষার প্রশ্নে বাংলার শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের এই দুই মহান দিক-পালের চিন্তাধারার ছায়া আশুতোষের চিন্তাধারার মধ্যে বিশেষভাবে প্রতিফলিত। বিশেষতঃ শিক্ষাপ্রসার, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি, জাতীয় মর্যাদাবোধ, ঐতিহ্যপ্রীতি, আদর্শনিষ্ঠা, কর্তব্যসচেতনতা প্রভৃতি প্রশ্নে বিদ্যাসাগরের স্নেহধন্য আশুতোষ ও স্বয়ং বিদ্যাসাগরের মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য বিস্ময়কর। বিদ্যাসাগর ও রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে বিশদ আলোচনা হয়েছে ; কিন্তু 'intellectual giant' তথা গগনস্পর্শী প্রতিভার অধিকারী আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা তাঁর উপাচার্য পদের গুরুভারে চাপা পড়ে গেছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক ধন্যবাদ যে, তাঁরা এই মহান শিক্ষাবিদের শিক্ষাচিন্তা নিয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনার সুযোগ দান করেছেন।

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার আলোচনা প্রসঙ্গে বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা সঙ্গত কারণেই এসে পড়ে। কারণ, বিষয়টি পরস্পর সম্পৃক্ত শুধু নয়, একই চিন্তাধারা সম্ভূতও বটে। ভার্ণাকুলার অর্থাৎ মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা শুধু অগ্রগণ্য নয়, অদ্বিতীয়ও বটে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শ' পঁয়ত্রিশ বছরের ইতিহাসে ভাষা নিয়ে যে বাকযুদ্ধ মসীযুদ্ধ চলেছে, তা অনেক অসিযুদ্ধের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই বিগত দেড় শতাব্দীর অধিক কাল ধরে বাংলার কোন মনীষীই ভাষা-বিতর্কে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে পারেন নি।

কোন দেশে মাতৃভাষাকে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠ্য বিষয় হিসেবে এবং শিক্ষা ও পরীক্ষার বাহনরূপে স্বীকৃতি আদায় করতে শতাব্দীর অধিককাল ব্যাপী এমন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে প্রবৃত্ত হতে হয় নি। দেশী বিদেশী প্রবল প্রতিরোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে যাঁরা বাংলা ভাষার স্বীকৃতি ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সেই সংগ্রামের ইতিহাস অনেকের জানা নেই। যদি তার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কখনো রচিত ও প্রকাশিত হয়, তবে তা রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসের পাশাপাশি সাহিত্য-সংস্কৃতির সংগ্রামের ইতিহাস রূপে স্থান পাবার যোগ্য গৌরবের বস্তু বলে বিবেচিত হবে।

ভাষা আন্দোলন বলতে বর্তমান কালে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী প্রাক্তন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ছাত্র আন্দোলনের ও চারজন ছাত্রের শহীদত্ব বরণের কথাই সকলের মনে জাগে। ঐ দিনের স্মৃতিতে প্রতি বছর পশ্চিমবঙ্গেও নানা সভা সমিতিতে অনেকেই সাতকাহন কথার জাল বুনে থাকেন। তাঁরা কিন্তু অর্থপূর্ণ কারণে ১৯৬১ সালের ১৯শে মে আসামে কাছাড় জেলায় তদনুরূপ ভাষা আন্দোলন ও এগার জন যুবকের শহীদত্ব বরণের কাহিনী বেমালুম ভুলে যান। এবং গত শতাধিক বছর ধরে বাংলা ভাষার পক্ষাবলম্বন করে যাঁরা প্রথম দিকে সংস্কৃত-আরবি-ফারসী এবং পরে ইংরেজির বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম চালিয়ে তিলে তিলে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করে গেছেন, সে সব মাতৃভাষা-প্রেমীদের কথা কারো মনেই পড়ে না। আত্মবিস্মৃত জাতি আর কাকে বলে!

যে বিশ্ববিদ্যালয়কে ঘিরে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার উন্মেষ বিকাশ ও প্রয়োগ ঘটেছে তার প্রথম উপাচার্য প্রথম সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন—

"We are planting a tree of slow growth. The plant is young and tender, and obstructed by weeds and brambles. But it is healthy, and if carefully tended, will, by God's blessing, become a goodly tree and overshadow the land."

(Sir W. J. Colvile, 11. 12. 1858)

কোলভিলের এই আশা পূর্ণ হতে লেগেছিল প্রায় ৫০ বৎসর। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রোপিত চারা গাছটি এত দীর্ঘকাল পুঁইয়ে পাওয়া রোগীর মতো ধুঁকছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরতেই যেন যাদুস্পর্শে তার জড় দেহে যৌবনের জলতরঙ্গ বেজে উঠল। তাঁর সযত্ন লালন পালনে শিক্ষা-চারাটি মহামহীরুহে পরিণত হল এবং ফলেফুলে

ছায়ায় চারদিক পরিব্যাপ্ত করে তুলল অচিরকাল মধ্যে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর যথাক্রমে সতীদাহ প্রথা রদ এবং বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাংলার অচলায়তন সমাজে চেতনার বুদ্‌বুদ্‌ তুলেছিলেন; আশুতোষের উদার শিক্ষানীতির প্রবল ধাক্কায় বাংলার সমাজ-জীবনের ভিতেই প্রচণ্ড নাড়া দিয়েছিল, সাড়া জাগিয়েছিল। বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষা ও মনীষীদের সমাবেশ ঘটল বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। নবীন মনীষার সফল বিকাশের পথ বেঁধে দিলেন আশুতোষ। বাংলায় মননশীল বুদ্ধিজীবি শ্রেণী সৃষ্টিতে, বৃহত্তর বিশ্বে তাঁদের চারণক্ষেত্র তৈরীতে আশুতোষের অবদান অনস্বীকার্য। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে বাংলার বিদগ্ধ সমাজের সকৃতজ্ঞ স্বীকৃতি :—

"১৯১৮ সনের কথা মনে পড়িতেছে। আমি তখন একদিন আমেরিকার নিউইয়র্কে পাবলিক লাইব্রেরীতে ইয়াঙ্কী, বিলাতী, ফরাসী, জার্মান পত্রিকা ঘাঁটিতেছিলাম। হঠাৎ ঐসব বিদেশী পণ্ডিত-পরিষদের মুখপত্রে বাঙ্গালীর লেখা আমার চোখে পড়িল। বাঙ্গালীর লেখা আমেরিকা-ইংলণ্ডের কাগজে বাহির হইয়াছে—একথা ভয়ানক আশ্চর্য বোধ হইল। তাও আবার একটা দুটা নয়। বছরের মধ্যে এই ধরনের গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রায় দশ-বারটা। তখন দেখিতে আরম্ভ করিলাম, কোন্ তারিখের জিনিষ এসব। হিসাব করিয়া দেখা গেল যে, মোটের উপর ১৯১৬-১৭ সনের পেছনে এ জিনিস ঠেলিয়া দেওয়া যায় না। ঐ সময় হইতে বাঙ্গলাদেশ জ্যান্তভাবে দুনিয়ার সঙ্গে ভাবের আদানপ্রদান করিতে চাহিয়াছে। এই যুগটাই আশুতোষের যুগ। ১৯১৫ কি ১৬তে এর পত্তন। * * * বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাঙ্গালী জাতের অতিবড় দুরাকাঙ্খা প্রচার করিয়াছে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার আসল এবং সকলের সেরা উৎস হইতেছেন আশুতোষ।" (নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার)।

আশুতোষের আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে স্তম্ভিত মুহ্যমান দেশবাসীর মর্মবেদনার যে বাঙ্ময় প্রকাশ ঘটেছিল সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় কলমে, তাতেও পূর্বোক্ত উক্তি সমর্থিত :—

"বাংলার ইন্দ্রপাত হইয়াছে; বঙ্গজননীর কণ্ঠহারের অত্যুজ্জ্বল মধ্যমণি খসিয়া পড়িয়াছে; বাঙালী জাতির গৌরব সূর্য মধ্যাহ্ন আকাশেই অস্তমিত হইয়াছে। বাংলার আশুতোষ, বাঙালীর আশুতোষ আর নাই। ···আশুতোষ যে বাংলা ও বাঙালীর কি ছিলেন, তাহা আজ লিখিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার প্রতিভা এত বহুমুখীন ছিল, বুদ্ধি ও মেধায় তিনি সাধারণ বাঙালীর

এত ঊর্ধ্বে ছিলেন, তাঁহার কার্যক্ষেত্র এত বিস্তৃত ছিল, তাঁহার ব্যক্তিত্ব এমন বিরাট ও বিশাল ছিল যে, সামান্য সংবাদপত্রের একটি প্রবন্ধে তাহা বুঝাইবার মত নহে। বর্তমান যুগে যাহারা বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতিকে গঠন করিয়াছেন, বাঙালীর নাম দেশ-বিদেশে প্রখ্যাত করিয়াছেন, জগতের সমক্ষে বাঙালী জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছেন—আশুতোষ তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। যতদিন বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন আশুতোষের নামও অক্ষয় হইয়া থাকিবে।" (আনন্দবাজার পত্রিকা—১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১)

আর আশুতোষ তাঁর নিজের সম্পর্কে কি বলেছেন ? আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন কথাচ্ছলে তাঁকে একবার বলেন—"আপনি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় অচল—কায়াহীন ছায়া মাত্র।" উত্তরে আশুতোষ বলেছিলেন—"বিশ্ববিদ্যালয় আশু মুখুজ্যে থেকে ঢের বড়ো ; আশু মুখুজ্যে একদিন না একদিন মরে যাবে কিন্তু বাঙালী জাতি যতদিন টিকে থাকবে, ততদিন এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যমান থাকবে।"

তাঁর সর্বশেষ সমাবর্তন ভাষণেও আশুতোষ এই বক্তব্যেরই পুনরাবৃত্তি করেছেন :—

"No human institution is so permanent as a University. Dynasties may come and go, politlcal parties may rise and fall, the influences of men may change, but the University go on for ever as seats of trust and power, as free fountains of living waters and as undefiled alta:s of inviolate Truth. ...Councils will come and go ; Ministries will blossom and perish ; parties will develop and disappear or change their nature and survive. But your University, my University will live on for ever.." (Convocation Address, 16. 2. 1923)

বিশ্ববিদ্যালয়ের অবিনশ্বরতা সম্পর্কে এমন চরম সত্য এদেশের আর কারো মুখে শোনা যায় নি।

'আশুতোষ পদক'-এর জন্য পেশ করা গবেষণাপত্রের আমূল পরিবর্তন পরিবর্ধন করে বক্ষ্যমান গ্রন্থটি রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে আশুতোষের উপর এ ধরনের পুস্তক প্রকাশন এই প্রথম। আশুতোষ চরম সঙ্কটকালে দুই দফায় বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরেছিলেন। বর্তমানেও বিশ্ববিদ্যালয় নানাবিধ সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন। এই প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিশ্ববিদ্যালয়

কর্তৃপক্ষ যে বইটি প্রকাশ করতে স্বীকৃত হয়েছেন, তজ্জন্য আমি 'প্রেস ও পাবলিকেশন' কমিটির সকল মাননীয় সদস্যকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানাই।

বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়ের তরুণ ও উদ্যোগী সুপারিণ্টেন্ডেণ্ট শ্রীপ্রদীপকুমার ঘোষ সমেত সকল সহকর্মী বন্ধুরা যে দ্রুততার সঙ্গে এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য সমাধা করেছেন, তার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁদের আন্তরিকতাকে খাটো করতে চাই না।

আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন নগণ্য সেবক; বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্নে প্রতিপালিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মজীবনকে আমি কখনো গতানুগতিক চাকুরী বলে মনে করি নি। এই গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্নের ঋণ শোধ নয়, ঋণ-স্বীকৃতি মাত্র।

অনবধানতাজনিত ভুলত্রুটি সংশোধনের আশা রইল ভবিষ্যতে।

সিনেট হাউস
ডিসেম্বর, ১৯৯২

দীনেশচন্দ্র সিংহ
সহকারী নিবন্ধক
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

সূচীপত্র

শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা খণ্ড

উন্মেষ পর্ব

বিকাশ পর্ব

রূপায়ণ পর্ব

শিক্ষার মাধ্যম খণ্ড

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টা খণ্ড

উন্মেষ পর্ব

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-বিশ্ববিদ্যালয় কালে শিক্ষা ব্যবস্থা

ব্রিটিশ শাসনের প্রারম্ভে শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা—প্রাচীন ধারার শিক্ষার প্রতি নতুন শাসকশ্রেণীর দৃষ্টিদান—কলিকাতা মাদ্রাসা ও বারানসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা—আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বেসরকারী ভাবনা চিন্তা—ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপন—সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা বিষয়ে দায়িত্ব ও চেতনার উন্মেষ—শিক্ষার জন্য অর্থ বরাদ্দ—বেসরকারী প্রচেষ্টায় হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা—প্রথম সুনির্দিষ্ট শিক্ষানীতি ঘোষণা—মেকলের মন্ত্রণা—সমাজে নতুন শ্রেণীর উদ্ভব—উডস্ ডেচপ্যাচ—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব—১৮৫৭ খ্রীঃ ২৪ জানুয়ারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম।

*　　*　　*　　*

আধুনিক শিক্ষার পটভূমি

আমাদের দেশে শিক্ষা চিন্তা, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিক্ষা সমস্যা, শিক্ষার মাধ্যম ইত্যাদি যে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে গেলেই যে শিক্ষার কথা মনে পড়ে, তা হল এদেশে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার পর, নতুন শাসকগোষ্ঠী নবলব্ধ রাজত্বে যে ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন, সে শিক্ষার কথা। ইংরেজ শাসনের আগে অপর কোন শাসক কর্তৃপক্ষই প্রজাসাধারণের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছিলেন বলে জানা যায় না। সেটা তাদের কাছে কোন সমস্যাও ছিল না। তখন ধর্মীয় ক্রিয়াকর্মের মন্ত্র-তন্ত্রাদি ছিল তালপত্রে বা তুলট কাগজে হস্তলিখিত পুঁথিপত্রে আবদ্ধ; এবং ধর্ম-ব্যবসায়ীদের করায়ত্ত ও উত্তরাধিকার সূত্রে বংশধরদের নিকট হস্তান্তরিত। তখন ছাপাখানা ছিল না, ছিল না মুদ্রিত পুস্তক। গ্রাম্য গুরুমহাশয়গণ ছাত্রদের বর্ণপরিচয় শেখাতেন, হস্তাক্ষর লেখাতেন কলাপাতায় তালপাতায়। ইংরেজ আমলের প্রথম দিকে বাংলা দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল নিম্নরূপ :

"When the British began to talk about education in India there were three types of educational institutions in Bengal—the

tols or Colleges of Sanskrit learning, *madrasas* or seminaries which taught Arabic and Persian, *pathsalas* and *maktabs* which may be described as elementary schools. The number of elementary schools in Bengal and Bihar was perhaps about a lakh. But the education imparted, being limited to reading and writing and to accounts, tended rather to narrow the mind than enlarge the understanding. They had no printed books and scarcely any manuscript in prose. ....In later years it was said of the elementary school teachers—the *gurumahasayas*—that many of them were as "ignorant as owls". But when all is said it cannot be denied that there was a tendency to education to certain degree throughout the whole country".[১]

অর্থাৎ যখন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে শিক্ষা নিয়া কথাবার্তা শুরু করেন, তখন বাংলাদেশে তিন ধরণের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ছিল,—সংস্কৃত শিক্ষার জন্য টোল, আরবি ফার্সীর জন্য মাদ্রাসা এবং প্রাথমিক শিক্ষার জন্য পাঠশালা ও মক্তব। একমাত্র বাংলা ও বিহারেই প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল প্রায় এক লক্ষ। কিন্তু যে শিক্ষা দেওয়া হতো তা কেবলমাত্র পঠন, লিখন ও গণনা শিক্ষায় সীমাবদ্ধ থাকার ফলে পড়ুয়াদের বোধশক্তি বিকাশের চেয়ে মানসিক সংকীর্ণতাই বৃদ্ধি পেত। সেকালে কোন মুদ্রিত পুস্তক ছিল না। এবং গদ্যে কোন পুঁথি ছিল না বললেই চলে।··· প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অর্থাৎ গুরুমহাশয়দের অনেকেই 'পেঁচার মতন নির্বোধ' ছিলেন বলা যায়। কিন্তু তবুও এটা অস্বীকার করা যায়না যে সারা দেশে শিক্ষা লাভের একটা আগ্রহ সাধারণের মধ্যে বর্তমান ছিল।

সেকালে যিনি বা যাঁরা দেশ শাসন করতেন, তাঁদের ভাষাই ছিল রাজ-ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা। যারা রাজসরকারে কাজ কর্মে নিযুক্ত থাকত, বা তার জন্য অভিলাষী হতো শুধুমাত্র তারাই সে ভাষা শিক্ষা করত। বৃহত্তর জন-সাধারণের জীবন ও জীবিকার সাথে তার তেমন কোন যোগাযোগ ছিল না। সুতরাং সে ভাষা শেখার সর্বজনীন প্রয়োজন দেখা দেয়নি। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার দীর্ঘকাল পরেও যখন ফার্সী আইন আদালতের ভাষা হিসেবে প্রচলিত ছিল, তখনকার পরিসংখ্যান থেকেই এই সত্য প্রমাণিত হবে—

> "The Persian language was still the language of the law courts and of revenue administration. With the Muslims

---

১. Hundred Years of the University of Calcutta.

this language was associated with a proud ancestry and a past dominion. But as the Persian language was for long in official use those who learnt Persian as the language of the books of correspondence and accounts, were, in the five districts surveyed by William Adam in 1835, in the proportion of 2,087 Hindus to 1,409 Mohammedans."[২]

সমাজ জীবনে ইংরেজ শাসনের শিকড় বিস্তার

দেশের শিক্ষাক্ষেত্রে এরকম অবস্থার পটভূমিতে ১৭৫৭ খ্রীঃ পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলস্বরূপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হস্তচ্যুত ও ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয়। কোম্পানীর আমলের প্রথম পঞ্চাশ বৎসরাধিক কালে তো রাজ্য বিস্তার, বাণিজ্য বিস্তার এবং মুনাফা লোটার দিকেই শাসকগোষ্ঠির ষোল আনা দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে। আকস্মিক ঘটনাচক্রে এই সোনার দেশের অতুল ঐশ্বর্যের সন্ধান পেয়ে ন্যায় অন্যায় যে কোন উপায়ে অর্থ সম্পদ আহরণ অপহরণ এবং সে সব সুরক্ষিত ও চিরস্থায়ী করতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সুদৃঢ়করণে তারা ব্যাপৃত থাকে। অধিকৃত দেশের শিক্ষা প্রসারণে ও সংস্কৃতি রক্ষণে দৃষ্টিদানের অবসর কোথায়?

এদেশে কি হিন্দু কি মুসলমান, কোন যুগেই শাসন যন্ত্রের শিকড় ইংরেজ শাসনের মতো দেশের দূরতম কোণেও কোন না কোন পথে এমন গভীর ভাবে প্রবেশ করে নি। রাজধানীতে হরবখৎ রাজা-উজির পরিবর্তনের ঢেউ গ্রাম-বাংলার জনজীবনে এসে পৌঁছয় নি। কিন্তু ইংরেজ শাসন ব্যবস্থার সর্বব্যাপী কাঠামোর সঙ্গে দেশের লোকের নাড়ীর যোগ না ঘটুক, নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য ক্রম-নির্ভরতা বাড়তেই থাকে। দেশের কৃষি ও কুটির শিল্পভিত্তিক বিকেন্দ্রীভূত গ্রাম্য অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। তার জায়গায় গড়ে ওঠে আধুনিক শিল্প বাণিজ্য নির্ভর শহরমুখী অর্থনৈতিক কাঠামো। ফলে দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটাতেও দেশের জনসাধারণ সরকারী প্রশাসনের ওপর অসহায় ভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

নতুন শাসনে প্রাচীন শিক্ষার ব্যবস্থা

কোম্পানীর শাসনজাল যখন সমগ্রদেশের ওপর বিস্তৃত হল, তখন সে শাসন-শৃংখলা বজায় রাখতে তারা সস্তা পাহারাদারের প্রয়োজন

২. Hundred Years of the University of Calcutta.

অনুভব করে এবং সে উদ্দেশ্য সিদ্ধি মানসে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতন হয়ে ওঠে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে তারা হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের শিক্ষার প্রতি নজর দেবার ফুরসৎ পায়—কিন্তু সে শিক্ষা ইংরেজিতে নয়; আরবি, ফার্সী ও সংস্কৃতে। সে ঘটনার পশ্চাৎপট নিম্নরূপ:

"The Calcutta Madrasa was founded by Warren Hastings in 1781 and a Sanskrit College was founded at Berares in 1791 ....He could thus assure himself of a regular supply of Muslim Law officers competent *qazis* and *muftis*. The Sanskrit College at Benares was founded with a view to "endear our Government to the native Hindus by our exceeding attention to them and their systems—the care ever shown by the native princes." The foundation of the Asiatic Society in January 1784 was a landmark in the cu'tural History of India"[৩]

অর্থাৎ কাজী ও মুফ্‌তি নামধারী মুসলিম আইনজ্ঞ সরবরাহের জন্য ১৭৮১খ্রীঃ কলিকাতা মাদ্রাসা এবং হিন্দুদের মনঃতুষ্টির জন্য ১৭৯১খ্রীঃ বারাণসী সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর ১৭৮৪ খ্রীঃ স্যার উইলিয়ম জোনসের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত এশিয়াটিক সোসাইটি এ দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা।

আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে বেসরকারী স্তরে চিন্তা ভাবনা

এই প্রসঙ্গে এই দেশে ইংরেজী তথা আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা কেমন করে কি উদ্দেশ্যে ধাপে ধাপে প্রচলিত ও প্রচারিত হয়েছিল তার ইতিহাস অতি সংক্ষেপে হলেও প্রণিধানযোগ্য।

১৭৯৩ খ্রী: "Charter Act" পাশ হবার আগে উইলবারফোর্স বিলাতে পার্লামেন্টে প্রস্তাব তুলেছিলেন যে ভারতবর্ষে স্কুল শিক্ষক পাঠান হোক। তার সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। তারপর ভারতবর্ষে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারী চার্লস গ্রাণ্ট কোম্পানীর চাকরি থেকে ১৭৯১ খ্রীঃ অবসর গ্রহণ করে বিলাতে ফিরে গিয়ে দুটি বিষয় নিয়ে আন্দোলন শুরু করেন—(১) ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান পাদ্রীদের অবাধ প্রবেশাধিকার দেওয়া হোক এবং (২) রোমান

৩. Hundred years of the University of Calcutta.

বিজেতাদের অনুকরণে ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে পাশ্চাত্য 'জ্ঞান ও আলো' (Light and Knowledge) বিকিরণের মাধ্যমে অজ্ঞান ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর মনের ভ্রান্ত ধারণা দূর করা হোক। ১৭৯৩ সালের কোম্পানীর নতুন সনদ আইনে এই বিষয় দুটি অন্তর্ভুক্তির অনুরোধ জানিয়ে তিনি কোম্পানীর কোর্ট অব ডাইরেক্টরদের অবগতির জন্য যে পুস্তিকা প্রকাশ করেছিলেন তাতে লিখেছিলেন—

> "By planting our language, our knowledge, our opinions and our religion, in our Asiatic territories we shall put our great work beyond the reach of contingencies".[৪]

প্রাচ্য প্রতীচ্যে যোগাযোগের সূচনা : ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা

চার্লস গ্রান্টের ১৭৯২ সালের প্রস্তাব কোম্পানীর ডিরেক্টরদের মনঃপুত হয় নি এবং অনুমোদন পায় নি। নিরুৎসাহ না হয়ে ১৭৯৭ খ্রীঃ তিনি পুনরায় তাঁর বক্তব্য কোম্পানীর ডাইরেক্টরদের কাছে পেশ করেন। যা হোক, ১৮০০খ্রীঃ লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার ফলে সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা শিক্ষার জন্য ইংরেজ রাজ-কর্মচারী ও দেশীয় পণ্ডিতদের যোগাযোগ হেতু পরস্পরের ভাষা সংস্কৃতির মধ্যে পরিচয়ের প্রথম সূত্র স্থাপিত হল।

সরকারী স্তরে শিক্ষা নিয়ে ভাবনার শুরু

বস্তুতপক্ষে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সরকারী স্তরে প্রথম ভাবনা চিন্তা শুরু হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশক থেকে। লর্ড মিণ্টো তাঁর ৬ই মার্চ ১৮১১ খ্রীঃ মিনিটে এদেশের বিশেষত হিন্দুদের শিক্ষা ব্যবস্থার শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে লেখেন—

> "He drew attention to the progressive decay of literature and Science in Bengal. He apprehended that this would lead to the disuse and actual loss of many books : "Unless Government interposed with a fostering hand, the Revival of letters may mostly become hopeless from want of books or of persons capable of explaining them."[৫]

৪, ৫. Hundred Years of the University of Calcutta.

এই শোচনীয় অবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারেরও কিছু দায় দায়িত্ব আছে এবং ভারতে হিন্দুদের শিক্ষা সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র বারাণসী, ত্রিহুত ও নবদ্বীপের দ্রুত অবনতি ব্রিটিশ শাসনের সুনাম নষ্ট করছে—এই মন্তব্য করে ব্রিটিশদের জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সুরক্ষা করবার জন্যই হিন্দু শিক্ষা সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলির পুনর্গঠনের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি বলেন—

"He drew pointed attention to the decline of Hindu learning in Benares, Tirhut and Nadia and suggested that the Government should extend its fostering care to the literature of the Hindus and aid in opening to the learned people in Europe the repositories of that literature. He recommended the foundation of Sanskrit Colleges at Tirhut and Nadia. His argument was that the credit of British national character was affected by the neglected state of learning in the East."[৯]

শিক্ষা খাতে প্রথম অর্থ বরাদ্দ

সম্ভবতঃ লর্ড মিন্টোর এসব মন্তব্যে প্রভাবিত হয়েই কোম্পানীর ১৮১৩ সালের সনদে ভারতবাসীর শিক্ষার জন্য অনধিক এক লক্ষ টাকা আলাদা করে রাখার প্রস্তাব করে বলা হয়—

"A sum of not less than one lac of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvemnt of literature and the encouragement of the learned natives of India and for the introduction and promotion of a knowledge of the sciences among the inhabitants of the British territories in India."[৭]

কিন্তু কিভাবে ও কোন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই টাকা খরচ করা হবে তা নিয়ে টালবাহানা ও মতদ্বৈধতা শুরু হয় ; যার দরুন কোন ফলপ্রসূ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি।

বেসরকারী স্তরে শিক্ষা প্রচেষ্টাঃ হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা

সরকারী পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে আর কোন উচ্চবাচ্য শোনা না গেলেও বেসরকারী পর্যায়ে কিন্তু সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মাফিক ইউরোপীয় ভাবধারায় শিক্ষাদানের তোড়জোড় চলতে থাকে। রামমোহন রায় ও ডেভিড হেয়ারের

৭. Hundred years of the University of Calcutta.

অনুপ্রেরণায় এবং কতিপয় ধনাঢ্য ব্যক্তির আনুকূল্যে উচ্চশ্রেণীর হিন্দুদের বংশতিলকদের ইউরোপীয়ান জ্ঞান বিজ্ঞানে শিক্ষা দানের জন্য কলিকাতায় ১৮১৭ খ্রীঃ হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়।

কালক্রমে ব্রিটিশ সরকারও শিক্ষা বিষয়ে নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠতে থাকে। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের সিদ্ধান্ত অনুসারে শিক্ষা বিষয়ে সরকারের একমাত্র মুখপাত্ররূপে "General Committee of Public Instruction" স্থাপিত হয় ১৮২৩ খ্রীঃ এবং তার উপর শিক্ষা খাতে বরাদ্দ বার্ষিক লক্ষ টাকা ব্যয়ের ভার অর্পিত হয়। এই কমিটি শিক্ষাক্ষেত্রে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর রেখে যেতে পারে নি। বরং শিক্ষার জন্য বরাদ্দ টাকায় ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান চর্চার কোন ব্যবস্থা না করে সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ১৮২৪ খ্রীঃ কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করে। কমিটির এই সিদ্ধান্তে প্রাচীনপন্থীরা খুশী হলেও পাশ্চাত্ত্যবাদীরা খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। যা হোক, সরকারী তরফে এসব আন্তরিকতাহীন প্রচেষ্টায় কোন সুষ্ঠু সুদূরপ্রসারী ও ফলপ্রসূ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নি।

সরকারী পর্যায়ে আধুনিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব : মেকলের মন্ত্রণা

ইত্যবসরে ইংরেজদের সাম্রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্য বিস্তার চলছে দ্রুত গতিতে। সাম্রাজ্য শাসন-যন্ত্র ও বাণিজ্য শোষণযন্ত্র রক্ষণাবেক্ষণে নিম্ন পদস্থ কর্মচারীর চাহিদাও বাড়তে থাকে সে হারে। এই শ্রেণীর কর্মচারী বিলাত থেকে আমদানি করলে কোম্পানীর ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রির অবস্থা হয়। সুতরাং স্বল্প মাহিনায় স্থানীয় লোকদের নিযুক্ত করাই তারা বুদ্ধিমানের কাজ মনে করল। ১৯৩৫ খ্রীঃ লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক সর্বপ্রথম দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত করে তথ্যনির্ভর রিপোর্ট দিতে পাদ্রী উইলিয়াম অ্যাডামকে কমিশনার রূপে নিযুক্ত করেন। কিন্তু অ্যাডাম তাঁর সুচিন্তিত রিপোর্ট দাখিল করার আগেই শিক্ষা কমিটির তৎকালীন সভাপতি মিঃ টি. বি. মেকলে ঐ বছরের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত ঐতিহাসিক মিনিটে এদেশে শিক্ষা প্রসারে সরকারের গূঢ় উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন—

"We must at present do our best to form a class who may be interpreters between us and the millions, whom we govern;

a class of persons, Indian in blood and colour, but English in taste, in opinions, in morals and in intellect."[৮]

অর্থাৎ ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রের সহায়করূপে মুষ্টিমেয় ইংরেজ শাসক ও কোটি কোটি শাসিত ভারতীয়ের মধ্যে সংযোগ রক্ষার জন্য এমন এক শ্রেণীর কর্মচারী-দোভাষী সৃষ্টি করতে হবে যারা কেবলমাত্র গাত্রবর্ণে এবং রক্তে ভারতীয়, কিন্তু রুচি, মানসিকতা, নীতিজ্ঞান ও বোধবুদ্ধিতে হবে পুরোপুরি ইউরোপীয়।

এমন কর্মচারী-দোভাষীশ্রেণী সৃষ্টি করতে হলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হয় এবং তার জন্য স্কুল কলেজ স্থাপন করা দরকার। সুতরাং শিক্ষার জন্য বরাদ্দকৃত সম্পূর্ণ অর্থই যে ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষাপ্রসারে ব্যয় করা হবে সে সিদ্ধান্ত লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর ৭ মার্চ ১৮৩৫ খ্রীঃ 'মিনিটে' দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেন—

"His Lordship in Council is of opinion that the great object of the British Government ought to be the promotion of European literature and science amongst the natives of India and that all the funds appropriated for the purposes of education would be best employed *on English education alone*."[৯]

আধুনিক শিক্ষার অঙ্কুরেই সামাজিক বিভেদ সৃষ্টির অভিসন্ধি

এই কর্মচারী-দোভাষী সৃষ্টির স্বার্থেই প্রয়োজন হয়েছিল মেকলে সাহেবদেরই উর্বরমস্তিষ্ক জাত "filtration theory" বা উঁচু থেকে চুঁইয়ে নিচে নামার এক অদ্ভুত শিক্ষা-তত্ত্ব! 'শিক্ষা বিশারদ' উইলিয়াম এ্যাডাম সাহেব এই তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে বলেছেন—

"Instead of beginning with schools for lower grades of native society, a system of Government institutions may be advocated, that shall provide, in the first place, for the higher classes on the principle that the tendency of knowledge is to descend, not to ascend."

নতুন শিক্ষানীতির সুফল কেবলমাত্র 'higher class' বা উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার সুপারিশ করা হয়েছিল। এই শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অর্থাহরণ; জ্ঞানাহরণ নয়। অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যই ছিল উচ্চ শ্রেণীর

৮. ৯. Speeches of Lord Macaulay with his Minutes on Indian Education —G. M. Young

অর্থাহরণের পথ পরিষ্কার করা। এভাবে সমাজে 'higher class' আর 'lower class' নামে দু'টি নতুন শ্রেণী সৃষ্টির পথ সুগম হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে এই সামাজিক বিভাজন নীতি আরো সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি পায় পরবর্তীকালে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন সম্পর্কিত ঐতিহাসিক উডস্ ডেসপ্যাচে।

নতুন শিক্ষার্থীদের কাছে চাকরীর হাতছানি

নতুন প্রবর্তিত শিক্ষা গ্রহণে ছাত্রদের আকৃষ্ট করতে একদিকে যেমন ১৮৩৮ খ্রীঃ থেকে আইন আদালতে এযাবত প্রচলিত ফার্সী ভাষার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষা সরকারী ভাষা বলে ঘোষিত হল, অপরদিকে সরকার-প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজে ইংরেজি শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদেরই সরকারী প্রশাসনে কর্মচারী নিয়োগে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে এই প্রলোভন দেশবাসীর সামনে তুলে ধরা হল—

> "....in every possible case, a preference shall be given in the selection of candidates for public employment to those who have been educated in the institutions thus established and especially to those who have distinguished themselves therein by more than ordinary degree of merit and attainment."[১০]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ঃ উডস্ ডেসপ্যাচ

সরকারী স্কুল কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের শিক্ষা সমাপনান্তে পরীক্ষা গ্রহণ ও সাফল্যের স্বীকৃতিসূচক অভিজ্ঞানপত্র প্রদানের প্রয়োজনীয়তা তখন অনুভূত হয়। ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা পদ্ধতি চালু করতে হলে সে শিক্ষা পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউরোপীয় ধাঁচের কোন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের অভাব শিক্ষা নিয়ামকগণ অনুভব করলেন। এবং তাঁরা উর্দ্ধতন শাসন কর্তৃপক্ষের কাছে সে প্রশ্ন তুলে ধরেন।

১৮৫৫ সালে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নতুন করে সনদ দেওয়ার প্রস্তাব বিবেচনার জন্য বিলাতের লর্ডস্ ও কমন্স সভার এক সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। ঐ কমিটির নিকট প্রেরিত এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের শিক্ষা সংসদের প্রেসিডেণ্ট চার্লস্ হে ক্যামেরণ মন্তব্য করেন—

---

১০. Hundred years of the University of Calcutta.

"ব্রিটিশ ভারতে ইউরোপের মতো কোন বিশ্ববিদ্যালয় নেই,
যা শিক্ষার জন্য ডিগ্রী দিতে পারে"।[১১]

তার আগে ১৯৫৪ সালের ১৯শে জুলাই প্রেরিত সুপ্রসিদ্ধ "উড্স ডেসপ্যাচে" বোর্ড অফ কন্ট্রোলের সভাপতি স্যার চার্লস্ উড্ ভারতবর্ষে ইউরোপীয় ধাঁচের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা এবং উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন—

"By the division of University Degrees and distinctions into difficult branches, the exertions of highly educated men will be directed to the studies, in future necessary to success in the various active professions of life. We shall, therefore, have done as much as a government can do to place the benefits of education plainly and practically before the higher classes of India."

বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য

এই সুপারিশ অনুসারে তিনটি প্রেসিডেন্সী টাউন—কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। ১৭৫৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। তার ঠিক একশ' বছর পরে ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ১৮৫৭ সালের ২নং আইনানুসারে স্থাপিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে উক্ত আইনের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে—

"....it has been determined to establish a University at Calcutta for the purpose of ascertaining by examination the persons who have acquired proficiency in different branches of Literature, Science and Art and of rewarding them by academical degrees as evidence of their respective attainments."[১২]

অর্থাৎ সাহিত্য, বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিদের ডিগ্রী দানের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল। এত ঢাক ঢোল বাজিয়ে প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ এমন সঙ্কীর্ণ পরিধিতে যে ব্যাপ্ত থাকবে তার আভাস উডের ডেস্প্যাচেই মেলে—

১১. সূত্র : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ।
১২. Hundred Years of the University of Calcutta.

"The Universities were to be established not so much to be in themselves places of instruction, as to test the values of the education obtained elsewhere."[১৩]

একেই বলে বহ্বারম্ভে লঘু ক্রিয়া বা বিসমিল্লায় গলদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ 'Advancement of Learning' বলে নিনাদিত হলে কি হবে, কার্যত তার উদ্দেশ্য হল—'rewarding of Academic Degrees' : পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণ। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যে শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে নয়, বরং অন্যত্র অধীত বিদ্যার বহর যাচাই করার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে তা খোলাখুলি-ভাবেই ঘোষিত হল। আদর্শ ও উদ্দেশ্যের এমন আসমান-জমিন ফারাক খুব কম ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

আদর্শ উদ্দেশ্য যাই হোক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হল। প্রতিষ্ঠা দিবস ১৮৫৭ সালের ২৪ জানুয়ারী। যে ৩৯ জন সদস্য নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট গঠিত হয়, তার ৩৩ জনই শাসন, শিক্ষা, সামরিক, পুলিশ, বিচার বিভাগ এবং মিশনারী সংস্থা ও স্কুল কলেজের সঙ্গে জড়িত ইউরোপীয় সদস্য। বাকী ৬ জন মাত্র ভারতীয়। তাঁরা হলেন—

১। প্রসন্ন কুমার টেগোর
২। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ
৩। রমাপ্রসাদ রায়
৪। রামগোপাল ঘোষ
৫। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অধ্যক্ষ, সংস্কৃত কলেজ
৬। মৌলবী মুহম্মদ ওয়াজী, অধ্যক্ষ, কলিকাতা মাদ্রাসা

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বয়স যখন সবেমাত্র ৭ বছর ৫ মাস ৫ দিন তখন ১৮৬৪ খ্রী: ২৯ জুন কলিকাতায় ডাক্তার গঙ্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ঘরে জন্ম নিল এক শিশু—নাম আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এই শিশুই উত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শাসন ও শিক্ষা কাঠামোর খোল নলচেশুদ্ধ এমনভাবে পালটে দিলেন যে তাকে আর পুরানো বিশ্ববিদ্যালয় বলে চেনাই দায় হল। বিশ্ববিদ্যালয়কে নবরূপে নব সাজে পুনর্গঠনের মাঝেই প্রকাশ পেল শিক্ষা-শিল্পীর সমগ্র শিক্ষা চিন্তা ও প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ছাপ।

১৩. Hundred years of The University of Calcutta.

দ্বিতীয় অধ্যায়

আশুতোষের শিক্ষা চিন্তার স্ফুরণ

আশুতোষের ছাত্র জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়—শিশুকালেই শিক্ষার ধারা সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব—বিভিন্ন পরীক্ষায় অসামান্য কৃতিত্ব—বাঙালী চরিত্রের মূল্যায়ন—দেশবাসী কর্তৃক শিক্ষার ভার হাতে নেবার অসার প্রস্তাবের বিরোধিতা—শিক্ষা সমাপনান্তে অঙ্কের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক—অধ্যাপক পদ গ্রহণের আহ্বান ও প্রত্যাখ্যান।

*   *   *   *

আশুতোষের ছাত্র জীবনের বিস্তৃত বিবরণ দেবার তেমন অবকাশ নেই। কিন্তু মহাজন বাক্য—প্রাতঃকাল দিবসের সূচনা করে, বাল্যেই অধিকাংশ মানুষের জীবনের গতিপথ নির্দিষ্ট হয়, ভবিষ্যৎ জীবনের পথনির্দেশ মেলে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে আশুতোষের ছাত্র জীবনের কিঞ্চিৎ উল্লেখ প্রাসঙ্গিক এবং প্রয়োজনীয়ও বটে।

আশুতোষের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্ফুরণ পাঠ্যজীবনেই ঘটে। তাঁর অদম্য জ্ঞানস্পৃহা প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছিল। পড়াশোনায় তাঁর আশু তুষ্টি কখনো ঘটেনি। আশুতোষের অত্যুজ্জ্বল প্রতিভাদীপ্ত ছাত্রজীবন নিয়েই একাধিক পুস্তক রচিত হয়েছে। তাঁর পাঠ্যানুরাগ ও অধীত বিষয় বৈচিত্র্য, প্রসারতা ও গভীরতা সম্পর্কে জীবনীকারগণ এমন সব কাহিনী উল্লেখ করে গেছেন যা অলৌকিক ও অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। কিন্তু বাহ্য-দৃষ্টিতে অতিরঞ্জিত মনে হলেও সে সব কাহিনী সম্পূর্ণ সত্য। শতাব্দীর এক চতুর্থাংশের অধিক কাল যিনি বাংলা তথা ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থার গতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন এবং ক্ষুরধার বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগে চালকের অভিলষিত স্থানে শিক্ষারথ না চালিয়ে তাঁর জ্ঞাতসারেই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে সে রথ পৌঁছিয়ে দিয়েছিলেন, সে বিরল প্রতিভার স্ফুরণ তাঁর ছাত্র জীবনেই ঘটে।

ভিত সুদৃঢ় ও সুগঠিত না হলে তার উপর সুরম্য গৃহনির্মাণ নিরর্থক। যে কোন মুহূর্তে তা হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে পারে। তেমনি মহৎ ব্যক্তি ও কর্মবীরদের জীবন গড়ে তুলতে হলেও তাদের বাল্যকালে ও ছাত্রজীবনে নির্ভেজাল মাল মসলার উপযুক্ত সংমিশ্রণ ও সুনিপুণ কারিগরের দক্ষ

হস্তাবলেপ প্রয়োজন। আশুতোষের জীবনের প্রস্তুতি পর্বে সে সব উপাদানের সুন্দর সমাবেশ ঘটেছিল।

ভগবৎদত্ত প্রতিভার অধিকারী হলেও তার পূর্ণ বিকাশে যে অনুকূল পরিবেশ সদা সতর্ক অভিভাবকত্ব এবং আদর্শবাদী ও কর্তব্যপরায়ণ শিক্ষকমণ্ডলীর স্নেহানুকূলতা অত্যাবশ্যক, আশুতোষ তা অকৃপণভাবে পেয়েছিলেন, এবং বাংলাদেশের ছাত্রসমাজ যেন সে রকম অনুকূল পরিবেশের মধ্যে পড়াশোনা ও জীবন গঠন করতে পারে, তার প্রয়োজনীয়তা উত্তর জীবনে মর্মে মর্মে অনুভব করেছিলেন। সে চিন্তা সর্বক্ষণ তাঁর চিত্তে জাগরূক ছিল।

আশুতোষের ছাত্র জীবনেই তাঁর মনে ভবিষ্যৎ জীবনের আশা ও আকাঙ্ক্ষার বীজ উপ্ত হয়েছিল। এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দেবার চিন্তা ছাত্র জীবন শেষ না হতেই তাঁর মনে দানা বাঁধতে থাকে। সুতরাং অতি সংক্ষেপে হলেও সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা অনাবশ্যক বিবেচিত হবে না; বরং তার মাঝেই মিলবে বাংলার ভবিষ্যৎ শিক্ষা নিয়ন্তার জীবন ও চরিত্রের কিছু কিছু সুস্পষ্ট লক্ষণ।

শৈশবে বিদ্যালয় সম্পর্কে বিরূপ ধারণা

আশুতোষ পাঁচ বছর বয়সে বাড়িতে প্রথম ভাগ শেষ করে ভবানীপুরের চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। প্রথম দিনই স্কুল থেকে ফিরে এসে বললেন—আমি আর স্কুলে যাব না। কারণ জিজ্ঞাসা করতে বললেন—ও তো স্কুল নয়, যাত্রাগানের আখড়া। একটি ছোট ঘরে ৪০।৫০ জন ছাত্র তারস্বরে চীৎকার করছে। ওখানে কি পড়া যায়!

"বিদ্যালয়ে প্রথম পদক্ষেপেই পঠন-পাঠন, পরিবেশ ও শিক্ষাক্ষেত্রে অবস্থা সম্পর্কে শিশু আশুতোষের যে সচেতনতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, পরিণত বয়সে শিক্ষা সংস্কারে তাঁর প্রবল সংগ্রাম ও সাফল্যের মাধ্যমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা সমগ্র ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থায় তা বিরাট পরিবর্তন সূচনা করে।"[১] এই সময়ে তিনি 'রবিনসন ক্রুশো' এবং 'গালিভার্স ট্রাভেলস্' বাবাকে মুখস্থ করে শোনাতেন।

মাত্র দুই বছরের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে আশুতোষ ১৮৭৬ খ্রীঃ সাউথ সুবার্বন স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীতে ভর্তি হন। তখন তিনি মিলটনের

১. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি।

'প্যারাডাইস লষ্ট' কাব্যের প্রথম ক্যাণ্টোর সবটাই মুখস্থ বলতে পারতেন। তাঁর কণ্ঠস্থ ছিল ক্যাম্বেলের 'প্লেজার্স অব্ হোপ্,' পোপের 'হোমার্স-ইলিয়াড' (১ম অধ্যায়)। থার্ড ক্লাসের ছাত্র অবস্থাতেই তিনি মেকলের 'Hastings' এবং 'Clive' নামক প্রবন্ধ দুটি মুখস্থ করেছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই এফ. এ. পরীক্ষার গণিত প্রায় সব শেষ করেছিলেন; মায় ইউক্লিডের জ্যামিতি পর্যন্ত।

আশুতোষ ছিলেন আশৈশব জ্ঞান-পিপাসু। তাঁর বিশ্বগ্রাসী পাঠের ক্ষুধা কিছুতেই নিবৃত্ত হতো না। স্মৃতিশক্তি ছিল অভাবনীয় প্রখর। যা পড়তেন তাই তাঁর স্মৃতিতে গভীরভাবে খোদাই হয়ে থাকত। বিশেষ করে অঙ্ক ও গণিতের বই পেলে তিনি আহারনিদ্রা ভুলে যেতেন। ১৮৮০ খ্রীঃ আশুতোষ প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করেন। খ্যাতনামা শিক্ষকদের সাহচর্য, বিরাট গ্রন্থাগার, অনেক প্রতিভাশালী সহপাঠী সম্মিলনে আশুতোষের জ্ঞানার্জনের পরিধি বহুগুণ বিস্তৃত হল। বিশেষতঃ অঙ্কের অধ্যাপক বুথ সাহেব আশুতোষের গাণিতিক প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে যান; এবং আশুতোষের অন্যতম হিতার্থী ও শুভার্থী বলে গণ্য হন। পরবর্তীকালে আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় শাসন-কাঠামোয় প্রবেশের পথ সুগম করতে তিনি অনেক সাহায্য করেছিলেন। এফ.এ. ক্লাসে পড়তে পড়তেই গণিতের উপর তাঁর এক প্রবন্ধ 'Cambridge Messenger of Mathematics' নামক বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

১৮৮১ খ্রীঃ তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার পূর্বক এফ.এ. পাশ করেন। আর ১৮৮৪ খ্রীঃ বি.এ. পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করেন। ইংরেজী, অঙ্ক, সংস্কৃত, দর্শন ও ইতিহাস—এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে তিনটিতেই তিনি প্রথম হয়েছিলেন। দর্শনে ১০০ নম্বরের মধ্যে পেয়েছিলেন ৯৬। তাঁর পরীক্ষার সাফল্য সম্পর্কে উপাচার্য মিঃ রেনল্ডস্ সমাবর্তন ভাষণে বলেন :—

> "The senior Wrangler of the year, if I may borrow the phrase from Cambridge, is Asutosh Mookerjee of the Presidency College, who stands first on the list of B.A. graduates and is the winner of the Eshan and Vizianagram scholarships and of the Hurrish Chunder prize for mathematics."

১৮৮৫ সালে গণিতে এম.এ. পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ তিনি দ্বিতীয়বার বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও

পদার্থবিদ্যা এই তিন বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম স্থান দখল করেন। এম.এ. পরীক্ষা পাস করেই আশুতোষ পরের বছর পি. আর. এস. স্কলারশীপে গবেষণীয় পরীক্ষাপত্র পেশ করেন। গণিতে তিনি ১০০র মধ্যে ১০০ পান এবং বিজ্ঞানে পেলেন ৯৬। তাঁর গবেষণাপত্রের পরীক্ষক ছিলেন অধ্যাপক ইলিয়ট, গিলিল্যাণ্ড ও বুথ। পরীক্ষকগণ আশুতোষের গবেষণাপত্র দেখে অত্যন্ত প্রীত হন এবং মন্তব্য করেন—

"The Examiners for the Premchand Roychand Studentship recommend that the studentship be awarded to Asutosh Mukherjee, M.A., Presidency College. He took up Pure Mathematics, Mixed Mathematics and Physics. In the first two subjects he passed a brilliant examination, and in the third he acquitted himself very creditably." (C. U. Syndicate Minutes)

বি.এ. পাস করেই আশুতোষ সিটি কলেজে আইন পড়া শুরু করেছিলেন। এদিকে এম.এ. পড়া ও পি. আর. এস. পরীক্ষার প্রস্তুতিও একই সঙ্গে চলছে। এম.এ. পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলে আশুতোষের অনন্য সাধারণ কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করে উপাচার্য ইলবার্ট সমাবর্তন ভাষণে বলেছিলেন—

"In the M. A. Examination, Mr. Asutosh Mukherjee, to whose achievements my predecessor referred in 1884, maintains his pre-eminence as a Mathematician and for the sake of the profession to which I belong. I am glad to see that he has devoted himself to the study of Law and has carried off gold medal recently offered for competition among law students by my friend Maharaja Sir Jatindra Mohan Tagore."[২]

১৮৮৮ খ্রীঃ আশুতোষ বি.এল. পরীক্ষা পাস করেন এবং ১৮৯৪ খ্রীঃ তিনি ডি.এল. হন। এ সকল পরীক্ষায় তিনি কত যে বৃত্তি, পদক, পুরস্কার পেলেন তার উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক পদে আশুতোষ

এম.এ. পাস ও পি. আর. এস. হবার পরই মাত্র ২৩ বছর বয়সে আশুতোষ ১৮৮৭ খ্রীঃ এম.এ. পরীক্ষার গণিতের প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হবার

২. Calcutta University Convocation Address, 1885.

আবেদন করেন। সেকালে কেন, কোন কালেই এম.এ. পাস করেই এম.এ.-র পরীক্ষক হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু অনন্যসুলভ প্রতিভার জোরেই আশুতোষ গণিতের মতো কঠিন বিষয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন, সহকারী পরীক্ষক হলেন তাঁরই অঙ্কের অধ্যাপক বুথ সাহেব।

এইভাবেই আশুতোষের অতুলনীয় ছাত্রজীবনের প্রথাগত সমাপ্তি ও বৃহত্তর কর্মজীবনে প্রবেশ।

জাতীয় চরিত্রের দোষ ত্রুটির প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ

আশুতোষ যখন বি.এ. পাস করেন, তখনই তিনি দেশের লোক-চরিত্র সম্পর্কে কেমন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ, নির্ভুল বিচার ও সঠিক মূল্যায়ন করেছেন, তার প্রমাণ মেলে একটি ঘটনায়। সেই সময়ে সিটি কলেজের পুরস্কার বিতরণী সভায় স্বনামধন্য বিচারপতি স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র সভাপতির অভিভাষণে উচ্চ শিক্ষা সংক্রান্ত প্রসঙ্গে এই রকম মন্তব্য করেছিলেন :

"বাঙালী এখন সব বিষয়েই অগ্রসর হইতেছেন। বাঙালী যদি এমন করিয়া কলেজ চালাইতে সমর্থ হন, তবে গভর্ণমেন্টের বিশেষ কিছু করিবার দরকার নাই। উচ্চ শিক্ষার ভার ও দায়িত্ব আমরা স্বহস্তে গ্রহণ করিতে পারি"।

তৎকালীন 'বঙ্গবাসী' প্রভৃতি পত্রিকায় এই নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা হয়। এবং সকলেই একবাক্যে স্যার রমেশচন্দ্রের বক্তব্য সমর্থন করেন, কিন্তু বিশ বছরের এক অজ্ঞাতনামা যুবকের মনে প্রশ্ন জেগেছিল : "আমরা কি করিয়াছি যে উচ্চ শিক্ষার গুরুতর দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে বহন করিতে সমর্থ হইব? আমাদের না আছে ইচ্ছা, না আছে সামর্থ্য, না আছে শ্রমশীলতা। আমরা প্রতিজ্ঞা করি, কিন্তু পালন করি না, আস্ফালন করি—কার্য করি না। বড় বড় আশার কথা কল্পনা করিয়া নিজেদের দৈন্য দ্বারা পরাভূত হই। আমরা কি সাহসে উচ্চ শিক্ষার গুরুভার মাথা পাতিয়া লইব? ইহার জন্য যে স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন, আমাদের মধ্যে কে তাহা করিতে প্রস্তুত?"[৩]

এই চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আশুতোষ 'স্টেটস্‌ম্যান' কাগজে এ. এম. সংক্ষিপ্ত নামে একাধিক প্রবন্ধে স্যার রমেশচন্দ্রের বক্তব্যের এমন যুক্তিপূর্ণ প্রতিবাদ করলেন যে দেশবাসী তা পড়ে বিস্মিত হল। তখন কে জানত এই

৩. সূত্র : শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচী

অনধিক বিংশতি বর্ষ বয়স্ক যুবকের অন্তরে এদেশের শিক্ষাপদ্ধতির আমূল সংস্কারের স্বপ্ন সবেমাত্র সুপ্তি ও জাগরণের মাঝে দোল খেতে শুরু করেছে।

সরকারী শিক্ষকতার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান

সেকালে স্কুল কলেজের শিক্ষা সমাপ্ত হলেই বাঙালী যুবকগণ বিদেশাগত সাহেবদের কাছে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়েও কর্মপ্রার্থী হতো। কিন্তু আশুতোষের অভূতপূর্ব সাফল্যে গুণমুগ্ধ সাহেবগণ তাঁকে যে কোনো সরকারী চাকরী দিতে আগ্রহী ছিলেন। তিনি তা চাইলেই পেতেন। কিন্তু চাকরী তো তাঁর জীবনের ব্রত ছিল না। তবু শিক্ষা বিভাগের অধিকর্তা স্যার আলফ্রেড ক্রফট্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁকে প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপক পদ গ্রহণের অনুরোধ করেন। আশুতোষ ইউরোপীয় শিক্ষকদের সমান পারিশ্রমিক এবং চিরদিন প্রেসিডেন্সী কলেজেই থাকার নিশ্চয়তা দাবী করেন। ক্রফট্ তাতে রাজী না হলে আশুতোষ তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ক্ষুব্ধ ক্রফট্ সাহেব একারণে পরবর্তীকালে আশুতোষের যে কোন শুভ প্রচেষ্টা ও প্রস্তাবেই বাধা দিতেন।

কিন্তু ভাগ্যদেবতা আশুতোষের ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে রেখেছেন অন্যত্র। যিনি মানুষ গড়ার কর্মশালার কর্ণধার হবেন, তিনি নিজেই কি সামান্য এক কারিগর হয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন? সেই কর্মশালায় প্রবেশের প্রেরণা কেমন করে আশুতোষের মনে জাগে, ক্রমে ক্রমে দানা বেঁধে ওঠে, তা জানা অত্যাবশ্যক।

তৃতীয় অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আশুতোষ

বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হবার বাসনা—বাসনা জাগ্রত হবার উপলক্ষ—বাসনা পূরণে বিদেশী অধ্যাপক ও রাজপুরুষদের সাহায্য—'ফেলো'দের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্রোক্তি—নিলামের ডাক-সূত্রে বিচারপতি ও'কেনেলির সঙ্গে পরিচয়—উপাচার্য ইলবার্টএর সাহায্য—অধ্যাপক বুথের অকৃত্রিম শুভেচ্ছা—আশুতোষ সিনেটের 'ফেলো' ও সিণ্ডিকেটের সদস্য নির্বাচিত।

বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের 'ফেলো' হবার বাসনা

পাঠ্যজীবন শেষ না হতেই আশুতোষ তাঁর উত্তর জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য স্থির করেন। তৎকালীন বাংলাদেশ্ ও উত্তর ভারতের জ্ঞানীগুণী অনেকেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' ছিলেন। এমন এক বিদ্বজ্জন সমাজের সান্নিধ্যে আসার বাসনা তাঁর মনে জাগে। তা ছাড়া, দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা জ্ঞানীগুণীদের সমাবেশ সত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন ভাবনা চিন্তার কোন প্রয়াস নেই কেন, জ্ঞানের বিভিন্নমুখী বিকাশের কোন প্রচেষ্টা নেই কেন, সে প্রশ্নও তাঁর মনে জাগে। এত বড় একটা প্রতিষ্ঠান শুধু মাত্র ছাত্রদের পরীক্ষা নেওয়া এবং উত্তীর্ণ ছাত্রদের সার্টিফিকেট ও ডিগ্রী বিতরণের মধ্যেই ব্যাপৃত রয়েছে দেখে, আশুতোষ অবাক হতেন। তাই শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কার, শিক্ষানীতির সংশোধন, শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন করে, এই অচলায়তন প্রতিষ্ঠানকে সচল গতিশীল ও জীবনমুখী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার বাসনা ছাত্রজীবনেই তাঁর মনে বাসা বাঁধে। এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির ভিত নাড়িয়ে দিতে এবং কাঁচা ভিতকে পাকাপোক্ত করে তুলতেই যেন আশুতোষ একাধারে ভাঙাগড়ার কাজ সমাধান করতে সব্যসাচীরূপে আবির্ভূত হলেন। তা না হলে, সদ্য শিক্ষা ও গবেষণা সমাপ্ত যুবক নিজের ব্যক্তিগত জীবনে খ্যাতি প্রতিপত্তির শত হাতছানি উপেক্ষা করে, হতভাগ্য দরিদ্র পরাধীন দেশের ছাত্র ও যুবকদের সুস্থ সুন্দর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার স্বপ্নে বিভোর হবে কেন?

সুতরাং ১৮৮৬ খ্রীঃ ছাত্রজীবন শেষ হতে না হতে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন কাঠামোর মধ্যে প্রবেশ করতে উদ্যোগী হলেন। তাঁর শিক্ষা-চিন্তাকে যথাযথ রূপদানের অন্যতম পন্থা হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যকরী সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হবার মানসে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হবার আগ্রহ তাঁর মনে জোরদার হয়ে ওঠে। যখন নব্য শিক্ষিত যুবকশ্রেণী ভবিষ্যৎ জীবন গঠনের সুখস্বপ্নে মশগুল, এবং ব্যক্তিগত জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনের ফাকফন্দি হুলুকসন্ধানে ব্যস্ত, তখন আশুতোষ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গলদ দূরীকরণার্থে অনর্থকরী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবৈতনিক সেবায় আত্মনিয়োগ করতে কৃতসঙ্কল্প হলেন। কেমন করে আশুতোষ শনৈঃ শনৈঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশ্ছিদ্র কাঠামোর মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছিলেন তা বড়ই কৌতূহলোদ্দীপক।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে আশুতোষের কৌতূহল এবং আত্মীক সংযোগ ঘটে তাঁর খুল্লতাত রাধিকাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সূত্র ধরে। "রাধিকাপ্রসাদ ১৮৮২ খ্রীঃ সিনেটের সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন এবং তদবধি তাঁহার নিকট বিশ্ব-বিদ্যালয় সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজপত্র, পুস্তক ও 'মিনিট' আসিত, তদীয় গৃহে সেই সকলের এক অতীব আগ্রহশীল পাঠক জুটিয়াছিলেন, যিনি নীরবে অবসর কালে সেগুলি একরূপ গ্রাস করিয়া ফেলিয়া ভবিষ্যৎ কীর্তি-মঠ গড়িবার পরিকল্পনা করিতেছিলেন। তিনি তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র আশুতোষ।"[১]

বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে সংযোগ : নিলামের দোকানের সূত্র ধরে

বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ইতিহাস ও আভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে আশুতোষ সাহায্য পান নিলামের দোকান থেকে কেনা 'ক্যালেণ্ডার ও মিনিটস্' থেকে। সেগুলি ছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের অধ্যাপক পরলোকগত মিঃ ডব্লিউ. এ. মন্‌ট্রিয়ন সাহেবের। তিনি সিনেটের সদস্য ছিলেন। নিলামের দোকানে পুরাণো বইয়ের খোঁজে উপস্থিতি আশুতোসের জীবনের গতি পরিবর্তনে ও অভিলাষ সিদ্ধিতে খুব সহায়ক হয়েছিল। গণিতে অসামান্য প্রতিভা আশুতোষের জীবনে খ্যাতি ও উন্নতির মূল। এই গণিতপ্রীতি তাঁকে টেনে নিয়েছিল নিলামের দোকানে এবং

১. আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক

পরিচয়ের সুযোগ ঘটিয়েছিল হাইকোর্টের তৎকালীন বিচারপতি মিঃ জে. ও'কেনেলির সঙ্গে। এই পরিচিতি কিছুকাল পরে আশুতোষের সিণ্ডিকেট সদস্য নির্বাচনে খুবই সহায়ক হয়েছিল।

ইলবার্ট সকাশে : 'ফেলো'-শিপ প্রার্থনা

ঠিক সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন মিঃ ইলবার্ট। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র আশুতোষের তিনি কেবলমাত্র গুণমুগ্ধ ছিলেন না, তাঁর উপকার করতেও আগ্রহী ছিলেন। ১৮৮৬ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে একদিন তিনি আশুতোষকে স্বগৃহে ডেকে পাঠান এবং বহুক্ষণ তাঁর সঙ্গে নানাবিধ আলাপ আলোচনা করেন, এবং জিজ্ঞাসা করেন—"আমি তোমার কি উপকার করতে পারি ?"

"মিঃ ইলবার্ট ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন ও তাঁহার অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। আশুতোষ ইচ্ছা করিলে গভর্ণমেন্টের অধীনস্থ কোন বিভাগে বড় চাকরি পাইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি তাহা প্রার্থনা করিলেন না। সাধারণতঃ শিক্ষিত বাঙালী যুবকের নিকট যাহা একান্ত কাম্য, একেবারে আকাশের চাঁদ—আশুতোষ সেদিক দিয়াই গেলেন না। তিনি এমন এক পদ চাহিলেন, যাহার সহিত অর্থের সংশ্রব মাত্রই নাই।"[২] ইলবার্টের জিজ্ঞাসার উত্তরে তিনি বললেন—"আপনি ইচ্ছা করলে আমার অনেক কিছু উপকার করতে পারেন। কিন্তু আমি সে সব কিছু চাই না। আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে সিনেটের একজন সভ্য করে দিন"। ইলবার্ট—"আমি তোমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত করে দেব। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।"

আশুতোষের লক্ষ্য কত উচ্চ, উদ্দেশ্য কত মহৎ ছিল এবং বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষার সেবায় আত্মোৎসর্গের বাসনা কত অল্প বয়সে তাঁর সমগ্র চিন্তাধারাকে অধিকার করেছিল এই ঘটনা তার একটি প্রমাণ। কিন্তু ইলবার্ট সাহেব হঠাৎ উচ্চপদের এক চাকরী নিয়ে বিলাত চলে যান। তবু তিনি যাবার সময় আশুতোষের 'ফেলো' হবার পক্ষে জোর সুপারিশ করে যান। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে সে সুপারিশ ফাইল চাপা পড়ে যায়। বয়স কমের অজুহাতে অনেক সভ্যের বিরোধিতায় তাঁর আর 'ফেলো' হওয়া হল না।

---

২. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি

আশুতোষ ১৮৮৮ খ্রীঃ বিলাতে মিঃ ইলবার্টকে চিঠি লিখলেন যে তাঁর সুপারিশ সত্ত্বেও তাঁর (আশুতোষ) পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো মনোনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। উত্তরে ইলবার্ট লিখলেন—লর্ড ল্যান্সডাউন ভাইসরয় হয়ে ভারতে যাচ্ছেন। তাঁকে আমি তোমার কথা বলে দিলাম।

কয়েক মাস পরেই ল্যান্সডাউন ভারতে এলেন।

ফেলোদের সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গোক্তি

আশুতোষের 'ফেলো' হবার প্রার্থনা প্রসঙ্গে বলা যায় যে সেকালে অনেক শিক্ষিত বাঙালীই বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যপদ প্রাপ্তির জন্য উমেদারি করতেন। তাদের কাছে রায়বাহাদুর, খান বাহাদুরের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হওয়া একটা অতিরিক্ত তকমা ও রাজানুগ্রহের চিহ্ন বলে গণ্য হতো। তৎকালীন বাঙালী শিক্ষিত সমাজ ইংরেজ রাজপুরুষদের কাছে যেসব সুযোগ সুবিধা সম্মান পুরস্কার খেলাত পদবী প্রার্থনা করতেন সে সব এক সঙ্গে গ্রথিত করে বঙ্কিমচন্দ্র অষ্টবিংশতি পদ-বিশিষ্ট ইংরেজ স্তোত্র রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের এই রহস্য প্রবন্ধ সেকালের বাঙালীর চরিত্র-নির্যাস বলা চলে। তাঁর চিত্রিত রাজানুগ্রহ প্রার্থীদের কাম্য বিষয়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' মনোনীত হবার বাসনাটিও রয়েছে। যেমন—"হে সর্বদ! আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও—আমার সর্ববাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায় বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি। যদি তাহা না দাও, তবে আমাকে ডিনরে, আটহোমে নিমন্ত্রণ কর, বড় বড় কমিটির মেম্বর কর, সেনেটের মেম্বর কর, জুষ্টিস কর, অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"[৩]

বঙ্গদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যঙ্গ রচনা প্রকাশ হবার ১২।১৪ বছর পরে ১৮৮৭ খ্রীঃ যুবক আশুতোষ ইলবার্টের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' হবার প্রার্থনা জানান। কিন্তু বঙ্কিম কটাক্ষে বিদ্ধ বাঙালীদের মনোভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে আশুতোষ সিনেট-সদস্য পদপ্রার্থী হননি। প্রার্থনার মন্ত্র এক হলেও বাস্তবে তার উদ্দেশ্য সম্পূর্ণ আলাদা। বঙ্কিমের রচনায় ফুটেছে আত্মস্বার্থসিদ্ধি মানসে ইংরেজ চাটুকার ব্যক্তি-বাঙালীর ছাপ; আর আশুতোষের উদ্দেশ্য ছিল

৩. লোকরহস্য : ইংরাজস্তোত্র—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সিনেটের সদস্য হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘোষিত উদ্দেশ্য রূপায়ণ মারফৎ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা।

'আশুতোষ, তোমার জন্য সুসংবাদ এনেছি'

১৮৮৯, ১৬ই জানুয়ারী। আশুতোষের জীবনে এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। সন্ধ্যাবেলা আশুতোষ বসে আছেন তাঁদের ভবানীপুরের বাড়িতে। বসে বসে নিবিষ্ট চিত্তে তিনি জরাজীর্ণ একখানি পুস্তক পাঠ করছিলেন। তাঁর প্রিয়তম গ্রন্থ বওডিস-কৃত 'লা প্লাসের' ইংরাজী অনুবাদ—যে গ্রন্থ তিনি বহুকষ্টে ছাত্রজীবনে সংগ্রহ করেছিলেন। এমন সময়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আশুতোষের গণিতের অধ্যাপক বুথ সাহেব এসে উপস্থিত। "I have brought a piece of good news for you, Asutosh"—বললেন বুথ সাহেব। উৎকণ্ঠিত আশুতোষ জিজ্ঞাসা করেন—কি সংবাদ ?

"You have been appointed a Fellow of the University".[৪]

লর্ড ল্যান্সডাউন মিঃ ইলবার্টের অনুরোধ রক্ষা করেছেন বোঝা গেল। নেপথ্যে এত কলকাঠি নাড়াচাড়া হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের নথিপত্রে আশুতোষের 'ফেলো' মনোনীত হবার সংবাদ অত্যন্ত সাদামাটা ভাবে উল্লেখ রয়েছে, যেমন :—

> "241. Read a letter from the Secretary to the Government of India in the Home Department stating that the Governor General in Council has been pleased to appoint the under-mentioned gentlemen to be Fellows of the University of Calcutta.
> Deputy Surgeon General A. H. Hilson, M.D.
> W. King, Esq., B. A., D. Sc., F. G. S.
> C. E. Buckland, Esq., B. A., C. S.
> Shams-ul-Ulma Shaikh Mahmud Jilani.
> J. H. Apjohn, Esq., M. A., M. I. C. E.
> G. W. Küchler, Esq., B. A.
> Babu Pratapchandra Majumdar.
> C. Little, Esq., M. A.

৪. আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক

J. C. Bose, Esq., B. A., B. Sc.
Babu Srinath Das.
,, Asutosh Mukhopadhyay, M.A., F.R.A.S., F.R.S.E.
,, Ganeschandra Chandra
Maulavi Muhammad Abdur Rawaf."[৫]

হিন্দু মুসলমান ইউরোপীয়ান মিলে ১৩ জন নতুন ফেলোর মধ্যে ছিলেন Babu Asutosh Mukhopadhyay, M.A., F.R.A.S., F.R.S.E. এই ১৩ জন ফেলোকে বিভিন্ন ফ্যাকাল্টির সঙ্গে যুক্ত করা হয়। আশুতোষ যুক্ত হলেন আর্টস ফ্যাকাল্টির সাথে। উল্লিখিত সরকারী চিঠির ওপর সিণ্ডিকেটের সিদ্ধান্ত—

"ORDERED:

That the fellows be distributed as follows:—

Fellows	Faculty
C. E. Buckland, Esq., B.A., C.S. Shams-ul-Ulma Shaikh Mahmud Jilani Babu Pratapchandra Majumdar G. W. Küchler, Esq., B.A. C. Little, Esq., M.A. J. C. Bose, Esq., B.A., B.Sc. Babu Asutosh Mukhopadhyay, M.A., F.R.A.S., F.R.S.E. Maulavi Muhammad Abdur Rawaf	In Arts.
Babu Ganeschandra Chandra ,, Srinath Des	,, Law,
Deputy Surgeon General A. H. Hilson, M.D.	,, Medicine.
W. King, Esq., B.A., D.Sc., F.G.S. J. H. Apjohn, Esq., M.A., M.I.C.E.	,, Engineering."[৬]

সিণ্ডিকেট সদস্যপদে আশুতোষ

এবার আশুতোষের সিণ্ডিকেটে প্রবেশের পালা। এ ঘটনা আরো রোমাঞ্চকর। যদিও ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টস্-এর কার্য-বিবরণীতে তার কোন চিহ্ন নেই। ১৮৮৮-৮৯ খ্রীঃ ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টসের ৩০. ৩. ৮৯ তারিখের সভায় ৪২ জন সদস্যের উপস্থিতিতে সিণ্ডিকেটে পাঁচ জন প্রতিনিধি নির্বাচিত করার জন্য সভার কাজ শুরু হল। তারপর কার্য-বিবরণী থেকে—

৫, ৬. Calcutta University Syndicate Proceedings, 1889.

MINUTES

OF

THE FACULTY OF ARTS

FOR THE YEAR 1888-89.

No. 2

THE 30TH MARCH

Present:

The Hon'ble Sir A. W. Croft, K. C. I. E., *in the Chair.*

Nawab Abdul Lateef Bahadur, C.I.E.
Rai Jagadananda Mukerjee Bahadur.
Rev. J. P Ashton.
Charles H. Tawney, Esq., C. I. E.
The Hon'ble Dr. Mahendralal Sarkar, C. I. E.
Col. H. S. Garrett.
The Hon'ble Ra a Durgacharan Law, C. I. E.
Babu Gaurdas Basak.
Shamsul-Ulama Kabiruddin Ahmad, Khan Bahadur.
Babu Krishnakamal Bhattacharyya.
Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna, C. I. E.
Rev. Lalbihari Day.
Babu Kalicharan Banerjee.
Alex Pedler, Esq., F. C. S.
Dr. A. F. R. Hoernle.
Dr. P. K. Ray.
The Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee.
F. J. Rowe, Ésq.
A. M. Nash, Esq.
Babu Krishnabihari Sen.
Rev. K. S. Macdonald.
W. T. Webb, Esq.
The Hon'ble Syud Ameer Hussain, C. I. E.
Babu Gaurisankar De.
W. Booth, Esq.
Rai Radhikaprasanna Mukerjee. Bahadur.
Babu Bankimchandra Chatterjee.
Rev. J. Hector.
Babu Nilmani Mukerjee-
Babu Saradacharan Mitra.
Nawab Meer Muhammad Ali.
Babu Golapchandra Sarkar.
Babu Jogindrachandra Ghosh.
Babu Chandranath Basu.
Babu Haraprasad Sastri.
Maulavi Ahmad.
Babu Umeschandra Datta.
C. E. Buckland. Esq.
Shamsul-Ulama Shaik Mahmud Jilani.
C. Little, Esq.
J. C. Bose, Esq.
Babu Asutosh Mukhopadhyay, F. R. A. S., F. R. S. E.

296. The Hon'ble Dr. Mahendralal Sirkar, C.I.E., moved that the Hon'ble Sir A. Croft, K.C.I.E., be elected President for the year 1889-90.

The Hon'ble Dr. Gooroo Dass Banerjee seconded the motion which was carried.

The following gentlemen were proposed as Representatives in the Syndicate for the year 1889-90.

The Hon'ble Sir A. Croft, K.C.I.E.
The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, D.L.
The Rev. K. S. Macdonald.
The Hon'ble Dr. Mahendralal Sircar, C.I.E.
Mahamahopadhyay Maheschandra Nyayaratna, C-I.E.
Babu Asutosh Mukerjee, F.R.A.S., F.R.S.E.
Alexander Pedler, Ésq. F.C.S.
Charles H. Tawney, Esq., C.I.E.

A ballot having been taken the following gentlemen were declared duly elected :—

The Honb'le Sir A. Croft, K.C.I.E.
The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee, D.L.
The Hon'ble Dr. Mahendralal Sircar, C.I.E.
Alexander Pedler, Esq., F.C.S.
Babu Asutosh Mukhopadhyay. F.R.A.S., F.R.S.E.

P. K. RAY,
Registrar.

(Confirmed)
A. CROFT,
President.

সিণ্ডিকেট নির্বাচনের নেপথ্য ঃ বিদেশী গুণগ্রাহীদের সহায়তা

কিন্তু ব্যাপারটা যত নির্লিপ্তভাবে রেকর্ডে লিপিবদ্ধ হয়েছে আদতে মোটেই তা নয়। সভার আগে এই ব্যাপারে যথেষ্ট সলাপরামর্শ কলাকৌশল রচনা হয়েছিল এবং সভা চলাকালে যথেষ্ট উত্তাপ সঞ্চার হয়েছিল। আশুতোষের জীবনীকার এ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তা থেকে জানা যায়—

আশুতোষকে 'ফেলো' মনোনীত হবার সংবাদ দিয়ে বুথ সাহেব চুপ করলেন, তারপর তিনি তাঁকে বললেন—আর দুই মাস পরে সিণ্ডিকেটের

মেম্বার নির্বাচনের সময়, তখন সিণ্ডিকেটে প্রবেশ করা চাই। প্রস্তাবটা আশুতোষের মনঃপুত হলে কি হবে এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় সমর্থক সংগ্রহ অসম্ভব মনে হল তাঁর কাছে। তিনি চিন্তিতভাবে বুথকে বললেন—"We have only two months—it is impossible."

—"Nothing is impossible for you Asutosh. You must contest and become a member of the Syndicate". —বললেন বুথ সাহেব। আশুতোষকে প্রবলভাবে উৎসাহিত করে বুথ সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন—"Tell me who are your well-wishers."[৭]

আশুতোষ বললেন—ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, ডঃ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জাষ্টিস ও'কেনেলি ও তিনি (বুথ) স্বয়ং।

জাষ্টিস ও'কেনেলি সে সময় মুসলমান শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন, আর জ্যারেট ছিলেন সেই বোর্ডের সেক্রেটারী। ও'কেনেলি ফ্যাকালটি অফ আর্টসের মুসলমান সদস্যদের ভোট সম্পর্কে আশুতোষকে নিশ্চয়তা দিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে বিচারক ও'কেনেলি বিলাত চলে যান। তিনি অবশ্য কর্ণেল জ্যারেটের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর রাখতে আশুতোষকে বলে যান। ফ্যাকালটির সভার একেবারে প্রাক্-মুহূর্তে জ্যারেটের উপযুক্ত পুত্রের আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। আশুতোষ অত্যন্ত হতাশ বোধ করলেন। কিন্তু পুত্র শোকাতুর জ্যারেট দায়িত্ব বিস্মৃত হলেন না। তিনি নির্দিষ্ট সময়ে সভায় গেলেন এবং মুসলমান সদস্যদের মাঝে বসে রইলেন।

৩০শে মার্চ ১৮৮৯, ফ্যাকালটি অফ আর্টসের সভা শুরু হল। সভাপতি স্যার আলফ্রেড ক্রফট্‌ আশুতোষের উপর আগে থেকেই বিরক্ত ছিলেন। সভায় সদস্যদের উপস্থিতি এবং আশুতোষের জয়লাভের সম্ভাবনা দেখে তা বানচাল করতে অশোভনভাবে রেজিষ্ট্রার মিঃ সি· এইচ· টনির নাম প্রস্তাব করে বসলেন। "টনি রেজিষ্ট্রার স্যার"—বলে মহামহোপাধ্যায় মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন চিৎকার করে উঠলেন। ক্রুদ্ধ ক্রফট্‌ ন্যায়রত্নকে তিরস্কার করে থামিয়ে দিলেন। ক্রফটের মনোগত অভিপ্রায় বুঝতে কারো বাকি রইল না। অবশেষে ভোট গ্রহণ হল। কর্ণেল জ্যারেট ও তার মুসলমান সদস্যগণ এবং চারজন হিতাকাঙ্ক্ষীর সহায়তায় আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সদস্য নির্বাচিত হলেন।

---

৭. আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক

চতুর্থ অধ্যায়

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন—উপাচার্য পদে আশুতোষ

শিক্ষা সম্পর্কে সিমলা সম্মেলন—"র‍্যালে" কমিশন গঠন—স্থানীয় সদস্যরূপে কমিশনে আশুতোষের যোগদান—কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় বিল—কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে বিলের উপর বিতর্কে আশুতোষের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা—সর্বাত্মক বিরোধিতার বদলে গঠনমূলক সমালোচনা—বিলে বিরাট সম্ভাবনার অঙ্কুর—বিলের আলোচনায় আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার প্রতিফলন—নতুন বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রবর্তন—বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থা—উপাচার্য পদে আশুতোষ—নিয়মবিধি প্রণয়ন—আশুতোষের কাজের ধারা।

* * * *

প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে আশুতোষ

১৮৮৭ খ্রীঃ থেকে প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র করণীয় কর্ম পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন আশুতোষ। ১৮৮৯ খ্রীঃ থেকে সিনেট ও সিণ্ডিকেট সদস্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালন সংস্থার সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসেবে তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে প্রেরিত হন ১৮৯৯ ও ১৯০১ খ্রীঃ। পৌর সংস্থার প্রতিনিধি হিসেবে পরিষদে যান ১৯০৩ খ্রীঃ। আবার ১৯০৪ খ্রীঃ তিনি ইম্পেরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউনসিলের সদস্য মনোনীত হন। এভাবে প্রাদেশিক ও সর্ব ভারতীয় আইন পরিষদের সদস্য হিসাবে শিক্ষা সম্পর্কে তিনি বিদেশী শাসক গোষ্ঠীর মনোভাব অনুধাবনে সক্ষম হলেন; এবং সে সঙ্গে তৎকালীন ভারতীয় জননেতাদের চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পেলেন। ১৯০২ খ্রীঃ ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে তদন্ত ও সুপারিশ দানের জন্য যে 'র‍্যালে কমিশন' গঠিত হল, তার সঙ্গে স্থানীয় সদস্যরূপে যুক্ত থাকার দরুন দেশের শিক্ষা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে এবং ভবিষ্যতে তার সংস্কার সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণে তাঁর সুযোগ ঘটে।

এই র‍্যালে কমিশনের সদস্য হিসেবেই আশুতোষ শিক্ষা-নিয়ন্তাদের মানসিকতার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় লাভ করেন এবং প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার

দোষত্রুটি উদ্ঘাটনে এবং সংস্কার সাধনের পথ নির্দেশনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার প্রথম প্রতিফলন ঘটে কমিশনের রিপোর্ট আলোচনাকালে। তাই অতি সংক্ষেপে হলেও আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা অনুধাবনে র‍্যালে কমিশন ও তাঁর রিপোর্ট সম্পর্কে আলোচনা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

শিক্ষা ব্যাপারে সিমলা সম্মেলন : সরকার পক্ষে ঢাক ঢাক গুড় গুড় ভাব

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই শিক্ষা নিয়ে নতুন ভাবনা চিন্তার সূচনা হল। ১৯০১ খ্রীঃ সেপ্টেম্বর মাসে বড়লাট লর্ড কার্জন সিমলায় 'educational experts'-দের এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৫ দিন ধরে এই বৈঠক চলে। দুটি মুখ্য বিষয়ে সম্মেলনে উপস্থিত শিক্ষা-বিশেষজ্ঞগণ এক মত হন :—

(1) "In the first place, the defects of the existing University system were serious enough to call for the wisely considered remedies". Secondly, "the University Senates, as at present constituted, are not well fitted to devise or to carry out the measures which are urgently required in the interest of our students."[১]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মিঃ টমাস র‍্যালে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং উপরোক্ত সিদ্ধান্তের সঙ্গে এক মত হন।

"—but neither the composition nor the procedure of the Simla Conference could inspire public confidence,....Curzon consulted some European officers and one non-official European but kept Indian educationists at a safe distance from Simla." "The deliberations were confined to European educationists in India only," and the proceedings of the Conference were kept confidential. ফলে,—"the Simla Conference created an atmosphere of misunderstanding and frustration and thereby prejudiced constructive apprisal of the merit of the bill (Indian Universities Bill, 1903) by leaders of public opinion in the country."[২]

অর্থাৎ সিমলা সম্মেলন কেবলমাত্র ইউরোপীয় শিক্ষাবিদদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায় এবং আলোচনার বিষয়বস্তু গোপন রাখায় পরবর্তীকালে ঐ সম্মেলনের

১, ২. Hundred Years of the University of Calcutta,

সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনে অনেক সদ্‌গুণ ও মূল্যবান নির্দেশ থাকা সত্বেও তা জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি করে।

র‍্যলে কমিশন গঠন : স্থানীয় সদস্যপদে আশুতোষ

যা হোক উপরোক্ত সম্মেলনের গোপন সিদ্ধান্তকে সরকারী স্বীকৃতিদানের অভিপ্রায়ে ১৯০২ খ্রীঃ জানুয়ারী মাসে নিযুক্ত হল—"Indian Universities Commission". র‍্যলে হলেন সভাপতি; আর পাঁচজন ছিলেন সদস্য। কিন্তু পাঁচজন সদস্যের মধ্যে একজনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভারতীয় শিক্ষাবিদ্ না থাকায় আগুনে যেন ঘৃতাহুতি হল। সংবাদপত্র ও জনসভায় দেশবাসী ক্ষোভ প্রকাশ করতে থাকে। অবশেষে—

> "When the Government of India found that the composition of the Commission was being widely criticised on the ground that no Indian educationist was included in it, Curzon took (to quote Gokhale's words) 'the unusual step of offering a seat on the Commission, almost at the last moment,' 'to Gooroo Dass Banerjee....Apart from the members a local member was attached to the Commission at each University centre for the purpose of enquiry regarding that University. The local member for Calcutta University was Asutosh Mookerjee."[৩]

অর্থাৎ দেশব্যাপী বিক্ষোভ ও সমালোচনার চাপে শেষ মুহূর্তে গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে ষষ্ঠ সদস্য হিসেবে কমিশনে অন্তর্ভুক্ত করা হল। আর কমিশনের ছয়জন সদস্য ছাড়াও তদন্তের সুবিধার জন্য প্রত্যেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একজন স্থানীয় সদস্য নেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে স্থানীয় সদস্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই কমিশন তদন্ত কর্ম শেষ করে, কিন্তু তা সত্বেও —

> "The report was a comparatively brief and practical document."[৪]

৩, ৪. Hundred Years of the University of Calcutta.

ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য

র‍্যলে কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় বিল (Indian Universities Bill) ১৯০৩ খ্রীঃ ৪ঠা নভেম্বর কেন্দ্রীয় আইন পরিষদে উত্থাপিত হল। লর্ড কার্জনের ভাষায় বিলের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল :—

"(1) to raise the standard of education all round, and particularly that of high education, to apply better and less fallacious tests than at present exist, to stop the sacrifice of everything in the Colleges which constitute our University, to cramming ;

(2) to bring about better teaching by a superior class of Teachers ;

(3) to provide for closer inspection of Colleges and institutions which are now left practically alone ;

(4) to place the government of Universities in competent, expert and enthusiastic hands ; to reconstitute the Senates, to define and regulate the powers of the Syndicate ;

(5) to give statutory recognition to the elected Fellows, who are now only appointed upon sufferance ;

(6) to show the way by which our Universities, which are now merely examining Boards, can ultimately be converted into teaching institutions."[৫]

বিশ্ববিদ্যালয় আইন সম্পর্কে দেশবাসীর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাস

বাহ্যদৃষ্টিতে এ সকল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কার্যে রূপদানের জন্য আইন প্রণয়নে কোন আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু সিমলা সম্মেলন নিয়ে সরকার পক্ষের কারচুপি বা চুপি চুপি মনোভাব এবং সেই সম্মেলনের সলাপরামর্শের ভিত্তিতে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠনে একদেশদর্শিতায় দেশবাসীর মন আগে থেকেই বিদ্বিষ্ট হয়েছিল। এখন উপরোক্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট পুনর্গঠন এবং কলেজ পরিচালনায় অধিকতর তদারকির অন্তরালে শিক্ষিত জনগণ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীন সত্তা লোপ এবং

৫. Hundred Years of the University of Calcutta.

উচ্চ শিক্ষা প্রসারে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির তথা শিক্ষা সঙ্কোচনের বীজ নিহিত দেখতে পেল। প্রস্তাবিত আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারী হস্তক্ষেপ ও শিক্ষা সঙ্কোচনের আভাস দেখে, কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে ও আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তার তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু গোখ্‌লের বিরোধিতা যেমন ছিল সর্বাত্মক, আশুতোষের সমালোচনা ছিল গঠনমূলক। তিনি বিলের মধ্যে যে যৎসামান্য সরকারী সদিচ্ছার নিদর্শন পেলেন, তার মধ্যেই বৃহৎ সম্ভাবনার অঙ্কুর দেখলেন। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয় বিলের মুখ্য ধারাগুলির উপর বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে তিনি যে সব বক্তব্য রেখেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সংস্থা থেকে ভারতীয়দের দূরে রাখার চেষ্টায় ক্ষোভ

আগে সিনেটের সদস্য সংখ্যার কোন নির্দিষ্ট সীমা সংখ্যা ছিল না। সরকারী নেকনজরের নিদর্শন হিসেবে এমন অনেক লোক সিনেটের সদস্য মনোনীত হতেন যাদের শিক্ষার সঙ্গে কোন সম্পর্ক ছিল না। ফলে, অনধিকারী লোকের সংখ্যাধিক্যহেতু সিনেট ও ফ্যাক্যালটিগুলি দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রাজ্ঞ মতামত পাওয়ার পক্ষে অনুপযুক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং নতুন আইনে সিনেটের সদস্য সংখ্যা সীমিতকরণ ও শ্রেণীবদ্ধকরণের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু সরকার একদিকে সংখ্যাধিক্যতা ও বিজ্ঞতার অভাবের অজুহাতে যেমন দেশীয় সদস্য সংখ্যা কমাতে ব্যবস্থা নিচ্ছেন, অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সংস্থার বিভিন্ন শাখায় শিক্ষার সঙ্গে সম্পর্কশূন্য ইউরোপীয় সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধির বিধান রাখছেন—যদিও ইতিমধ্যে উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় শিক্ষকগণ সংখ্যাগত ও গুণগত উৎকর্ষতায় ইউরোপীয়দের ছাড়িয়ে গেছেন। সরকারের এই পরস্পর বিরোধী দু'মুখো নীতির সমর্থনে কোন যৌক্তিকতা না দেখতে পেয়ে, আশুতোষ উদাহরণ সহযোগে তার অসারতা প্রমাণ করেন। এই বিল আলোচনাকালে গোপালকৃষ্ণ গোখ্‌লে দুঃখ করে বলেছিলেন—

"......after fifty years of University education in this country, the Government should have introduced a measure which, instead of associating the Indian element more and

more with the administration of the Universities, will have the effect of dissociating it from the greater part of such share as it already possessed."[৬]

গোখ্‌লের এই খেদোক্তির সঙ্গে আশুতোষ সম্পূর্ণ এক মত ছিলেন—

"This regret was shared by Asutosh Mookerjee who pointed out that in view of the increasing share taken by Indians in Collegiate teaching there was no justification for increasing the European element in the University bodies. In reply to a question put by him in the Provincial Legislative Council on 14 August, 1903, he was told that in pursuance of a recommendation of the Public Service Commission of 1886-87 the Government had decided to place some of the Government Colleges entirely under Indian Professors. In accordance with this policy "the Colleges at Hooghly, Krishnagar, Rajshahi, Cuttack and Chittagong and the Calcutta Sanskrit College were manned almost entirely by Indian Professors. The same policy was to be applied to Dacca College and Presidency College."[৭]

যে প্রেসিডেন্সী কলেজ—"which is supposed to be the model College in Bengal, capable of teaching up to the higher European standards,"—সেখানেও ভারতীয় অধ্যাপকের সংখ্যা ১৯, আর ইউরোপীয় অধ্যাপক মাত্র তিনজন। বাংলাদেশে নয়টি সরকারী কলেজের মধ্যে প্রেসিডেন্সী সহ আটটি কলেজেই এফ. এ., বি. এ. এবং এম্. এ. ক্লাশে ইংরেজির অধ্যাপক পদে সরকার ভারতীয়দের নিযুক্ত করেছেন। এভাবে অকাট্য তথ্য ও নজির দেখিয়ে অবশেষে আশুতোষ বললেন—

"I trust I shall be forgiven if I say that to employ Indians as the main agency for imparting Western education to Indians, and then to complain that these Indians have a dominant influence in the administration of their University, is neither logic nor good sense."[৮]

শিক্ষকতায় অধিক সংখ্যায় ভারতীয়দের নিয়োগ, অথচ শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণে তাঁদের দূরে রাখার একচোখা সরকারী দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন যৌক্তিকতা দেখতে না পেয়ে আশুতোষ সরকারের মানসিক প্রবণতাকে এরূপ কটাক্ষ করেন।

---

৬. ৭. ৮. Hundred Years of the University of Calcutta.

যৌথ ব্যবস্থাপনায় উচ্চ শিক্ষা পরিচালনার প্রস্তাব : 'অতি যত্নে গাছের বাড়ন কমে যায়'

আশুতোষ উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা পুরোপুরি বেসরকারী নিয়ন্ত্রণে ছেড়ে দেবার পক্ষপাতীও ছিলেন না। তবে তিনি মনে করতেন উচ্চ শিক্ষার ব্যবস্থা ও উন্নতিসাধন যে কোন জনকল্যাণকামী সরকারের অন্যতম কর্তব্য হওয়া উচিত। তিনি ছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য চিন্তা ভাবনার সমন্বয়ে আস্থাশীল। তিনি বিশ্বাস করতেন, বেসরকারী ইউরোপীয় ও ভারতীয় শিক্ষানুরাগীদের নিয়ে সিনেট গঠিত হলেই তা কার্যকরী ও সুফলপ্রসূ হবে এবং সর্বসাধারণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হবে। কিন্তু সরকার যে ভাবে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন ব্যবস্থা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখবার জন্যে, দেশীয় শিক্ষানুরাগীদের দূরে রেখে, সরকার মনোনীত ইউরোপীয় সদস্য দ্বারা সিনেট ভরপুর করে রাখতে চাইছে, এবং সিনেটকে সরকারী দপ্তরে পরিণত করতে প্রয়াসী হয়েছে, তা কোন মতেই তিনি সমর্থন করতে পারেন নি। কারণ, অতিরিক্ত সতর্কতা ও অতি-যত্নের আতিশয্যে ভাল গাছকেও বারংবার ছাঁটলে তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি যে ঘটে না তা আশুতোষ ভালভাবেই জানতেন—

> "I am not one of those who contend that high education must be left entirely to the control of the people. On the other hand I willingly concede that high education is one of the paramount duties of the State, and that it must be nurtured and developed under the fostering care of a beneficient Government. But I deny most emphatically that it is necessary or desirable to have any provisions in the law which may possibly convert the Universities into mere departments of the State ; *it is quite possible to stunt the growth of a beautiful tree by constant prunning and too affectionate care.*"[১]

মনোনয়নের চেয়ে নির্বাচন প্রথার অনুকূলে মত প্রকাশ

শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণে আশুতোষ বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয় যাতে একটা সরকারী দপ্তরে পর্যবসিত না হয় সেদিকে ছিল তাঁর সদাসর্তক দৃষ্টি। কিন্তু ১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সিনেটে অত্যধিক সংখ্যায় সরকার মনোনীত সদস্য এবং অতি সীমিত সংখ্যক নির্বাচিত সদস্যের বিধান

১. Imperial Legislative Assembly Proceedings, 1904.

থাকার ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কার্যতঃ সরকারী দপ্তরখানায় পরিণত হয়। সিনেটের ১০০ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ১০ জন রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণ কর্তৃক নির্বাচিত; বাকী ৯০ জনই চ্যান্সেলার কর্তৃক মনোনীত ইউরোপীয় বা সরকারের অনুগ্রহ-ভাজন ভারতীয় সদস্য। বে-সরকারী ভারতীয় শিক্ষাবিদদের সযত্নে বাদ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়দের প্রতি সরকারের এই বৈষম্যমূলক আচরণ এবং আস্থাহীনতায় ক্ষুব্ধ আশুতোষ বলেছেন—

"Every effort that we have made for securing a statutory recognition of the non-official and of the Indian element on the Senate has been strenuously opposed on behalf of the Government and has consequently failed."[১০]

সিনেটে প্রকৃত শিক্ষাব্রতীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়াতে আশুতোষ কলেজ শিক্ষকদের মধ্য থেকে কয়েকজন প্রতিনিধি নির্বাচনের যুক্তিপূর্ণ এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করে বলেন—

"If any scheme is accepted, we shall have—for instance, in the case of the University of Calcutta—an electorate of a possible maximum of 750, who will be permitted to elect ten amongst their own body. I do not entertain the slightest apprehension that an electorate like this, composed of Professors who are mostly Graduates of Indian or European Universities and who represent the interest of all the Colleges in the Country will in any way abuse the privilege conferred upon them."[১১]

কলেজ প্রশাসনে অতিরিক্ত নাক গলানোর বিপক্ষে

'Academic freedom' অর্থাৎ শিক্ষায় স্বরাজ বলতে আশুতোষ কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন নীতি নির্ধারক শাখার স্বরাজ বুঝতেন না। তিনি অনুমোদিত কলেজগুলির জন্যও ন্যায্য স্বায়ত্বশাসনের পক্ষপাতী ছিলেন; তবে সে সঙ্গে কলেজের পরিচালন ব্যবস্থার উপর প্রয়োজনবোধে বিশ্ববিদ্যালয়ের তদারকি ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয় মনে করতেন। কিন্তু বেসরকারী প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত কলেজগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সরকার নিয়ন্ত্রিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অতিরিক্ত খবরদারির বিরুদ্ধে তিনি সাবধানবাণী উচ্চারণ করেন—

"It is not desirable that there should be any undue interference with the internal managment of the Colleges or any

১০, ১১. Imperial Legislative Council Proceedings, 1904.

interference with the administration of their finance so long as proper efficiency is maintained."[১২]

কলেজ প্রশাসনে নতুন বিধানকে স্বাগত

তা সত্বেও নতুন বিধানে কলেজ পরিচালনায় ও পঠনপাঠনে উন্নতি ঘটবে বলে আশুতোষ বিশ্বাস করতেন। সে কারণে সংশ্লিষ্ট ধারাকে তিনি স্বাগত জানান—

"I welcome the provision of the Bill defining the requirements of an affiliated College, and I have no doubt that if these provisions are reasonably, judiciously and sympathetically enforced, they will tend to elevate the standard and character of our Colleges and thus necessarily to improve the character of the education imparted to our young men."[১৩]

কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্ক ও কলেজীয় শিক্ষার মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক অনুমোদিত কলেজগুলির উপর অনাবশ্যক ক্ষমতা ও অধিকার জাহির করার পরিবর্তে মৈত্রীসুলভ আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রাখা অত্যাবশ্যক বলে আশুতোষ মনে করতেন। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে অনুমোদিত কলেজের স্থান নির্ণয় করে তিনি বলেছেন—

"My conception of affiliation is a continuing and subsisting relation between the University and the College, and every safeguard ought to be provided for the practical achievement of this conception. When a College is affiliated, two elements, which I may describe as the material and the personal element, have to be taken into consideration. So far as the material element is concerned, under which head I include the College building, the laboratory and the residence of the students, it is little liable to sudden change or capricious alteration. But so far as the personal element is concerned, under which head I include the constitution of the Committee of management and the tutorial staff, it is liable to sudden changes."[১৪]

১২. ১৩. ১৪. Imperial Lagislative Council Proceedings, 1904.

শিক্ষা বিষয়ক আইন অদল বদলে সরকারী হস্তক্ষেপে বিরোধিতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ পরিচালন ব্যবস্থা ও শিক্ষাদান সম্পর্কিত বিষয়ে নীতি নির্ধারণ ও বিধিবিধান তৈরীর ক্ষমতা সরকারের হাতে ছেড়ে দেবার সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন আশুতোষ। কারণ, তিনি মনে করতেন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা বিষয়ে নিয়মবিধি তৈরীর দক্ষতা আছে কেবলমাত্র শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদেরই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে তেমন অভিজ্ঞ লোক কোথায় আছে? তাই সরকার কর্তৃক শিক্ষা সম্পর্কিত বিধিবিধান তৈরীর বিরুদ্ধে যুক্তি দেখিয়ে তিনি বলেন—

"I entirely dissent from the view that the Government should take power to add to or alter the regulations. Under the Act of Incorporation as also under this bill, regulations framed by the Senate do not acquire any binding character till they have received the aproval of the Government. The power of veto which the Government thus enjoy is......quite effective for all practical purposes....it seems to me quite inconsistent with the avowed character of the University as a body of experts, that an elaborate set of regulations framed by them should be liable to be modified by the Government, and I am unable to see where Government will get expert advice outside the Senate to help it in the performance of this delicate and difficult task."[১৫]

উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্ররূপে বিশ্ববিদ্যালয়

তবে উক্ত বিলে বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রাগ্রসর শিক্ষা ও গবেষণা (advanced study and research) কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার যে প্রস্তাব রয়েছে আশুতোষ তা সর্বান্তকরণে সমর্থন করেন। কারণ, যে কোন বিশ্ববিদ্যালয়েরই তা মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। প্রকৃতপক্ষে, ১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনের এই সরকারী সদিচ্ছার ফাঁকটুকুর সুযোগ নিয়েই আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৃহৎ পরীক্ষালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে পরিণত করার চাবিকাঠি লাভ করেন। তাই তিনি ঐ গুরুত্বপূর্ণ ধারার সমর্থন করেন—

১৫. Imperial Legislative Council Proceedings, 1904.

"We require teachers whose duty it will be not to impart elementary instruction for the purposes of the University examinations—which, after all, is only a secondary part in the work of a true University—but whose function it will be to extend the bounds of knowledge and to guide their students in their attempt to search out the secrets of nature."[১৬]

শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষের মানসিকতার ছাপ

সিমলা সম্মেলন, র‍্যালে কমিশন এবং সবশেষে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯০৪) আলোচনায় এতখানি স্থান ও সময়ক্ষেপের কারণ হল—প্রকৃত-পক্ষে এই আইনের সূত্রপাত থেকে প্রচলন অব্দি আলোচনা ও সমালোচনার মাঝেই আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার বীজ ও অঙ্কুরোদ্গম লক্ষ্য করা যায়—যা কালক্রমে মহামহীরুহে পরিণত হয়। বিচক্ষণ পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় আইনের গঠনমূলক সমালোচনাতেই আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার ক্ষীণ সূত্রটি নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে তাঁর মানসিকতার যে সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তা থেকে দেখা যায়—

(ক) আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শ্রেণীর শিক্ষাবিদদের সম্মিলনে বিশ্বাসী ছিলেন।

(খ) শিক্ষাক্ষেত্রে রাতারাতি ভারতীয়করণে তিনি উৎসাহী ছিলেন না—ক্রমান্বয়ে ভারতীয়করণ তাঁর কাম্য ছিল।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপের তিনি সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোর অধিকতর গণতন্ত্রীকরণে তিনি আগ্রহী ছিলেন।

(ঙ) সিনেটে শিক্ষকদের অধিকতর প্রতিনিধিত্ব তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করেছেন।

(চ) শিক্ষানীতি নির্ধারণে শিক্ষাবিদদের সম্পূর্ণ এক্তিয়ার তিনি চেয়েছিলেন।

---

১৬. Imperial Legislative Council Proceedings, 1904.

(ছ) উচ্চশিক্ষা প্রসারে সরকারের সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা কামনা করলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন।

(জ) তিনি তৎকালীন পরিস্থিতিতে উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসারে বিশ্বাসী ছিলেন।

(ঝ) অনুমোদিত কলেজগুলির পঠন-পাঠন ও পরিচালন ব্যবস্থায় উন্নতি বিধানে নতুন আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেবার বিধান তিনি স্বাগত জানান।

(ঞ) প্রত্যেকটি কলেজকে আবাসিক কলেজে পরিণত করে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে অধিকতর নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠতা তিনি কাম্য মনে করেছেন।

(ট) স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণাই হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য—শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণ নয়—এ সম্পর্কে ছিল আশুতোষের দ্বিধাহীন বিশ্বাস।

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার যে প্রতিফলন আইন সভার উপরিউদ্ধৃত ভাষণে পাওয়া যায়, তা পরিপুষ্টি লাভ করে এবং তার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে পরবর্তী কালে উপাচার্য হিসেবে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীতে, স্যাড্‌লার কমিশনের রিপোর্টে, অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথির অভিভাষণে এবং বিভিন্ন সাহিত্য সম্মেলনে সভাপতিরূপে প্রদত্ত ভাষণে। ঐ সকল ভাষণ, বক্তৃতা ও প্রতিবেদন থেকেই পাওয়া যাবে শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ভাবনার স্বরূপ, তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল সূত্রটি।

তার আগে আশুতোষের উপাচার্য পদে যোগদানের নেপথ্য কাহিনী সংক্ষেপে জানা দরকার।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অচলাবস্থা

সকল প্রতিবাদ প্রতিরোধ অতিক্রম করে কেন্দ্রীয় আইন সভায় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুমোদিত হল। কিন্তু নতুন আইনে সিনেটের সদস্য সংখ্যা হ্রাস, সিণ্ডিকেটের সদস্য সংখ্যা যথাসম্ভব সীমিতকরণ, নির্বাচনের চেয়ে মনোনয়ন প্রথায় বেশীর ভাগ সদস্যের নিযুক্তি, কলেজ অনুমোদনে কড়াকড়ি, বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ পরিচালনসভা থেকে শিক্ষকদের দূরে রাখা, চ্যান্সেলার তথা লাট সাহেব কর্তৃক উপাচার্য নিয়োগ, এবং সার্বিক

নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকায় কার্যতঃ বিশ্ববিদ্যালয় সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানে পর্যবসিত হয়। এই প্রগতিবিরোধী আইনকে লোকে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখল। সংবাদপত্রে জনসমাবেশে তার কঠোর সমালোচনা হয়। কার্জনীয় কার্যকলাপে যাঁরা সহযোগিতা করেন, তাঁদেরও দেশবাসী ভাল চোখে দেখে নি।

উপাচার্য পদে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯০৪ খ্রীঃ ১লা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন আইন প্রবর্তিত হয়। নতুন আইনে স্যার আলেকজাণ্ডার পেড্‌লার প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন। তাঁর কার্যকাল দুই বছর। কিন্তু এই দুই বছরের মধ্যে তাঁর প্রধান কাজ—নবগঠিত সিনেট কর্তৃক নতুন নিয়মবিধি (Regulations) রচনা ও অনুমোদন করে যেতে পারেন নি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংগঠনিক সংস্কারে ও পুনর্গঠনে দারুন অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। তখন সমগ্র বঙ্গদেশ বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী বিক্ষোভে বারুদাগারে পরিণত। সেও আর এক কার্জনীয় কীর্তি। এরকম উত্তপ্ত আবহাওয়ায় ১৯০৬ খ্রীঃ মার্চ মাসে পেড্‌লার অবসর নিলে, সরকার উপায়ান্তর না দেখে আশুতোষকে আহ্বান করলেন উপাচার্যের দায়িত্ব ভার গ্রহণ করতে। ১৯০৬ খ্রীঃ ৩১শে মার্চ আশুতোষ উপাচার্য পদে বৃত হলেন। তাঁর আশৈশব স্বপ্ন সফল হল। যে আইনের তিনি ছিলেন অন্যতম কঠোর সমালোচক, ঘটনাচক্রে কার্যক্ষেত্রে সেই আইন প্রয়োগের ভার গ্রহণ করতে হল তাঁকেই। এ যেন আশুতোষের সামনে এক বিরাট চ্যালেঞ্জ; কঠোর অগ্নিপরীক্ষা। আশুতোষ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করলেন। অগ্নিপরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন। সমালোচক থেকে কেমন করে সার্থক সংগঠকে রূপান্তরিত হওয়া যায়, তা দেশবাসীকে দেখিয়ে দিলেন। তার বছর দুই আগে বিশ্ববিদ্যালয় আইন নিয়ে তর্কবিতর্কের ডামাডোলের মাঝে তিনি ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হন। আশুতোষ মনের মতো কর্মক্ষেত্র ও শিক্ষাকর্মক্ষেত্র খুঁজে পেলেন।

ভারত সরকারের পক্ষ থেকে আশুতোষের উপাচার্য পদে যে নিয়োগ পত্র আসে সেই ঐতিহাসিক পত্রখানি ১৯০৬ খ্রীঃ ৩১শে মার্চ সিনেটে উত্থাপিত হয়। আশুতোষকে অভিনন্দন জানিয়ে সদস্যদের বক্তৃতা এবং তদুত্তরে আশুতোষের ভাষণটুকু সেদিনের কার্য বিবরণী থেকে উদ্ধৃত করা গেল—

MINUTES OF THE SENATE

FOR THE YEAR 1905-1906.

No. 18.

THE 31ST MARCH, 1906.

Present :

THE HON'BLE MR. JUSTICE ASUTOSH MOOKERJEE, SARASWATI, M.A., D.L., F.R.A.S., F.R.S.E., *Vice-Chancellor, in the Chair.*

Rev. Father E. Lafont, S. J., C. I. E., M. I. E. E.
Dr. P. K. Ray, D. Sc.
Sir Gooroo Dass Banerjee, Kt., M. A., D. L.
Babu Gaurisankar De, M. A., B. L.
Maulavi Serajul Islam, Khan Bahadur, B. L.
Rai Debendranath Ray, Bahadur, L. M. S.
H. M. Percival, Esq., M. A.
The Hon'ble Mr. Justice Saradacharan Mitra, M. A., B. L.
Mahamahopadhyay Haraprasad Sastri, M. A.
Babu Umeschandra Datta, B. A.
G. W. Küchler, Esq., M. A.
C. Little, Esq., M. A.
Babu Herambachandra Maitra, M.A.
Babu Ramendrasundar Trivedi, M.A.
M. Prothero, Esq., M. A.
Babu Debaprasad Sarbadhikari. M. A., B. L.
The Hon'ble Babu Bhupendranath Basu, M. A., B. L.
W. H. Arden Wood, Esq., M.A., F. C. S., F. R G. S.
Dr. Suresprasad Sarbadhikari, M.D.
Rai Chunilal Basu, Bahadur, M. B., F. C. S.
Dr. Upendranath Brahmachari, M. A., M. D.
Dr. E. D. Ross, Ph. D.
H. R. James, Esq., M. A.
C. Russel, Esq., M. A.
Rev. R. Gee, M. A.
G. C. Bose, Esq., M. A., F. C. S.
Rev. A. B. Wann, M. A., B. D.
Babu Surendranath Banerjee, B. A.
J. N. Dasgupta, Esq., B. A.
W. H. Everett, Esq., B. A., B. E., M. I. E. E.
The Hon'ble Mr. Justice B. G. Geidt.
P. J. Brühl, Esq., M. I. E. E., F. C. S., F. G. S.
Rai Troyluckonath Banerjee, Bahadur.
S. K. Ratcliffe, Esq.

756. The Vice-Chancellor called upon the Registrar to read the following letter from the Government of India.

No. 186.

FROM

H. H. RISLEY, ESQ., C.S.I., C.I.E.,

Secretary to the Government of India.

TO

THE REGISTRAR OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.

Home Department
(Education) Calcutta, the 31st March, 1906

SIR,

I am directed to state, for the infomation of the Syndicate and Senate of the Calcutta University, that the Governor-General in Council has been pleased to appoint the Hon'ble Mr Justice Asutosh Mookerjee, M. A., D. L., F. R. A. S., F.R.S.E., to be Vice-Chancellor of the University in sucession to Sir Alexander Pedler, kt., C.I.E., F.R.S., who has resigned.

I have & c.,
H. H. Risley,
Secretary to the Government of India.

Sir Gooroo Dass Banerjee said :—

Before we proceed to the regular business of the day, I beg to propose that we accord a hearty welcome to our new Vice-Chancellor. It is true he is not a stranger to us, but this is only a very good reason why we should make out welcome as hearty as possible, for the welcome we are going to accord to him is no mere matter of conventional civility, but is the outcome of genuine feeling. The brilliant academic and professional career of Mr. Justice Mookerjee and the many valuable

services he has rendered to the University in various capacities for a period of more than sixteen years, point to his being eminently qualified for the office to which he has been appointed, and we earnestly hope and confidently trust—that under his guidance the Senate and the Syndicate will be able to bring about all necessary and desirable reforms in the University, and we may give him our assurance that so far as the matter of introducing improvements into the Unlversity is concerned he may rely upon our cordial support.

Babu Surendranath Banerjee said :—

I desire to associate myself thoroughly with the vote which has just been moved. Mr. Justice Mookerjee is one of the foremost figures of this University and has been so for a period of nearly twenty years. At the present moment there is a strong feeling outside that the fate of high education is trembling in the balance. Whether that feeling is rightly founded or whether it is altogether an erroneous impression is entirely beside the question. The impression is there and it finds expression in the public prints and the utterances of our public men. At such a time Mr. Justice Mookerjee is placed in the responsible position of being at the head of this University. The public rely on him with confidence for guiding the affairs of the University in such a manner—with that discretion, tact and judgment which qualities he possesses in such an eminent degree—that the interests of high education may be safeguarded. I feel sure that he will justify the confidence which the Government has reposed in him and which is shared by his countrymen, so that during his tenure of office the cause of high education will grow and prosper in this country.

The Rev. Father E. Lafont, in supporting the motion, desired to add a tribute of praise from one who had known Mr. Justice Mookerjee during the whole of his University career. When Mr. Justice Mookerjee was appointed Vice-Chancellor he was delighted for one special reason, and that was that he was sure that their business would be despatched with confidence and also with promptitude. He eulogised Mr. Justice Mookerjee's work in the Syndicate and said that the

new Vice-Chancellor had such an intimate knowledge of the by-laws of the University, that he condensed everything and expedited business. This was exemplified by Mr. Justice Mookerjee's work in the Syndicate. No one knew more about the affairs of the University than Mr. Justice Mookerjee. In the name of the European Fellows he could say that they were at one with the Indian Gentlemen in accepting Mr. Justice Mookerjee as their Vice-Chancellor from their hearts.

Babu Umeschandra Datta supported the motion.

Maulavi Serajul Islam, on behalf of the Mahomedan members, also supported the motion.

The motion was carried by applause.

The Vice-Chancellor said :—

Sir Gooroo Dass Banerjee and gentlemen, I am deeply grateful to you and to all my colleagues on the Senate for the kind and cordial welcome you have accorded me. The office of Vice-Chancellor is no doubt one of high distinction, but it is also one of great responsibility, and the responsibility is increased by the circumstances that the University is now passing through a period of transition. It is my ambition during my term of office to do all I can to promote the best interests of the University and to elevate the standard of education in so far as it can be done under existing conditions and circumstances. It has been recently said by one of the most distinguished Vice-Chancellors of an English University that a Vice-Chancellor in order to be efficient and successful must have good health, good temper, some tact, and a great deal of common sense. If I lack any of these qualifications I feel confident that my deficiencies will be amply supplied by the judgment and experience of so many distinguished members of the Senate among whom it is my high privilege to count not a few of the teachers of my own early days. I earnestly appeal to each and every one of you to co-operate with me in the attainment of the object which I have in view.

বলাই বাহুল্য, আশুতোষ সিনেট সদস্যদের প্রত্যাশা আশাতীতভাবে পূরণ করেছিলেন।

নিয়মবিধি রচনায় অতুলনীয় ক্ষিপ্রতা—আশুতোষের কাজের ধারা

শিক্ষা ও রাজনীতি ক্ষেত্রে টালমাটাল অবস্থার মাঝেই আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার হলেন। উপাচার্য নিযুক্ত হবার পর তাঁর প্রথম কাজ হল নতুন আইন অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার জন্য নতুন নিয়মাবলী রচনা করা। সরকারের সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল—১১ আগষ্টের মধ্যে নিয়মবিধি তৈরী করতে হবে। সরকার আশুতোষকে সভাপতি করে এই উদ্দেশ্যে ৬ সদস্যের এক ছোট কমিটি গঠন করে। সমিতি কাজ আরম্ভ করে ৯ মে এবং শেষ করে ৯ জুলাই। মাত্র দুই মাসে পঞ্চাশটি অধিবেশনে এই বৃহৎ কর্ম শেষ হয়—যা তার আগে ২ বছরেও সম্ভব হয় নি। আশুতোষের কর্মশক্তি, কর্মনিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার এ এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত এবং ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় ক্ষিপ্রকারিতার মাপকাঠি হয়ে রইল।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, ১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনকে কেন্দ্র করে শিক্ষিত সমাজে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এই আইনে শিক্ষার সম্প্রসারণ না হয়ে অঙ্কোচন ঘটবে—এই আশঙ্কা করে অনেক আন্দোলন আস্ফালন চলে এবং যথারীতি কিছুদিন পর তা থিতিয়ে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীর এই তেজী-মন্দী মনোভাবে উষ্মা প্রকাশ করে "বঙ্গদর্শনে" লিখলেন—

"আন্দোলনের সভায় আমরা যে পরিমাণে সুর চড়াইয়া কাঁদিয়াছিলাম, রং ফলাইয়া ভাবী সর্বনাশের ছবি আঁকিয়াছিলাম, আমাদের বর্তমান নিশ্চেষ্টতা কি আমাদের সেই পরিমাণ লজ্জার বিষয় নহে।"

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেশবাসীর এই দপ্ করে জ্বলে ওঠা এবং ফুস করে নিবে যাওয়ার কারণ নির্ণয় করে বলেছেন—"ইহার একটা কারণ বোধ হয় বিল যেভাবে পাশ হইয়াছিল, তাহা কার্যক্ষেত্রে আসিয়া অনেকখানি ভোঁতা হইয়া গেল; কলেজের শিক্ষা ব্যাপকভাবে ও গভীরভাবে সেই হইতে চলিল; অবশ্য সে জন্য দায়ী প্রাতঃস্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিভা।"

বিকাশ পর্ব

প্রথম অধ্যায়

আশুতোষের শিক্ষাদর্শন

আশুতোষের শিক্ষাদর্শন—তাঁর শিক্ষাচিন্তার মৌলিক উপাদান সন্ধানে—আশুতোষের সমাবর্তন ভাষণের বৈশিষ্ট্য—এক নজরে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা—তাঁর শিক্ষা পরিকল্পনা—বিপিন পাল প্রসঙ্গ—জ্ঞানালোকের গতিমুখ নিম্ন-গামী—পরিস্রুতিবাদে তাঁর আস্থা—স্কুল ও কলেজীয় শিক্ষায় শোচনীয় দুরবস্থা—তাদের শিক্ষা প্রসারের উপযুক্ত বাহন করে তুলতে হবে—মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতি প্রসঙ্গে—আদর্শ অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে আবাসিক কলেজে অধ্যয়ন সম্পর্কে উচ্চ ধারণা—ছাত্রাবস্থায় ধর্মীয় শিক্ষা অবাঞ্ছনীয় : নীতিশিক্ষা চলতে পারে।

*　　　*　　　*　　　*

আশুতোষের শিক্ষাদর্শন

আশুতোষ শিক্ষা বিষয়ক কোন নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবন করেন নি। "Asutoshian theory on Education" নামে তাঁর নামাঙ্কিত কোনরূপ মৌলিক শিক্ষাপদ্ধতি বা রীতি প্রচলিত নেই। কোন পূর্ব-কল্পিত মতবাদ বা শিক্ষা-তত্ত্ব অনুসরণ করে তিনি শিক্ষা সংস্কারে অগ্রসর হন নি। শিক্ষা সম্পর্কে কোন লিখিত তত্ত্বকথা মারফৎ তিনি তাঁর মতবাদ প্রচার করেন নি। তিনি ছিলেন শিক্ষা-নায়ক, শিক্ষা-সংগঠক, মূলত শিক্ষা-সংস্কারক। তৎকালীন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি শিক্ষা ব্যবস্থায় যে সব অপূর্ণতা লক্ষ্য করেছেন, তা থেকেই তাঁর মনে শিক্ষার স্বরূপ, উদ্দেশ্য, আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে নিজস্ব এক ধারণা গড়ে উঠে। পরাধীন দেশে অনিচ্ছুক সরকারের প্রজা-স্বার্থ-প্রতিকূল শিক্ষানীতির মাঝে কাজ করতে গিয়ে পদে পদে যে বাধা ও প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়েছিলেন, সে সব প্রত্যক্ষলব্ধ অভিজ্ঞতাই তাঁর নিজস্ব শিক্ষানীতি প্রণয়নে প্রেরণা জোগায়। স্বীয় চিন্তা-ভাবনা অভিজ্ঞতাপ্রসূত বলেই শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর ধ্যান ধারণা অন্য কারো সঙ্গে খাপ খায় না।

শিক্ষার ব্যাপারে আশুতোষ 'theoretician' বা ভাববাদী নীতিবিদ্ ছিলেন না। তিনি ছিলেন বাস্তববাদী প্রয়োগবিদ্। সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে গিয়ে তিনি হাতে কলমে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে যে সব পন্থা অবলম্বন করেছেন, অথবা অবলম্বনীয় মনে করেছেন, অথচ করতে পারেন নি,—তাই তাঁর শিক্ষানীতি বা শিক্ষাচিন্তা।

"আশুতোষের শিক্ষাচিন্তাই প্রকৃতপক্ষে তাঁর শিক্ষাদর্শন। যদিও তিনি এ সম্বন্ধে কোন প্রণালীবদ্ধ গ্রন্থ রচনা করেন নি, দীর্ঘ ৩৫ বছরের সাধনায় (১৮৮৯-১৯২৪) এ তৈরী হয়েছে ধীরে ধীরে, আস্তে আস্তে ফুটেছে শিক্ষা-পদ্মের পাপড়িগুলি। এই শিক্ষাদর্শন সংরক্ষিত হয়েছে তাঁর সমাবর্তনী বক্তৃতায়, অন্যান্য ভাষণে এবং অধিষদ ও নিষদের কার্যক্রমে। কার্যক্রম থেকে এক সুস্পষ্ট শিক্ষাদর্শন ভেসে উঠেছে, বিবৃত হয়েছে জীববিদ্যা, সমাজবিদ্যা, ইতিহাস ও ধর্ম। এত দিকে জ্ঞান তাঁরই ছিল..."[১৭]

এবার বিচার্য তাঁর শিক্ষাদর্শনের উপাদানগুলি।

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার মৌলিক উপাদান সন্ধানে

যে সমস্ত কর্মবীর ও চিন্তানায়ক ইতিহাসে তাঁদের কর্মপ্রতিভা, সংগঠনশক্তি এবং চরিত্রগৌরবের স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যান, তাঁদের জীবন ও কর্মশক্তির মূল উৎসমধ্যে প্রবেশ করতে হলে নিজস্ব বক্তব্য, রচনা ও ভাষণের উপর নির্ভর করাই সঙ্গত। আশুতোষ ছিলেন মুখ্যত একজন শিক্ষা সংস্কারক। এই দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের কাজে তিনি জীবনের সর্বাধিক সময় নিয়োগ করেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আদিম কাঠামো ভেঙে তিনি তাকে নতুন ভাবে যুগোপযোগী করে গড়েছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১৪ এবং ১৯২১—১৯২৩ খ্রীঃ পর্যন্ত দশ বছর কাল উপাচার্য হিসেবে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর বহুমুখী চিন্তা ভাবনা অনুধাবন করতে হলে, বার্ষিক সমাবর্তন বক্তৃতাগুলি তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণের পক্ষে বিশেষ সহায়ক। সমাবর্তন ভাষণগুলিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক কর্মযজ্ঞের এবং অভাবঅভিযোগের কথা তাঁর নিজের মুখে বিবৃত হয়েছে। সিনেট ও ফ্যাকাল্টি কাউন্সিলের সাধারণ সভায় প্রদত্ত ভাষণেও তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় মেলে। বাংলা ভাষা ও অন্যান্য

১৭. আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা—অনিল বিশ্বাস।

ভারতীয় সাহিত্যের উন্নতি বিধানে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি এবং কোন্ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সিদ্ধিমানসে তিনি মাতৃভাষাকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পঠন পাঠনের ব্যবস্থা করেছেন, তা জানা যায় বিভিন্ন সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত আশুতোষের ওজস্বিনী ভাষণ থেকে।

সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগঠনে ও শিক্ষা-সংস্কারে তাঁর অমানুষী প্রতিভা কি অসাধ্য সাধন করেছিল, তাঁর চিন্তাধারা কোন্ পথে পরিচালিত হয়েছিল, তার মূলানুসন্ধান করতে গেলে, আশুতোষের শিক্ষামুখর জীবনের পরিচয় পেতে হলে, তাঁর প্রদত্ত বক্তৃতা ও ভাষণের মধ্যেই সূত্রানুসন্ধান করা উচিত।

আশুতোষের সমাবর্তন ভাষণের বৈশিষ্ট্য

'Convocation Address' বা সমাবর্তন ভাষণ দান ইদানীং কালের উপাচার্যদের এক তাৎপর্যহীন গতানুগতিক বার্ষিক রেওয়াজ। কিন্তু আশুতোষের সমাবর্তন ভাষণ কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকাণ্ডের বাৎসরিক ফিরিস্তি ছিল না। তাঁর সমাবর্তন ভাষণে পাওয়া যায় জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতি-ঐতিহ্য, শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞান, সামাজিক-রাজনৈতিক পর্যালোচনা এবং অতীতের গর্ব, বর্তমানের আকাঙ্ক্ষা ও ভবিষ্যৎ স্বপ্নের প্রতিচ্ছায়া। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে প্রদত্ত দশটি এবং মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রদত্ত একটি—মোট এগারটি সমাবর্তন ভাষণ থেকে মিলবে আশুতোষের শিক্ষা চিন্তার সামগ্রিক রূপ।

উপাচার্যরূপে আশুতোষ প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯০৭ খ্রীঃ। প্রথম ভাষণেই তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বাংলাদেশে শিক্ষাসম্পর্কিত সমস্যাবলীর যে সামগ্রিক সুচিন্তিত ও সুনিপুণ বিশ্লেষণ করেছিলেন, আজও তার মূল্য হ্রাস পায় নি। ১৯০৮ খ্রীঃ প্রদত্ত দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রদত্ত বলে 'জুবিলী' বা সুবর্ণ জয়ন্তী ভাষণ নামে খ্যাত—পাঠ করলেই শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষের চিন্তাভাবনার সুদূরপ্রসারী, বহুমুখী ও সর্বত্রগামী বিরাট পটভূমি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। উক্ত দু'টি সমাবর্তন ভাষণে তিনি যে সকল প্রধান প্রধান বিষয়ে সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ করেন তা হল :—

a) School and College education—deficiency and improvement.
b) Function of the University.

c) Abuses of examination system.
d) Post-graduate teaching.
e) Importance of research.
f) Learning and Research inseparable in higher studies.
g) Religious studies in student life discouraged.
h) Medium of instruction should be mother-tongue at least at Matriculation stage.
i) English for higher education.
j) Relations between the Government and the University.
k) Call to the graduates—their duties to the society and the coutry.
l) Call to the students : Be proud of your heritage.
m) Duties of teachers—Teachers and politics.
n) Students and politics.
o) Benefits of residential-type colleges.

শুধু ১৯০৮' এর ভাষণ নয়, আশুতোষ প্রদত্ত প্রত্যেক ভাষণেই সমাজ, শিক্ষা ও জাতির স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় বিস্তারিত আলোচিত হয়েছে।

এক নজরে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা

"আমার জীবনই আমার বাণী" —কথাটি অনেক মহাত্মা মহামানবই বলে গেছেন। কিন্তু আশুতোষই মনে হয় এ কথাটি যথার্থ জোরের সঙ্গে বলার অধিকারী। বরং আর একটু ঘুরিয়ে বলা চলে "আমার জীবনই আমার বিশ্ববিত্থালয়"। আশুতোষ সম্পর্কে একথা অবশ্য তাঁর প্রতিপক্ষরা বহু আগেই বলে গেছেন—

> "........he represented the University so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sir Asutosh."—Lord Lytton.

তবে আশুতোষ কেবলমাত্র বাণী দিয়েই দায়িত্ব খালাস করেন নি ; কর্মে এবং বাণীতে, কথায় এবং কাজে অবিশ্বাস্য সমন্বয় ঘটিয়েছেন। বরং কথার চেয়ে কাজেই ছিল তাঁর ঐকান্তিক নিষ্ঠা। বিশ্ববিত্থালয়ের কাজের মধ্যেই প্রকাশ পেয়েছে জাতির শিক্ষার চিত্র ও চরিত্র সম্পর্কে তাঁর চিন্তাভাবনা—যা অপর কোন উপাচার্য এমন প্রাঞ্জলভাবে জনমানসে তুলে ধরতে পারেন নি।

শুধু মাত্র তাঁর প্রথম বা দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণ নয়, পরবর্তী প্রত্যেকটি ভাষণেই তিনি শিক্ষাক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যার উল্লেখ ও সমাধানের পথ নির্দেশ করেছেন। সেগুলির মাঝেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কীয় ধ্যান ধারনা ও নতুন রূপদান প্রচেষ্টার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত মেলে। বিভিন্ন ভাষণ ও বক্তৃতায় তাঁর চিন্তাধারায় যে পরিচয় পাওয়া যায়, এবং যা সম্মিলিতভাবে তাঁর 'শিক্ষাচিন্তা' বলে পরিগণিত হতে পারে—তা সংক্ষেপে নিম্নরূপ :—

(ক) শিক্ষা জলের ন্যায় নিম্নগামী। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্প্রসারিত হলে তার অপ্রতিরোধ্য ধারা জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত হবে। তাই তৎকালীন পরিস্থিতিতে উচ্চ শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে সর্বজনীন শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে।

(খ) আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করেছেন. স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পরস্পর নির্ভরশীল ও সম্পর্কযুক্ত প্রতিষ্ঠান বলে ঘোষণা করেছেন।

(গ) তাঁর দৃষ্টিতে শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্র অপরিহার্য। শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষাবিদদের স্বাধীন চিন্তার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার অত্যাবশ্যক।

(ঘ) বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা বাঞ্চনীয়। সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সম্পর্ক অহি-নকুলের নয়, পরস্পর আস্থা ও বিশ্বাসের ওপর তা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ পরিচালনায় সরকারী হস্তক্ষেপ চলবে না।

(ঙ) ছাত্রদের কর্তব্য—অধ্যয়নই তাদের তপস্যা। স্কুলে ছাত্রদের পক্ষে প্রত্যক্ষ রাজনীতি সম্পূর্ণ বর্জনীয়। পাঠ্যাবস্থায় রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলা উচিত। পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রগণ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় দর্শন সম্পর্কিত গ্রন্থাদি পাঠ করবে ; কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ-করবে না।

(চ) প্রকৃত আদর্শ শিক্ষক হবেন পরিপূর্ণ রাজনীতিমুক্ত। ছাত্রদের সামনে সর্বব্যাপারে নিজেকে আদর্শ ও অনুকরণীয় করে তোলাই শিক্ষকের কাজ। তিনি ছাত্রদের শিক্ষাদীক্ষায়, আচার-আচরণে, কথাবার্তায়, দেহে-মনে স্বাধীন দেশের সুনাগরিক করে

তুলবেন। তাঁর পক্ষে একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে ও রাজনীতিক্ষেত্রে বিচরণ অনভিপ্রেত।

(ছ) স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়—এই তিনটি স্তরে পাঠক্রম কেমন হবে, আশুতোষ তা স্থির করে দিয়েছেন। তেমনি ছাত্র, শিক্ষক ও পাঠক্রম—এই তিনের সুষ্ঠ সম্মিলনে উপযুক্ত শিক্ষণ-পদ্ধতি গড়ে তোলার দিকে ছিল তাঁর সদাসতর্ক দৃষ্টি।

(জ) ছাত্রদের মন থেকে পরীক্ষা-ভীতি দূর করতে তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন। সে উদ্দেশ্যে প্রশ্নপত্র রচনা-পদ্ধতির আমূল সংস্কার সাধন করেন। ছেলে ঠকান বা প্রশ্নকর্তার বিদ্যা জাহির করা প্রশ্নপত্র রচনার প্রথা বাতিল করেন। তেমনি উত্তরপত্র মূল্যায়নের কড়াকড়িও হ্রাস করেন। তাঁর মতে পরীক্ষার উদ্দেশ্য—ছাত্র কতটুকু শিখেছে, শিক্ষক কতটুকু শিখিয়েছেন এবং বৃহত্তর সমাজের কাজে লাগার মতো মানসিকতা ও কর্মক্ষমতা সে অর্জন করেছে কিনা—তাই যাচাই করে দেখা। তাঁর মতে নিছক পরীক্ষা ব্যবস্থার কড়াকড়িতেই শিক্ষার মান রক্ষা হয় না।

(ঝ) স্কুল কলেজ পর্যায়ে মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া উচিত। বিশ্ব-বিদ্যালয় স্তরে ইংরেজি শিক্ষার-বাহন হলেও কালক্রমে স্নাতকোত্তর স্তরেও মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হওয়া দেশ ও জাতির পক্ষে কল্যাণকর। সেই উদ্দেশ্যেই মাতৃভাষায় স্নাতকোত্তর পঠন-পাঠন, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী দানের ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়কে করতে হবে।

(ঞ) ছাত্রদের সুন্দর জীবন ও চরিত্র গঠনে আদর্শ শিক্ষকের সাহচর্যে আবাসিক কলেজের গুরুত্ব অপরিসীম।

(ট) শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষা অবাঞ্ছনীয়—তবে নীতিশিক্ষা চলতে পারে।

(ঠ) উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা পরস্পর নির্ভরশীল। গবেষণার সুযোগ বিহীন বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় বলাই অনুচিত।

(ড) শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি—দেশ ও সমাজের মঙ্গলার্থে বলি প্রদত্ত মানুষ গড়ে তোলাই হবে শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি।

উপরে বিবৃত বিষয়গুলি পর্যায়ক্রমে আলোচনা করলেই দেখা যাবে আশুতোষ সমগ্র জাতির স্থবির শিক্ষাচিন্তার গোড়ায় কেমন প্রচণ্ড নাড়া

দিয়েছেন। সুতরাং গঙ্গাজলে গঙ্গা পূজার মতো আশুতোষ প্রদত্ত সমাবর্তন ও অন্যান্য ভাষণ থেকেই তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপটি ধরার চেষ্টা শ্রেয়ঃ।

এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আশুতোষের ধারাবাহিক জীবনী নয়, কিংবা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে আশুতোষের সম্পর্কের দিনলিপিও নয়; বরং যে চিন্তা তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা সংস্কার ও সম্প্রসারণে প্রেরণা জুগিয়েছে এবং শিক্ষানায়ক হিসেবে যে চিন্তাধারাকে কার্যে রূপায়ণে তাঁর অদম্য ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ দেশের পরাধীনতা বশতঃ করতে পারেন নি, সমবেতভাবে তাই হল তাঁর শিক্ষাচিন্তা।

এবার ধাপে ধাপে তাঁর শিক্ষাবিষয়ক চিন্তাধারা আলোচনা করা যাক।

আশুতোষের শিক্ষা পরিকল্পনা

আশুতোষের শিক্ষা চিন্তার স্বরূপটি বুঝতে গেলে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ১৯১৮ খ্রীঃ শেষ দিকে এক দিন তিনি আশুতোষের বাসভবনে দেখা করতে যান। ইতিমধ্যে আশুতোষ আট বছরের উপাচার্য-কাল সমাপ্ত করেছেন। কিন্তু পোষ্টগ্রাজুয়েট কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসেবে তখনো তিনি বিজ্ঞান ও কলা বিভাগে বিভিন্ন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা সম্প্রসারণের কাজে গভীরভাবে লিপ্ত। অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন তথা স্যাডলার কমিশন'-এর সদস্যরূপে সারা ভারতে শিক্ষা ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে বেড়াচ্ছেন, এবং হাইকোর্টের অন্যতম প্রবীণ ও বিচক্ষণ বিচারক হিসেবে ভারতব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। বিপিন পালের সঙ্গে সাক্ষাতের কিছুদিন আগেই মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তনে এক ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়ে আসেন। সুতরাং শিক্ষাক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ব্যাপী বহুমুখী প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ চিন্তাধারাকে বিচারক সুলভ নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তিনি এই দেশের ও সমাজের পক্ষে উপযোগী ও হিতকরী এক সুনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ত শিক্ষাপ্রণালীর ছক মনে মনে গড়ে তোলেন এবং মহীশূর সমাবর্তন ভাষণে তা প্রকাশ করেন। কথা প্রসঙ্গে সেই ভাষণের উল্লেখ করে তিনি বিপিনচন্দ্রকে বলেন—"মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যে সব কথা বলেছি, কর্তাদের তা ভালো লাগবে না, জানতাম। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতে যে সকল কথা বলার সুযোগ এবং অধিকার নেই, ভারতের এই সামন্ত রাজ্যে সে সব কথা বলতে পারা যায়।

আমার Mysore Address টা পড়ে দেখবেন। সেখানে আমার মুখে মুখোস ছিল না। প্রাণখুলে সব কথা বলে এসেছি।"

আশুতোষের এই প্রাণ খোলা কথার মধ্যে সরকারী শিক্ষা নীতির স্বতীব্র সমালোচনা ছাড়াও ছিল শিক্ষা-সংস্কারক ও শিক্ষা প্রবর্তক আশুতোষের প্রাণের কথা। প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি থেকে মিলবে তার প্রমাণ—

"I shall presume the existence of a net-work of well-organised schools, training pupils for real university education, which is a development, an amplification and in many respects, a complement of school education. Such pupils when they seek admission into the university should be required to pass a fairly searching test, but the standard need not be ideally exacting and undoubtedly neither capricious nor arbitrary. It is required at this stage of the career of the students, that his power of expansion reasoning and observation should have adequately developed. He should, in the first place, have a place, have a thorough command over his vernacular ; he may be reasonably expected to possess an accurate knowledge of its grammatical structure and a fairly wide acquaintance with the best specimens of its literature ; he should also have regularly cultivated the art of composition and be able to express his ideas with care, elegance, clearness and precision; he should have acquired a sound working knowledge of English language, as distinguished from English literature, In the second place, his power of reasoning should have been developed by a practical study of select branches of the experimental sciences, including, if possible, experimental mechanics. Finally, his mental vision should have been widened by a study of a classical language, the geography of the world, the history of India and England and if possible, also by a rudimentary knowledge of modern history. A student of average ability and industry, who has had proper training in such a course through the medium of his vernacular, has by the age of 17, been equipped with the elements of a liberal education and should be fully qualified to receive the benefit of a three-year course for the first degree at a University.[১৮]

১৮. Address at the first convocation of Mysore University—19.10.1918.

(আমার কল্পনায় বিরাজ করছে দেশব্যাপী জালের মতো ছড়িয়ে থাকা সুসংগঠিত স্কুল সমষ্টি। সেগুলি থেকে তৈরী হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার—যা স্কুল শিক্ষারই উন্নত, সম্প্রসারিত ও পরিপূরক ধাপ—জন্য উপযুক্ত ছাত্র। এই ছাত্রগণ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি-প্রার্থী হবে তখন তাদের জ্ঞানবুদ্ধি পরখ করে নেবার মতো এক বাছাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। তবে সে পরীক্ষার মান নীতিগতভাবেই কঠোর হবার দরকার নেই, ভীতিকর ও স্বেচ্ছাচারমূলক তো নয়-ই। ছাত্রজীবনের এই পর্বে তাদের বিচার বিশ্লেষণ ও পর্যবেক্ষণ শক্তির যথাযথ প্রসারণ ঘটাতে হবে। প্রথমতঃ তার জাতীয় ভাষার উপর সম্পূর্ণ অধিকার থাকা চাই। ভাষার ব্যাকরণগত গঠনশৈলী সম্পর্কে নির্ভুল জ্ঞান থাকা উচিত। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিগুলির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়। নিজস্ব ভাষায় নিয়মিত রচনার চর্চা থাকা প্রয়োজন। নিজের ভাবনা চিন্তাগুলি সযত্নে সাবলিল ও পরিচ্ছন্ন ভাষায় সুনিপুণভাবে প্রকাশ করার দক্ষতা থাকা আবশ্যক। ইংরেজি ভাষায়, ইংরেজি সাহিত্যে নয় কিন্তু, কাজ চালাবার মতো নিখুঁত জ্ঞান থাকা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, প্রযুক্তি বিজ্ঞান বিষয়ে তো বটেই, সম্ভব হলে সে সঙ্গে প্রযুক্তি যন্ত্রবিদ্যারও নির্বাচিত শাখায় হাতেকলমে চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর বোধ-বিচার শক্তির পুষ্টি ঘটান উচিত। সবশেষে, প্রাচীন ভাষা, বিশ্বের ভূগোল, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের ইতিহাস অধ্যয়ন এবং সম্ভব হলে আধুনিক ইতিহাসে জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা করে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রবণতার প্রসার ঘটান উচিত। কোন সাধারণ মেধাসম্পন্ন ও পরিশ্রমী ছাত্র, মাতৃভাষার মাধ্যমে যদি এই ধরনের পাঠক্রমে শিক্ষা পায়, তা হলে ১৭ বছর বয়ঃপ্রাপ্তিকালেই প্রাগ্রসর শিক্ষার মৌল উপাদান তার আয়ত্ত হবে, এবং পরবর্তী ধাপে তিন বছরের এক পাঠক্রমে উত্তীর্ণ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রথম ডিগ্রী অর্জনের সম্পূর্ণ উপযুক্ত হয়ে উঠবে।)

আশুতোষের মতে জ্ঞানালোকের গতিমুখ নিম্নগামী

আধুনিক শিক্ষার আলোক-রশ্মি উপর থেকে বিকিরণ হবে, কি নিচু থেকে বিচ্ছুরণ হবে—এই প্রশ্নে আশুতোষ "filtration theory" তথা পরিশ্রুতি পদ্ধতির অর্থাৎ উচ্চ শিক্ষা প্রবর্তন ও প্রসারের মাধ্যমে নিম্নশিক্ষা প্রচারের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষা বিস্তারের প্রথম ধাপ যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার প্রসারণ, সে সম্পর্কে তার মনে কোন দ্বিধা ছিল না এবং তৎকালোচিত

দেশ ও সমাজের পরিস্থিতিতে তা অপরিহার্য ছিল। বিখ্যাত মহীশূর ভাষণে তিনি তা অকপটে ব্যক্ত করেছেন এবং স্বপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেছেন—

> "Let us expand our University; that is the first step in upward progress; from them will flow an irresistible stream of educational facilities for the elevation of the masses. Education is like water; to fructify it must descend. Pour out flood at the base of society and only at the base, it will saturate, stagnate and destroy. Pour it out on the summit; it will quietly and constantly percolate and descend, germinate every seed, feed every root, until over the whole area from summit to base will spring. Offer education free of charge to your student. Demolish the toll gates which bar the passage of light; *Let knowledge reach the ignorant mind as air goes to the tired lungs and water the parched lips.*"[১৯]

(আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সম্প্রসারিত হোক—প্রগতির পথে তাই হবে প্রথম পদক্ষেপ। তা থেকেই জনশিক্ষার অনুকূল সুযোগ সুবিধার এক অপ্রতিরোধ্য স্রোত প্রবাহিত হবে। শিক্ষা ঠিক জলধারার মতো: ভূমিকে উর্বরা ও ফলবতী করতে তাকে নিচে নামতেই হবে। কেবলমাত্র (সমাজের) ভিত্তিমূলে জলস্রোত বইয়ে দিলে তা জলমগ্ন হবে, জলবদ্ধ হবে এবং সবকিছু বিনষ্ট করবে। শীর্ষদেশে জল সিঞ্চন করলে তা নীরবে ক্রমাগত নিষিক্ত করতে করতে নিচে নামবে, প্রতিটি অঙ্কুর উদ্গম হবে, প্রতিটি বীজ-মূলকে তা আহার জোগাবে—শীর্ষদেশ থেকে মূলদেশ পর্যন্ত সমগ্র দেহ মুকুলিত করবে। বিনা ব্যয়ে ছাত্রদের মধ্যে শিক্ষা দান করুন। কর আদায়ের যে উচু দেউড়ি আলোর পথ অবরোধ করেছে তাকে উৎপাটিত করুন। যেমন ভাবে বায়ু পরিশ্রান্ত হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে, এবং শুষ্ক ওষ্ঠ জলপান করে, তেমনিভাবে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন মনভূমিতে জ্ঞান-রশ্মি পৌঁছতে দিন।)

আশুতোষ-পরিকল্পিত শিক্ষানীতিকে কার্যে রূপায়িত করতে হলে শুধু বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা নয়, কলেজ ও স্কুল শিক্ষার সার্বিক উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শিক্ষার ধারা বহন করে আনার জন্য স্কুল কলেজগুলিকে পুরাণের ভগীরথ হতে হবে। তারাই পারবে শাখানদী উপনদীর মতো শিক্ষা-স্রোতধারায় সারা দেশ পরিপ্লাবিত করে সে শিক্ষা জন-সমুদ্রে মিশিয়ে

১৯. Convocation Address at the Mysore University, 19.10.1918

দিতে। আশুতোষ মনেপ্রাণে তাই শিক্ষার পরিক্রুতিবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর শিক্ষাতত্ত্বে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা পরস্পর সম্পূরক। এই তিন ধাপের মধ্যে সম্পূর্ণ সংহতি না থাকলে কোন শিক্ষাই স্বয়ং সম্পূর্ণ হতে পারে না। শিক্ষার ক্রমবিকাশে আশুতোষ বিশ্বাসী। ১৯০৪ খ্রীঃ আইনে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে স্কুল ও কলেজ পরিচালনার উপর তত্ত্বাবধানের যে বিধান ছিল, তাতে আশুতোষের ছিল পূর্ণ সম্মতি। এবং ঘটনাচক্রে দুই বছর পর সেই আইন প্রয়োগের ভার পড়ল তাঁরই হাতে। তাই ১৯০৮ খ্রীঃ সমাবর্তন ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর স্কুল ও কলেজ শিক্ষার তদারকি এবং মানোন্নয়নের যে দায়িত্ব বর্তেছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এবং স্কুল কলেজের গঠন পাঠন পরিচালন ব্যাপারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবার সুদৃঢ় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। স্কুল কলেজগুলির শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে সেগুলির গঠন পাঠন ও পরিচালন ব্যাপারে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের আশু প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন—

"As I had occasion before to point out, the control of the University over the affiliated Colleges and recognised Schools, and the power of supervision created by the new Regulations, are likely to have far-reaching consequences. Henceforth it will be the first duty of the University to secure the efficiency of the Colleges, and to be assured that the recognised Schools are maintained as places, where sound education is imparted and strict discipline is enforced. We have within our jurisdiction more than fifty Colleges and over six hundred Schools; the reports upon their condition, which will require careful consideration, make it amply manifest that the Institutions where our boys and youngmen receive their training, are, I regret to say, almost without exception, much below the standard of efficiency contemplated by the new Regulations. I have no desire to magnify our difficulties, but at the same time, I feel keenly that it would be a fatal mistake to ignore them and to take a too optimistic view of the situation."[২০]

সে সময় বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম-ব্রহ্মদেশ পর্যন্ত এক্তিয়ারভুক্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধীনে ছয় শতাধিক স্কুল ও পঞ্চাশটির বেশী কলেজ ছড়িয়ে

২০. Calcutta University Convocation Address—1908.

ছিটিয়ে ছিল। সেগুলির অবস্থা আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। আশুতোষের ভাষায়—

"It is safe to say that the educational Institutions of the future, quite as much as those of the present, will be largely controlled, if not dominated by three factors—teachers, instruments and books. In each of these vital elements, the deficiency of our institution is remarkable. They are, without exception, undermanned, of Libraries and Laboratories there are only a few, if any, which can satisfactorily stand the scrutiny of the most reasonable test applied according to western ideals."[২১]

বিদ্যালয় শিক্ষার উন্নতি নির্ভর করে স্কুল কলেজ থেকে ভাল ছাত্র পাওয়ার উপর। সে কারণেই আশুতোষ স্কুল কলেজগুলির পঠন পাঠন ব্যবস্থা ও পরিচালনগত অবস্থা তদন্ত করে লেখাপড়ার সুষ্ঠু পরিবেশ গড়ে তোলার দিকে মনোনিবেশ করেন। "তিনি বলতেন, মৃত্তিকার তলদেশ থেকে প্রাণরস আহরণ ভিন্ন যেমন গাছের জীবনীশক্তি বৃদ্ধি পায় না, গাছ সতেজ হয় না, ফল দেয় না, তেমনি স্কুল-কলেজগুলি যদি সুগঠিত ও সুপরিচালিত না হয়, যদি সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিহীনভাবে না গড়ে ওঠে এবং ছাত্রদের মানসিক ও শারীরিক উৎকর্ষ বিধানে গোড়া থেকে মনোযোগ না দেওয়া হয়, তাহলে বিশ্ববিদ্যালয় তার প্রাণরস আহরণ করবে কোথা থেকে?"[২২] বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার মান ঠিকভাবে বজায় রাখতে হলে ছাত্রদের স্কুল জীবনের বনিয়াদ পাকাপোক্তভাবে গড়ে তোলা উচিত। তা না হলে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার মান অবনত হতে বাধ্য। "মাধ্যমিক শিক্ষার রূপ ও রীতি (আশুতোষের কথায় tone and standard) ঠিক মত যাতে বজায় থাকে সেই উদ্দেশ্য নিয়েই তিনি স্কুলগুলির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণক্ষমতা দাবি করেছিলেন এবং নব গঠিত নিয়মাবলীর মাধ্যমে সেই ক্ষমতাকেই বাস্তবে রূপায়িত করতে অগ্রসর হয়েছিলেন।"[২৩] আর, কলেজীয় শিক্ষা ও পরিচালনা সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়-এর কর্তব্য নির্ধারণ করে আশুতোষ ১৯০৭ খ্রীঃ প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই বলেন—

২১. Calcutta University Convocation Address—1908.

২২, ২৩. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি

"প্রথম বিষয়টি হল অনুমোদিত কলেজের উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণ। বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে এতদিন আমাদের একমাত্র কাজ ছিল পরীক্ষা গ্রহণ ও উপাধি বিতরণ, আমরা কখনো কলেজ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করি নি। নববিধানে, কলেজগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের অচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবেই গণ্য হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তব্য হবে তাদের যোগ্যতা দেখা। এতে সূত্রপাত হলো এক নতুন অধ্যায়ের।"[২৪]

তিনি সব সময় ত্রি-স্তর শিক্ষা ব্যবস্থা অর্থাৎ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ব্যবস্থার যুগপৎ এবং সামগ্রিক উন্নতি বিধানে যত্নবান ছিলেন। "তাঁর আপ্রাণ প্রয়াসের সুফল শীঘ্রই দেখা গেল এবং বাংলার স্কুল-কলেজগুলি অনতি-বিলম্বে এক নতুন প্রাণ প্রবাহে সঞ্জীবিত হয়ে উঠল, উদ্বুদ্ধ হলো নতুন আদর্শে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার চেহারাটাই যেন রাতারাতি পরিবর্তিত হয়ে গেল কোন এক জাদুকরের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে। শিক্ষাক্ষেত্রে সেদিন এইটাই ছিল বিপ্লব।"[২৫]

স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার সমন্বয়সাধন আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার মূল কাঠামো। এই কাঠামোকে সচল গতিশীল ও প্রাণবন্ত করে তোলার মধ্যেই নিহিত আছে তাঁর শিক্ষাচিন্তার চাবিকাঠি। তাঁর মতে—

> "Education in the University is the development, the amplification, of School education, and on some issues its complement."[২৬]

আবাসিক কলেজ জীবন সম্পর্কে আশুতোষের উচ্চ ধারণা

আবাসিক কলেজ জীবন সম্পর্কে আশুতোষ খুবই উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। আবাসিক কলেজের ছাত্রদের জীবনে ও মননে তার সুফল সম্পর্কে ছিল তাঁর ভীষণ আস্থা। প্রাচীনকালে গুরুগৃহে বাসের মতো উপযুক্ত অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে ছাত্রগণ আবাসিক কলেজে শিক্ষা লাভ করলে, সর্বক্ষণ শিক্ষকের নৈকট্য ও ঘনিষ্ঠ সাহচর্যের দরুণ তাদের অধ্যয়নে ও চরিত্র গঠনে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। তিনি বলেন—

২৪. সমাবর্তন ভাষণ—(অনূদিত)

২৫. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচি

২৬. Convocation Address.

"If our boys are to grow up into healthy manhood, it is not enough that their intellectual faculties should be developed ; it is essential, that they should possess a healthy mind, they must be sedulously kept from the path of temptation ; they must be, to use a homely expression, housed and fed. Then and then alone will there be the growth of corporate life amongst our students and each college will finally be described as a corporation of teachers and students banded together for the promotion of learning....

I am optimistic enough to believe that the time is not far distant when we shall find ourselves in a fair way to realise this ideal (residential system)—an ideal which, it would be a mistake to suppose, is Western in origin and conception. According to the ancient Indian ideal, the student must, during the period of his pupilage, reside with his preceptor, serve him loyally and faithfully, and when he has finished his studies and entered the world, retain for ever the influence of the stimulus and inspiration he has received."[২৭]

ছাত্রজীবনে ধর্মীয় শিক্ষা অবাঞ্ছনীয়

আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ছাত্রদের নিজস্ব ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসন প্রণালী শিক্ষাদানে আশুতোষের সায় ছিল না। তবে ধর্মের আচার-আনুষ্ঠানিক দিক বাদ দিয়ে, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধক কবি ঋষিদের রচিত কাহিনী থেকে ছাত্রদের মনোজগতে প্রভাব ফেলতে পারে, তাদের নৈতিক চরিত্র গঠনে সহায়ক হতে পারে, যে সব আদর্শ অনুসরণ করে ছাত্রগণ সত্য, সদাচার ও সুনীতির প্রতি আকৃষ্ট হবে—যা সর্ব ধর্মের মূল নির্যাস অথচ মৌলবাদ নয়—তেমন কথাকাহিনী গল্পগাথার সঙ্গে ছাত্র সম্প্রদায়ের পরিচয় ঘটালে তাদের জীবনে তার প্রভাব প্রতিফলিত হবে, এই বিশ্বাস তিনি করতেন। তিনি বলেছেন—

"I have no faith in the efficacy of abstract religious maxims solemnly inculcated by grave teachers upon youthful minds which receive no impression from the process. But I believe, it would be far more profitable to illustrate the fundamental

২৭. Convocation Address—1908.

principles of every system of morals and religion by examples of truth, purity, charity, humility, self-sacrifice, gratitude, reverence for the teacher, devotion to duty, womanly chastity, filial piety, loyalty to the king, and of other virtues, appropriately selected from the great national books of Hindus and Mohamedans. These cameos of character, these ideals of our past, portrayed with surpassing loveliness in the immortal writings of our poets and sages, would thus acquire genuine respect for those principles of life and conduct which have guided in the past countless generations of noble men and women in this historic continent."[২৮]

২৮. Convocation Address—1908.

দ্বিতীয় অধ্যায়

উচ্চশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসার

উচ্চশিক্ষার মাধ্যমে জনশিক্ষা প্রসার নীতি—শ্যামসুন্দর চক্রবর্তীর মন্তব্য—আশুতোষের বিরুদ্ধে অভিযোগ—আশুতোষের জবাব ও কারণ প্রদর্শন—উচ্চ শিক্ষা প্রসারের গৌণ ফল—ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণনের অভিমত—অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তীর মন্তব্য

* * * *

দেশের তৎকালীন রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক অবস্থায় যে সর্বজনীন শিক্ষা প্রবর্তন কোন মতেই সম্ভবপর ছিল না, তা আশুতোষের চেয়ে কেউ তো ভাল জানতেন না। কারণ, সরকারী সাহায্য ও সমর্থন ব্যতিরেকে জনশিক্ষা প্রচলনের মতো বৃহৎ ব্যাপার কোন বেসরকারী প্রচেষ্টায় সফল হতে পারে না। অথচ সরকার সে বিষয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ। অধীনস্থ প্রজা সাধারণের চোখ কান ফুটুক তা কোন বিদেশী শাসক কি কখনও চায়! তা হলে তো অচিরেই সাম্রাজ্য লাটে উঠবে, তল্পীতল্পা গুটিয়ে স্বদেশযাত্রা করতে হবে। তারা তাদের শাসনরজ্জু টানবার মতো প্রয়োজন সংখ্যক কেরানী পেলেই হল। আশুতোষের কাছে সর্বজনীন শিক্ষা ব্যবস্থার কথা যারা তুলেছেন, "আমি তাঁহাদের নিকট শুনিয়াছি যে, তিনি অত্যন্ত আবেগভরে বলিয়াছেন, "ওহে বাপু সব বুঝি, কিন্তু যে দেশে বর্তমান অবস্থায় সাধারণ শিক্ষা কিছুতেই সম্প্রসারিত হইতে পারিতেছে না, সে দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়া শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা ভিন্ন গত্যন্তর আর কি আছে?" ইংরাজী ভাষায় যাহাকে Three R's বলে, আশুবাবুর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল, এই উচ্চ শিক্ষা কেন্দ্রগুলির ভিতর দিয়া সেই প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার। আশুবাবুর যে মহাভূত সমাধি ছিল তাহার একটা লক্ষণ হচ্ছে মন্ত্রগুপ্তি। গোখলে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, গভর্ণমেণ্টের বন্ধু ছিলেন—তাঁহার মনীষা প্রতিভা প্রভৃতিও একরূপ আদর্শ-স্থানীয় বলিলেও বলা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি যে হাটে হাড়ি ভাঙ্গিয়া বলিলেন Compulsory Education কর, Compulsory Education কর,

ঐখানে গৃহস্থ সজাগ হইয়া গেল। কিন্তু আশুবাবু বক্তৃতায় রচনায় চিরকালই বলিয়াছেন, 'আমি স্বর্গের সিঁড়ি বাঁধিতেছি, বড় বড় ব্যবহারজীব, বড় বড় তত্ত্বান্বেষীর চারা বসাইতেছি,' কিন্তু কার্যে তাঁহার লক্ষ্য ছিল যত সম্ভব অধিক সংখ্যক দেশবাসীর মধ্যে সাধারণ শিক্ষার সুবিস্তার। আশুবাবু ইহার এতটা চেষ্টা করিয়া না গেলে আজ যাঁহারা স্বরাজ স্বাধীনতা প্রভৃতি অবশ্যম্ভাবী বা নিকট সম্ভাবিত বলিয়া কোমর বাঁধিয়া চেষ্টা করিতেছেন, তাহারা সেই কার্যের মালমসলা কোথায় পাইতেন ?

"আমি ভুল বুঝিয়াছি কি ঠিক বুঝিয়াছি জানি না, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে দেশের সর্ববিধ কর্মী ও সংস্কারকের জন্য আশুবাবু মালমসলা যোগাইয়া গিয়াছেন ; এইটিই তাঁহার প্রধান কীর্তি, এই হিসাবেই তিনি স্রষ্টা।"[১]

আশুতোষ উচ্চ শিক্ষার প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ দেখিয়েছেন, এবং তার ফলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যাহত হচ্ছে—এই অমূলক অভিযোগের উত্তরে তিনিই প্রশ্ন তুলেছেন—উচ্চ শিক্ষার উপর জোর না দিলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের জন্য শিক্ষক পাওয়া যাবে কোথায় ? শিক্ষকতার কথা ছাড়াও যুবশ্রেণীকে উচ্চতর শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জন থেকে বঞ্চিত করা হবে কোন্ যুক্তিতে ?

"In this University, at any rate, the M.A. classes are literally crowded ; why then, apart from the question of funds, should our young men be denied privileges and opportunities regularly enjoyed by their contemporaries in every civilised country of the world ?"[২]

যাঁরা এসব কুতর্কের অবতারণা করতেন তাঁরা আসলে ছিলেন শিক্ষা প্রসারে বিরোধী। যে মুষ্টিমেয় লোক আধুনিক শিক্ষার সমস্ত সুফল একচেটিয়া ভোগ দখল করছে, তাঁরা মনে প্রাণে চাইতেন যেন তার ভাগীদার না জোটে। তাই তারা 'শিক্ষা রসাতলে গেল' বলে শোরগোল তুলেছেন। তাঁদের চরিত্র ব্যাখ্যা করে আশুতোষ বলেছেন—

"There may be unhappy people who are alarmed at the spread of education and who frighten themselves with the idea that rapid development in the field of education as also

১. শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী—('Servant' পত্রিকার সম্পাদক) বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩১

২. Calcutta University Senate Proceedings.

the promoters of those movements are a new menace to the Country."[৩]

শিক্ষা সম্প্রসারণ বিরোধীদের তিনি স্মরণ রাখতে বলেছেন—

"............before their narrow views prevail, they will have to take steps to alter the motto of this University from the "Advancement of learning" to the Restriction of Knowledge.[৪]

(যারা শিক্ষা বিস্তারের বিরোধী তাদের অভিমতকে প্রাধান্য দিতে গেলে আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শ 'শিক্ষার সম্প্রসারণ' থেকে 'জ্ঞানের সঙ্কোচন'-এ পরিবর্তন করতে হবে।)

ছাত্রদের প্রতি সদাশয়তা, সহানুভূতি ও উদার দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য আশুতোষকে কম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়নি। তাঁর বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ— তিনি বড্ডো বেশি পাশ করিয়ে দিচ্ছেন। তাঁর সময়কার গ্রাজুয়েটদের ঠাট্টা করে বলা হতো—'স্যার আশুতোষের বি. এ.।' কোন এক কাগজে লেখা হল—

"Calcutta University is a graduate manufacturing University."

সেদিন আত্মপক্ষ সমর্থনে আশুতোষ বলেছিলেন—"উচ্চ শিক্ষার প্রসার কতটা বাড়িয়াছে তাহা সমালোচকদের একবার হিসাব করিয়া দেখিতে বলি। যাহারা পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহদ্বার ঠেলিয়া ঢুকিতে পারিত না, তাহারা বি. এ., এম. এ. পাস করিয়া আসিতেছে। যদিও আমি নিজে বিশ্বাস করি না যে প্রকৃত গুণী ও মনস্বী ছেলেদের গুণপনার কোনো হানি হইয়াছে, তথাপি যদি মানিয়া লই যে, শিক্ষার আদর্শ পূর্বাপেক্ষা একটু খর্ব হইয়া গিয়াছে, তথাপি শিক্ষার বিস্তার যে বহুল পরিমাণে বাড়িয়াছে তাহাতে কি কেহ সন্দেহ করিতে পারেন ? পল্লীতে পল্লীতে বঙ্গের দূর দূরান্তরে আজ কত শত গ্রাজুয়েট পাওয়া যাইবে। স্কুলের কয়েক ক্লাস পর্যন্ত পড়িয়া যদি নিরুৎসাহ হইয়া তাহাদিগকে ঘরে ফিরিয়া যাইতে হইত, তবে কি বঙ্গদেশ আজকার মতো শিক্ষা বিষয়ে নেতৃত্ব করিতে পারিত ?"[৫]

৩. Calcutta University Faculty Council Minutes.

৪. C. U. Faculty Council Minutes.

৫. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—মণি বাগচী

উচ্চ শিক্ষা প্রসারের গৌণ ফল

উদ্ধৃত বক্তব্যের উপর কোন মন্তব্য করা ধৃষ্টতা মাত্র। তবু মনে হয় এই সিদ্ধান্তে আসা অযৌক্তিক হবে না যে আশুতোষ দেশে শিক্ষিতের সংখ্যা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট ছিলেন প্রধানতঃ দু'টি কারণে। প্রথমতঃ, সরকারের শিক্ষা সংকোচন নীতিকে সরাসরি আঘাত করা যখন যাচ্ছে না, তখন ভিতর থেকে তাকে বানচাল করে দেওয়া; আর দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষা প্রসারে বেসরকারী উদ্যম ও প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা। যত সংখ্যক ছাত্র ম্যাট্রিক, আই.-এ, বি.এ. পাশ করে বেরুবে তাদের সকলের সরকারী চাকরীর ব্যবস্থা হবার নয়। বেসরকারী চাকরীর সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। শিক্ষিত বেকার যুবকের দল তখন শহর-গঞ্জ গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়বে। যেহেতু লেখাপড়া সে সময় বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সমাজের ধনী ও উচ্চশ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, সুতরাং শিক্ষিত বেকারদের অভিভাবকগণ—জমিদার, তালুকদার, বড় ব্যবসায়ী, সম্পন্ন চাষী ও মহাজনশ্রেণী এগিয়ে এলেন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার কাজে। কেউ জমি দিয়ে, কেউ টাকা দিয়ে, কেউ টিন কাঠ এবং যারা কিছু দিতে অপারগ তারা শ্রম দান করে স্কুল প্রতিষ্ঠা করল—সেগুলি সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরের মতোই পবিত্র পীঠস্থান। এর ফলে অনেকে মহান 'শিক্ষা দাতা' বলে যেমন সমাজে প্রতিষ্ঠা পেলেন, সে সঙ্গে তাদের অনেকের পরিবারের শিক্ষিত বেকার ছেলেদেরও আপাতত একটা কর্মসংস্থান হল। বাংলাদেশে শিক্ষা বিস্তারে আশুতোষের এই আর একটি পরোক্ষ অবদান। বহুসংখ্যক বেসরকারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল আশুতোষের উচ্চ শিক্ষা প্রসার নীতি। আর তার পরিণতি—এই স্কুল কলেজ ও শিক্ষক শ্রেণীর মাধ্যমে দেশের জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাগরণ—যে অবদান প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক নেতাদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়:—

> "It is foolish to imagine that Sir Asutosh was not so much for elevating the minds of the masses as for affording careers to pedants. Those who light but a little candle in the darkness help to make the whole sky aflame."*

(আশুতোষ বড় বড় পণ্ডিতদের জীবনে প্রতিষ্ঠা অর্জনে সাহায্য করতে যেমন উৎসুক ছিলেন জনসাধারণের শিক্ষার ব্যাপারে তেমন আগ্রহী ছিলেন না—এরকম

৬. Dr. S. Radhakrishnan—Calcutta Review, July, 1924.

অনুমান করা মুর্খতা। যিনি অন্ধকারে একটি ক্ষীণ প্রদীপ জ্বালান তিনি সমগ্র আকাশকে আলোকিত করতেই সাহায্য করেন।)

আশুতোষ উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে জনশিক্ষা বিস্তারের যে পথ অবলম্বন করেছিলেন—যা না করে সেকালে গত্যন্তর ছিল না—তার সপক্ষে বহু বিশিষ্ট শিক্ষাবিদই সমর্থনসূচক মতামত জ্ঞাপন করেছেন। যেমন—

"সেদিনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় দেশের মুষ্টিমেয় লোকের মন আলোকিত হত। যাঁরা উচ্চ শিক্ষার তকমা নিয়ে বেরিয়ে আসতেন তাঁরা ছিলেন তথাকথিত সীমিত 'এন্‌লাইটেন্‌ড্' সম্প্রদায়। এই সীমা বা গণ্ডী পেরিয়ে জ্ঞানের আলো বাইরের দুঃসহ অন্ধকারকে দূর করত না। এক কথায় বলা যেতে পারে শিক্ষার বিকিরণ ও স্বভাবীকরণের যথেষ্ট অভাব ছিল। আশুতোষ তাঁর প্রথম জীবনেই এই দুইটি সমস্যাকে গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন। সে সময় দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন ছিল। দেশের যথেষ্ট সংখ্যক সেকেণ্ডারী স্কুল প্রবর্তনের উৎসাহ দিয়ে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষাকে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে আনবার চেষ্টা করেছিলেন।"[৭]

তৎকালীন পরিস্থিতিতে উচ্চ শিক্ষায় উৎসাহ দিলেও এবং উচ্চ শিক্ষা প্রসারে কায়মনোবাক্যে নিয়োজিত থাকলেও আশুতোষের চিন্তাধারা যে জনশিক্ষামুখী ছিল তা তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন—

"শাখা-প্রশাখা, পত্র-পুষ্প-পল্লব প্রভৃতি লইয়াই প্রকৃত বৃক্ষ; এই সব ত্যাগ করিয়া, মাত্র মূল স্থাণুটিকে কেহ বৃক্ষ বলে না, বা বৃক্ষের আশা ঐ স্থাণুতে চরিতার্থ হয় না। সুতরাং যাহাদিগকে বাদ দিলে বাঙ্গালী জাতি একান্ত মুষ্টিমেয় ও দুর্বল হইয়া পড়ে, বঙ্গের সেই অশিক্ষিত জনরাশির মধ্যে যাহাতে শিক্ষার আলোকচ্ছটা নিপতিত হয়, উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত সুধীমণ্ডলীর পার্শ্বে যাহাতে বঙ্গের নিরক্ষর জনসঙ্ঘ আসিয়া অকুতোভয়ে ও অসঙ্কোচে দাঁড়াইতে পারে, যতদিন তাহা না করিতে পারিব, ততদিন আমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।

যতদিন বঙ্গের অতি নগণ্য পল্লীতে পর্যন্ত বঙ্গবাণীর বিজয়-শঙ্খ নিনাদিত না হইবে, ইতর ভদ্র সমস্বরে বঙ্গভাষার বিজয়প্রশস্তি উদাত্তকণ্ঠে আবৃত্তি না করিবে, ততদিন বিশ্ব-সাহিত্যে বঙ্গের জাতীয় সাহিত্যের অন্তর্নিবেশ অসম্ভব।"[৮]

---

৭. আশুতোষের পরিচালনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নবরূপায়ণ—অধ্যাপক ত্রিপুরারি চক্রবর্তী, বাণীমন্দির, ১৩৭১

৮. ১৯২৩ খ্রীঃ বাঁকিপুর-বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে সভাপতির ভাষণ (জাতীয় সাহিত্য)।

এ সম্পর্কে একালের আরো একজন বিদগ্ধ শিক্ষাবিদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে আলোচনার সমাপ্তি-রেখা টানা যাক—

"আমাদের এই শতাব্দীর গোড়া থেকে বাংলাদেশে সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই, বিশেষভাবে মধ্যবিত্ত ভদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা লাভের ইচ্ছা ক্রমশ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছিল। অথচ অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের ভেতর দিয়ে এই সামাজিক ইচ্ছাটাকে রূপদান করা খুব সহজ ছিল না। আশুতোষের প্রধান কৃতিত্ব, তিনি এই ইচ্ছার স্বরূপটি বুঝেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থাৎ যে সম্প্রদায় দেশের ও সমাজের সকল চিন্তা ও কর্মের নিয়ামক হতে চলেছে, তার সম্প্রসারণ ও শক্তিবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষার বিস্তার, উত্তরোত্তর স্কুল কলেজের সংখ্যাবৃদ্ধি, শিক্ষিতের সংখ্যাবৃদ্ধি। দেশ তখন পরাধীন, শিক্ষার প্রসার যত বেশী, শিক্ষিতের সংখ্যা যত বেশী, পরাধীনতা সম্বন্ধে সচেতনতা তত বেশী, তার জ্বালা তত বেশী। আশুতোষের সজ্ঞান চেষ্টায় নূতন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার নিয়ম কানুন যথাসম্ভব শিথিল হওয়ার ফলে ক্রমশ প্রচুর স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হতে শুরু হলো, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় বছর বছর হাজার হাজার ছেলে মেয়ে পাশ করতে লাগলো। দেশে তখন প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার কিছু ছিলনা বললেই হয়, কোনও কার্যক্রমই ছিল না। কাজেই মাধ্যমিক স্কুলগুলিই তখন প্রায় নিম্নতম শিক্ষার কেন্দ্র। সেই শিক্ষাকে যতটা নানাদিকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, সেটাই হলো আশুতোষের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যকে তিনি সার্থকও করে গেলেন তাঁর জীবিতকালের মধ্যেই। কলেজগুলি সম্বন্ধেও তিনি মোটামুটি একই নীতি অনুসরণ করেছিলেন, যার ফলে দেখতে দেখতে উচ্চ শিক্ষার সংখ্যা দ্রুত এগোতে লাগলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশে নতুন ও ব্যাপকতর সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি হওয়া শুরু হলো।"[৯]

---

৯. ডাঃ নীহাররঞ্জন রায়—বেতার ভাষণ, আকাশবাণী, ২৯.৬.৬৪

তৃতীয় অধ্যায়

আশুতোষের দৃষ্টিতে আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গে আশুতোষ : বিশ্ববিদ্যালয় কি ও কেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ—বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে নতুন ধারণা—বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা—বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে শেষ কথা।

* * * *

বিশ্ববিদ্যালয় কি ও কেন

এই প্রসঙ্গেই এসে পড়ে উচ্চশিক্ষা প্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকার কথা। বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ সংজ্ঞা আদর্শ উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশুতোষ বিভিন্ন উপলক্ষে সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছেন। এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাভাবনার প্রথম আভাস মেলে বঙ্গীয় বিধান পরিষদে প্রদত্ত ভাষণে—

> "To my mind, a University is a Corporation of teachers and students banded together for the pursuit of learning and the increase of knowledge, duly housed and fitly endowed, to meet the demands raised in the achievement of its purposes."[১]

(আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল ছাত্র ও শিক্ষকদের একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান। সেখানে তারা বিদ্যার্জন ও জ্ঞানের প্রসারে একত্রে মিলিত। সেই উদ্দেশ্য সফল করতে দরকার উপযুক্ত গৃহ ও প্রয়োজনীয় অর্থের ব্যবস্থা।)

তারপর থেকে আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কীয় চিন্তাধারার পরিমার্জন ও পরিশীলন চলতে থাকে। ১৯০৭ খ্রীঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর প্রথম সমাবর্তন ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক কর্তব্য ব্যাখ্যা করে বলেন—

> "It is not the number, but the quality of student, it is not the quantum of knowledge but the character of the training which is received that determines the position of the univer-

১. Bengal Legislative Council Proceedings, 21.3.1902.

sity. It is the paramount duty of the university to discover and develop unusual talent. No university is worthy of its reputation which does not enrol among its professors men best fitted to advance the bounds of knowledge. No university can rightly be regarded as fulfilling the purpose of its existence, unless it affords to the best of its student, adequate encouragement to carry on research and unless it enables intellectual power wherever detected to exercise its highest functions."২

(ছাত্রদের সংখ্যা নয় তাদের গুণগত উৎকর্ষতা, ছাত্রদের জ্ঞানের পরিধি নয়, যে ধরণের শিক্ষা তারা পায় তার চরিত্রই বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বরূপ প্রকাশ করে। অসাধারণ প্রতিভার সন্ধান ও বিকাশ সাধনই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান কর্তব্য হওয়া উচিত। যে বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞানের পরিধি বিস্তারে সক্ষম অধ্যাপক নিয়োগ করতে না পারে, তা বিশ্ববিদ্যালয় নামের অনুপযুক্ত। যে বিশ্ববিদ্যালয় তার মেধাবী ও প্রতিশ্রুতি সম্পন্ন ছাত্রদের গবেষণা কর্মে পর্যাপ্ত উৎসাহ ও সাহায্য করতে না পারে এবং কোনও ক্ষেত্রে দুর্লভ প্রতিভার সন্ধান মিললে তাকে খুঁজেপেতে এনে তার মেধা ও মনীষার সর্বোত্তম পরিস্ফুটনে সহায়তা না করতে পারে—এমন বিশ্ববিদ্যালয় তার উদ্দেশ্য সাধন করছে বলা যায় না।)

বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সম্পর্কে নতুন ধারণা

তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণেও আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের অতীত ও বর্তমান কার্যক্রম এবং দায় দায়িত্বের তুলনামূলক আলোচনা করে বলেছেন—

"The present conception of the function of the University is, that it is an institution for the acquisition, conservation, refinement and distribution of knowledge. I believe it is the opinion of most persons competent to form an opinion upon educational matters that this salutory change in the conception of the true function of this University, has been recognised not a moment soon. The original limited conception of the University as an Institution which exists solely to conduct examinations and confer degrees nece-

২. Calcutta University Convocation Address, 2.3.1907.

ssarily produced the disastrous result that teaching was subrodinated to examinations."*

(বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয় কর্ম সম্পর্কে বর্তমানে যে ধারণা পোষণ করা হয়ে থাকে তা হলো—বিশ্ববিদ্যালয় জ্ঞান আহরণ, সংরক্ষণ, শোধিতকরণ ও বিতরণ করার কাজে নিয়োজিত প্রতিষ্ঠান। যাঁরা শিক্ষা সম্পর্কে অভিমত প্রকাশের যোগ্যতা রাখেন, আমি বিশ্বাস করি তাঁদের মধ্যে প্রায় সকলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রমে এই পরিবর্তনের সূচনা খুব তড়িঘড়ি করে করা হয়েছে বলে স্বীকার করবেন না। বিশ্ববিদ্যালয় শুধু পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের কেন্দ্র—এই সেকেলে ধারণার সর্বনাশা ফল হল—শিক্ষাকে পরীক্ষার নিচে স্থান দান।)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাবদ্ধ কর্মকাণ্ডে আশুতোষের অন্তরের সায় ছিল না কখনো। তিনি ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী সর্বার্থসাধক কর্মযজ্ঞে বিশ্বাসী। মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি তাঁর স্বপ্নের এক রূপরেখা অঙ্কন করে বলেন—

"A university is a corporation of teachers and students bounded together in the pursuit of learning and for the extension of the bounds of knowledge. We realise the importance of two fundamental principles. In the first place, a university can achieve the complete fulfilment of its purpose, only if at the time of its foundation, it is adapted to the special needs and circumastances of the people whom it is desired to serve. In the second place, a university will retain its utility and usefulness unimpaired, only if it ever contrives to be wisely articulated to the true requirements of the country, if its governors sedulously watch the ever varying needs of the people from time to time, from generation to generation and mould and develop their institutions accordingly.

The oft-repeated axiom is apt to be ignored or overlooked that you cannot completely westernise the east any more, than you can fundamentally easternise the west.

Let me plead for freedom in the university, freedom in its inception, freedom in its administration, freedom in its

---

*. Calcutta University Convocation Address—1908.

expansion ; surely, this is the very condition of vigorous existence of an institution engaged in search after truth".[৪]

অর্থাৎ "বিশ্ববিদ্যালয় হলো ছাত্র ও শিক্ষকের একটি নিগম যেখানে তাঁরা মিলিত হয়েছেন বিদ্যার অনুসন্ধিৎসায় জ্ঞান-সীমার সম্প্রসারণে। দুটি মৌল নীতির তাৎপর্য আমরা উপব্ধি করি এখানে। প্রথমত বিশ্ব-বিদ্যালয় সম্পূর্ণভাবে এর উদ্দেশ্য রূপায়ণে সমর্থ হবে, যদি সে সৃষ্টিলগ্নে সেই সব লোকের বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থার উপযোগী হয়, যাদের সেবায় এ ব্রতী হয়েছে। দ্বিতীয়ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণশক্তি ও প্রয়োজনীয়তা অব্যাহত রাখতে পারে, যদি সমাজের খাঁটি চাহিদাকে প্রজ্ঞার সঙ্গে সে প্রকাশ করতে পারে যদি এর পরিচালকবর্গ সময়োপযোগী পরিবর্তনের দিকে সযত্নে লক্ষ্য রেখে জনসেবার আদর্শে প্রতিষ্ঠানকে তৈরী ও পরিবধন করেন।"

কিন্তু এত কথার পরেও যেন আশুতোষের বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে শেষ কথা বলা হয় নি। তাই ১৯২২ খ্রীঃ নবম এবং সবশেষের আগের সমাবর্তন ভাষণে এ সম্পর্কে তাঁর শেষ কথা বলে গেছেন যেন—

"To my mind the University is a great store-house of learning, a great bureau of standards, a great workshop of knowledge, a great laboratory for the training as well of men of thought as of men of action. The University is thus the instrument of the State for the conservation of knowledge, for the discovery of knowledge, for the distribution of knowledge, for the applications of knowledge, and above all, for the creation of knowledge-makers."[৫]

(আমার মতে বিশ্ববিদ্যালয় হল জ্ঞানের বিশাল ভাণ্ডার বিশেষ, আদর্শের বৃহৎ আলয় বিশেষ, জ্ঞানের বিরাট কর্মশালা বিশেষ, চিন্তাশীল মানুষ ও কর্মী পুরুষদের শিক্ষাদানের এক মহান গবে-ষণাগার বিশেষ। এক কথায়, বিশ্ববিদ্যালয়কে বলা যায় জ্ঞান সংরক্ষণ, জ্ঞান উদ্ভাবন, জ্ঞান-বিভাজন, জ্ঞান পরিবেশন এবং সর্বোপরি জ্ঞানের-স্রষ্টা সৃজনের এক রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ।)

---

৪. Address at the Convocation of the Uuiversity of Mysore, 19.10.1918.

৫. Calcutta University Convocation Address, 1922.

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংজ্ঞা স্বরূপ, দায়িত্ব কর্তব্য সম্পর্কে নানা উপলক্ষে তিনি এত কথা বলেছেন যে সবগুলি একসঙ্গে গ্রথিত করলে তবে তাঁর চিন্তাধারার পূর্ণ চিত্র মেলে। শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে কেন তিনি কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়কেই অবলম্বনস্বরূপ ধরেছিলেন তার কারণ তিনি নিজেই ব্যক্ত করেছেন—

"শিক্ষার প্রকৃত কেন্দ্র দেশে এখন বিশ্ববিদ্যালয়।...যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে অন্য কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল-বদল করিতে হয়, বা নতুন কিছু করার দরকার হয় তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।"[৬]

৬. জাতীয় সাহিত্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

রূপায়ণ পর্ব

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষা ও রাজনীতি

শিক্ষা ও রাজনীতি—গ্রাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান: আগে সমষ্টির স্বার্থ পরে ব্যক্তিস্বার্থ—ছাত্রদের প্রতি আহ্বান: আগে জীবন গঠন, পরে রাজনীতি—বিদায়ী স্নাতকদের প্রতি পুনরাবেদন: দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য ভুলো না—অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান—শিক্ষক ও রাজনীতি: রাজনীতি ও শিক্ষকতা এক সঙ্গে চলতে পারে না—শিক্ষকদের অবসর সময়ে রাজনীতি করাও অবাঞ্ছিত—শিক্ষা ও রাজনীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও আশুতোষ।

* * * *

তত্ত্ব-বেত্তা থেকে প্রয়োগকর্তা

উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত হয়ে আশুতোষ তাঁর শিক্ষাচিন্তার উপযুক্ত প্রয়োগ-ক্ষেত্র লাভ করেন। যে চিন্তাধারা এতদিন তাঁর মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে তত্ত্বাকারে বাসা বেঁধে ছিল, হাতে-কলমে প্রয়োগের সুযোগ পাওয়ামাত্র তা কার্যকরী করতে তিনি উঠে পড়ে লাগলেন। তাঁর সংস্কারমূলক চিন্তাধারায় স্থান পেয়েছিল শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বদিক। ছাত্রদের সমস্যা, শিক্ষকদের কর্তব্য, গ্রাজুয়েটদের দায়িত্ব, বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববিদ্যালয়ের করণীয়, সরকার ও শিক্ষানীতি—ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই ছিল আশুতোষের সজাগ দৃষ্টি। শিক্ষক নির্বাচন, পাঠক্রম ও পাঠ্য বিষয় নির্ণয়, পরীক্ষা পরীক্ষক ও পরীক্ষার মাধ্যম নির্ধারণ, উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা, ছাত্রদের আবাসন সমস্যা, ছাত্র ও রাজনীত, শিক্ষক ও রাজনীতি, শিক্ষা ও গণতন্ত্র, জাতীয় ভাষা সাহিত্যের উন্নতি, জাতীয় ঐক্য ও সংহতি, ইত্যাদি কোন্ বিষয়ে আশুতোষের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় নি? এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আশুতোষের দৃষ্টিভঙ্গী, এবং তৎসম্পর্কিত সমস্যা সমাধানে অবলম্বিত পন্থা থেকে তাঁর চিন্তাধারার স্বরূপ জানা যাবে।

যেহেতু এক বিশেষ পরিস্থিতি ও জাতীয় উন্মাদনার মাঝে আশুতোষকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণ করতে হয়েছিল তাই "শিক্ষা ও রাজনীতি"

সম্পর্কিত বিষয়টি নিয়ে প্রথমে তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ বিশ্লেষণ করা যাক।

শিক্ষা ও রাজনীতি

আগেই বলা হয়েছে যে, উপাচার্য পদ গ্রহণ করেই আশুতোষকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের তরঙ্গে টলমল শিক্ষা-তরণীর হাল ধরতে হয়েছিল। কার্জনের কীর্তি এই বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বঙ্গবাসী ছাত্র ও তরুণ-সঙ্ঘ সরকারের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন, "ছাত্রদের পক্ষে রাজনীতি বর্জনীয় নয়, আচরণীয়।" আশুতোষ কিন্তু আশৈশব "ছাত্রানাম অধ্যয়নং তপঃ" মন্ত্রে দীক্ষিত। পাঠ্যাবস্থায় ছাত্রদের সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণের তিনি ঘোরতর বিরোধী।[১] ছাত্র ও যুব সম্প্রদায়ের জন্য তাঁর উৎকণ্ঠার অন্ত ছিল না। তাদের সুস্থ সুন্দর জীবন ও সুখী সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলাই ছিল তাঁর জীবনের স্বপ্ন। সুকুমার ও চপলমতি ছাত্রগণ যে ভাবে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজের ও দেশের ক্ষতিসাধন করছিল তাতে আশুতোষ অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলেন। তাই তাঁর প্রথম কাজ হল ছাত্রদের রাজনীতির পথ থেকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় শিক্ষালাভের পথে, জ্ঞানার্জনের পথে পরিচালিত করা।

প্রথম সমাবর্তন ভাষণে (১৯০৭) তিনি নবদীক্ষিত স্নাতকদের শিক্ষা-সমাপনান্তে সামাজিক দায়-দায়িত্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন :—

গ্রাজুয়েটদের প্রতি আহ্বান : ব্যক্তি স্বার্থের উর্দ্ধে সমষ্টির স্বার্থ

"হে আমার গ্রাজুয়েটবৃন্দ, তোমরা কি সম্পূর্ণরূপে এই উপাধিলাভের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছ? বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির ছাপ ললাটে ধারণ করে অতঃপর তোমরা যখন কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবে, তখন তোমরা তোমাদের দায়িত্ব সম্পর্কে কি সচেতন থাকবে না? মনে করো না এখনি কিংবা স্নাতকোত্তর শিক্ষালাভের পর তোমাদের জ্ঞানানুশীলনে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। মনে রেখো, জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নেই। এখন থেকেই তো তোমাদের বিশেষ শিক্ষা আরম্ভ হলো এবং অতঃপর তোমাদের নিজস্ব চেষ্টায় সেই শিক্ষা আয়ত্ত করতে হবে। কোন শিক্ষক আর তোমাদের সহায়ক হবেন না। জীবনব্যাপী এই যে শিক্ষার সাধনা, এ যে কেবল তোমাদের নিজেদের জন্য

প্রয়োজন তা নয়—তোমাদের লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর উন্নতিসাধনের জন্যই ইহার প্রয়োজনীয়তা।

যদিও তোমরা আকণ্ঠ পাশ্চাত্য সংস্কৃতির রস পান করেছ, তবু ভারতীয় রীতিনীতির যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু উপাদেয় কোনমতেই তা তোমরা উপেক্ষা করবে না। পাশ্চাত্যের চোখ-ধাঁধানো আলোয় তোমাদের মহামূল্য উত্তরাধিকার বিসর্জন দেবে না। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির যা কিছু সারবান তার প্রশংসা করতে গিয়ে, কোন অবস্থাতেই তোমরা বিজাতীয় ভাবাপন্ন হবে না।

তোমরা যে প্রকৃত ভারতীয় ইহা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হবে না। তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, রুচি এবং আচার-আচরণে কথনো যেন বৃথা গর্ব প্রকাশ না পায়। সকলের উপর তোমরা তোমাদের মাতৃভাষার অনুশীলন করবে, কারণ য়ুরোপীয় শিক্ষার যে মহামূল্য সম্পদ তোমরা আহরণ করেছ, তোমাদের দেশবাসীর কাছে তা পৌঁছে দেবার ইহাই একমাত্র উপায়। ভারতের প্রতি ইংলণ্ডের শুভ ইচ্ছার প্রতিনিধিত্ব তোমরা যেমন করবে তেমনি ইংলণ্ডের উপর ভারতের দাবীরও প্রতিনিধিত্ব করবে তোমরা। তোমাদের কর্মজীবনের কৃতিত্বে উত্তর-পুরুষ সত্যিই যেন গর্ববোধ করতে পারে, তা হলেই যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দিয়ে তোমাদের লালন পালন করেছে, তার গৌরব ও সুনাম বৃদ্ধি পাবে।"[১]

ছাত্রদের প্রতি আহ্বান : আগে জীবন গঠন, পরে রাজনীতি

দ্বিতীয় সমাবর্তন ভাষণকালে (১৯০৮) স্বদেশী আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হবার মুখে। ছাত্রদের লেখাপড়া উৎসন্নে যাবার উপক্রম। আশুতোষ নীরব থাকতে পারলেন না। এবার তিনি সরাসরি ছাত্রদের রাজনীতি ও রাজনৈতিক নেতাদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলার আহ্বান জানালেন—

"Students of this University, allow not the pursuit of your studies to be disturbed by extra-academic elements. Forget not, that the normal task of the student, so long as he is a student, is not to make politics, nor to be conspicuous in political life."[২]

---

১. সমাবর্তন ভাষণ, ১৯০৭ (অনুবাদ—মণি বাগচি, শিক্ষাগুরু আশুতোষ)

২. C. U. Convocation Address, 1908

(বিদ্যার্থীগণ! শিক্ষাক্ষেত্রের বাইরের লোকদের দ্বারা তোমাদের জ্ঞানার্জনের পথ বিঘ্নিত হতে দিও না। ভুলে যেও না, ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের স্বাভাবিক কর্তব্য রাজনীতি নিয়ে মাতামাতি নয়, কিংবা রাজনীতিক্ষেত্রে আনাগোনা করা নয়।) প্রত্যক্ষ রাজনীতি কারা করবে, রাজনীতি করা কাদের শোভা পায় সে বিষয়ে আশুতোষ তার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে বলেন—

"Take it as my deepest conviction, that practical politics is the business of men, not of boys. You have not that prudent firmness, that ripe experience, that soundness of judgment in human affairs, which is essential in politics, and will be attained by you only in the battle of life, in the professions and in responsible position."[৩]

(মনে রেখ, বাস্তব রাজনীতি বয়স্কদের চর্চার বিষয়, কোমলমতি বালকদের পক্ষে নয়। তোমাদের সেই অটল দূরদর্শিতা, পরিপক্ব অভিজ্ঞতা, জাগতিক ব্যাপারে অকাট্য অভিমত দেবার অধিকার নেই—যা রাজনীতিক্ষেত্রে অপরিহার্য্য। এবং এসকল গুণ অর্জন করবে তখনই, যখন তোমরা জীবন-সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে, উপযুক্ত পেশায় নিযুক্ত হবে এবং দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হবে।)

ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের করণীয় কর্তব্য নির্দেশ করে আশুতোষ বলেছেন :—

"Train yourselves, if you please, in political Economy, Political Philosophy, Jurisprudence and Constitutional Law, acquire an intelligent comprehension of the great lessons of History ; but delude not yourselves in your youthful enthusiasm that the complex machinery by which a State is governed may be usefully criticised and discussed without adequate training and laborious preparation."[৪]

(তোমরা পলিটিক্যাল ইকনমি পড়, পলিটিক্যাল ফিলজফি পড়, জুরিসপ্রুডেন্স এবং কন্‌ষ্টিটিউসন্যাল ল' সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন কর। ইতিহাসের মহান শিক্ষার গূঢ় তাৎপর্য সুচিন্তিতভাবে অনুধাবন করতে চেষ্টা কর, কিন্তু যে জটিল বিধিবিধানে রাষ্ট্রীয় শাসনযন্ত্র চালিত হয়, সে সম্পর্কে ফলপ্রদ সমালোচনা ও

৩, ৪. C. U. Convocation Addrss, 1908.

আলোচনা করতে যে গভীর জ্ঞান ও শ্রমসাধ্য প্রস্তুতি প্রয়োজন, তা অধিগত না করে যৌবনসুলভ উৎসাহের বানে ভেসে যেও না। অপরিণত চিন্তা ও বুদ্ধি নিয়ে রাজনীতি অনুশীলনে কখনো প্রবৃত্ত হবে না।)

অদূরদর্শী স্বার্থপর এবং অবিবেচক রাজনীতিকদের খপ্পরে পড়ে নিজেদের স্বকীয়তা, স্বাধীন চিন্তাশক্তি বিসর্জন না দিতে ছাত্রদের কাছে তিনি আহ্বান জানান :—

"Remember further that if you affiliate yourselves with a party, you deprive yourselves of that academic freedom which is a pre-requisite to self-education and culture. Submit not, I implore you to intellectual slavery, and abandon not your most priceless possession, to test, to doubt, to see everything with your own eyes. Take this as a solemn warning that you cannot with impunity and without serious risk to your mental health, allow your academic pursuits to be rudely disturbed by the shocks of political life."*

(তোমরা কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লে শিক্ষায় স্বরাজের পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় আত্ম-শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে নিজেদের বঞ্চিত করবে। আমি তোমাদের সানুনয়ে বলছি অপরের বুদ্ধিবৃত্তির দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইও না। পরখ করে দেখা, বাজিয়ে দেখা, যাচাই করা, সব কিছু নিজ চোখে দেখে নেবার যে অমূল্য অধিকার তা কখনো পরিহার করো না। একে হিতাকাঙ্ক্ষীর সতর্ক বাণী বলে গ্রহণ কর : তোমার অধ্যয়নের পথ রাজনৈতিক ঝঞ্ঝাবাত্যায় নির্দয়ভাবে বিপর্যস্ত হতে দেবে না। দিলে তুমি নিজেকে শাস্তি দিবে, এবং নিজের মানসিক শান্তি সাংঘাতিকভাবে বিঘ্নিত করবে।)

ছাত্রসমাজের চির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী আশুতোষ সব শেষে ছাত্রদের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আচরণীয় অনুসরণীয় পবিত্র পথ নির্দেশ দিয়ে বলেছেন—

"Devote yourselves, therefore, to the quiet and steady acquisition of physical, intellectual and moral habits, and take to your hearts the motto,

"Self-reverence, self-knowledge, self-control,
These three alone lead life to sovereign power."

*. Calcutta University Convocation Address—1908.

Follow the path of virtue, which knows no distinction of country or colour ; be remarkable for your integrity as for your learning, and let the world see that there are amongst you

> "Souls tempered with fire
> Fervent, heroic and good—
> Helpers and Friends of mankind."*

(শান্ত ও সুস্থিরভাবে শারীরিক মানসিক ও নৈতিক চরিত্র গঠনে আত্ম-নিয়োগ কর এবং নিজের অন্তরে এই আদর্শ পোষণ কর :

> "আত্ম-সম্মান, আত্মোপলব্ধি, আত্ম-সংযম—এই তিনটি গুণই
> জীবনকে সর্বশক্তিমানের দরবারে পৌঁছে দেয়।"

যে ধর্ম দেশ-ভেদ বর্ণ-ভেদ মানে না, সে পথ অনুসরণ কর, নিজের পূর্ণতা ও পাণ্ডিত্যের দ্বারা যশো লাভ কর। বিশ্ববাসী দেখুক যে, তোমাদের মধ্যে রয়েছে সেই আত্মার অধিষ্ঠান যা :

> "অগ্নিশুদ্ধ, উৎসাহ-প্রদীপ্ত, বলদীপ্ত, শুভকর (এবং) মানবজাতির
> সহায়ক ও বন্ধু।")

পুনরায় বিদায়ী স্নাতকদের প্রতি : দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য ভুলো না

বিদায়ী স্নাতকদের দেশ ও জাতির সেবায় উদ্বুদ্ধ হতে যে উদাত্ত আহ্বান আশুতোষ জানিয়েছিলেন তা যে কোন শুভানুষ্ঠানের অভিষেক মন্ত্রের মতো পূত পবিত্র সুধাবর্ষী মর্মস্পর্শী। দীর্ঘায়ত হলেও সংশ্লিষ্ট অংশটুকু অবিকল উদ্ধৃত করা গেল—না হলে দেশের যুব সমাজের উপর আশুতোষের আশা ভরসার প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করা যাবে না :—

"Graduates of the University of Calcutta who have this day been invested with academic insignia, I call upon you to rise to the true dignity of the position which you have just attained and to recognise and fulfil the responsibility which it imposes. Do not imagine that the charge which I have addressed to every one of you on admission to your respective

---

*. Calcutta University Convocation Address, 1908

Degree, that you should in your life and conversation show yourself worthy of the same, is a meaningless platitude or an idle formula. Treat it as the parting message of the University to each and every one of you who have been trained and I trust, adequately equipped for the battle of life, under her beneficent guidance. If I were called upon to develop this charge, I would exhort you in the words of one of the greatest teachers of mankind : "whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure, whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue and if there be any praise, think on these things." In whatever sphere of life your lot may be cast, prove yourself to be the true children of your Alma Mater. Educated by the liberality of the State or by private munificence, strive strenuously to make adequate return ; with anxious solicitude, promote the education of your countrymen, and be, each of you, a bright centre of moral and intellectual activity like the scholars of Mediaeval Europe, who laden with Greek and Roman learning, brought many of the gems of ancient lore within the reach of those who never had the benefits of classical education and knew none but the vulgar tongue. Make your mission the diffusion of knowledge and virtue and the repression of ignorance and evil. Above all, endeavour to attain stability of character and cultivate that principle of honour, which once tainted or lost can never be regained. Forget not, that unless you are honourable men, all your intellectual powers will be a snare to yourselves and a delusion to others. Cultivate that humility of spirit which the learned and unlearned alike instinctively feel is the true stamp of culture and wisdom." Cultivate also that spirit of obedience to lawful authority, which is the necessary concomitant of true academic discipline. Make yourselves Captains of the peace of the Realm and prove yourselves loyal and valuable citizens, worthy of the confidence alike of your Rulers and of your countrymen. Show to the world, that education and loyalty are not only consistent, but that the more advanced the education, the

more genuine the culture, the deeper the attachment to your Rulers. Prove to the world that genuine allegiance is felt by you for the nation, which by a liberal and enlightened educational policy, have brought your minds into intimate contact with the spirit of the West, and show that such allegiance may be rendered without the least relinquishment of your own nationality and without loss of genuine pride in the magnificent legacy of your ancient civilization."[৭]

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রাজুয়েটবৃন্দ ! আজ যারা শিক্ষালঙ্কারে বিভূষিত হয়েছ, তাদের আমি সদ্যলব্ধ অধিকারের প্রকৃত মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করতে এবং সে সঙ্গে অর্পিত দায়িত্ব অনুধাবন ও পরিপালন করতে আহ্বান করছি। তোমাদের প্রত্যেককে নিজ নিজ ডিগ্রী দান কালে আমি যে মন্ত্রে অভিষিক্ত করেছি—"তুমি সর্বক্ষণ তোমার জীবনে ও বাচনে নিজেকে প্রাপ্ত ডিগ্রীর উপযুক্ত প্রমাণ কর"—তা অর্থহীন অসার উক্তি বা কথার কথা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য পরিচালনায় যারা শিক্ষালাভ করেছে এবং আমি বিশ্বাস করি জীবন সংগ্রামের জন্য সর্বতোভাবে তৈরী হয়েছ, তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায় বাণী বলে বিবেচনা করো। যদি আমাকে সেই দায়িত্ব পালনের ভার দেওয়া হতো, তা হলে আমি তোমাদের পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিক্ষকের ভাষায় উদ্বুদ্ধ করে বলতাম—"যা কিছু সত্য, যা কিছু সৎ, যা কিছু ন্যায়, যা কিছু পবিত্র, যা কিছু সুন্দর, যা কিছুকে উত্তম বলা যায়, যদি কোথাও সদ্‌গুণের পরিচয় পাও এবং কোথাও প্রশংসাযোগ্য কিছু দেখতে পাও সে সমস্ত বিষয় নিয়েই চিন্তা করো।" ভাগ্যচক্র জীবনের যে ক্ষেত্রেই তোমাদিগকে অধিষ্ঠিত করুক, নিজেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযুক্ত সন্তান বলে প্রমাণিত করো। রাষ্ট্রীয় ঔদার্য বা বেসরকারী বদান্যতায় শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেও পর্যাপ্ত প্রতিদান দিতে পূর্ণোদ্যমে চেষ্টা করবে। মধ্যযুগের যে সমস্ত ইউরোপীয় পণ্ডিত যারা গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রাচীন ইতিহাস ও সংস্কৃতি থেকে নানা-বিধ জ্ঞান আহরণ করে কখনো প্রাচীন সাহিত্যরসের স্বাদ পায় নি এবং যারা গ্রাম্য অসংস্কৃত ভাষা ছাড়া আর কিছু জানত না, তাদের সামনে জ্ঞান বিজ্ঞানের দুয়ার খুলে দিয়ে মননশীল ক্রিয়াকর্মের এক একটি কেন্দ্র বলে পরিগণিত

৭. Calcutta University Convocation Addres. 1908.

হয়েছিলেন, তোমরাও প্রত্যেকেই তেমনিভাবে দেশবাসীর মাঝে শিক্ষা প্রসারে ব্রতী হও। জ্ঞান ও গুণের বিকাশ সাধন এবং অজ্ঞানতা ও অশুভ শক্তির বিনাশসাধন তোমাদের লক্ষ্য হোক। সর্বোপরি, যে সম্মান একবার কলঙ্কিত হলে বা হারালে তার পুনরুদ্ধারের আশা বৃথা, সে চারিত্রিক আদর্শ অনুসরণে যত্নবান হও। ভুলে যেও না—যদি সম্মান বজায় না থাকে, তা হলে তোমার মনীষা, শিক্ষা ও শ্রম সবই ব্যর্থ হবে, তোমার ধীশক্তি তোমার কাছে ফাঁস বলে মনে হবে, এবং অপরের কাছে বিভ্রান্তিকর ঠেকবে।

যে পৌরুষদীপ্ত বিনয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলের নিকট সাংস্কৃতিক মনস্বিতা ও প্রাজ্ঞতার স্বাভাবিক ছাপ বলে গণ্য, তার অনুশীলন করো। আইনানুগ কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য—যা শিক্ষাক্ষেত্রে নিয়মানুবর্তিতারই নামান্তর—প্রকাশ করার সৎসাহস অর্জন করো। নিজেদেরকে রাষ্ট্রের শান্তির নায়ক করে তোল, নিজেদের অনুগত ও সম্মানীয় নাগরিক বলে প্রমাণ করো—সেই সঙ্গে শাসকশ্রেণী ও দেশবাসীর বিশ্বাসভাজন হও। বিশ্ববাসীকে দেখিয়ে দাও যে শিক্ষা এবং আনুগত্য কেবলমাত্র সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়, বরং শিক্ষা যত বেশী উন্নত, সংস্কৃতি যত বেশী নির্ভেজাল, শাসন কর্তৃপক্ষের প্রতি আনুগত্য তত গভীর। বিশ্ববাসীর নিকট প্রমাণ কর যে, যে জাতি তাদের উদার এবং কুসংস্কারমুক্ত শিক্ষানীতির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তোমাদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ঘটিয়েছে, সেই জাতির প্রতি তোমাদের প্রকৃত আনুগত্য রয়েছে এবং আরো দেখিয়ে দাও যে এ জাতীয় আনুগত্য প্রকাশে নিজেদের স্বাজাত্যাভিমান বিন্দুমাত্র খর্ব হয় না এবং নিজেদের সুপ্রাচীন সভ্যতার মহামূল্য ঐতিহ্য সম্পর্কে নিখাদ গৌরববোধ কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় না।]

অভিভাবকদের প্রতি আহ্বান

ছাত্রজীবনে উচ্ছৃঙ্খলা বিশৃঙ্খলা তিনি সহ্য করতে পারতেন না। বিশেষতঃ তা যদি পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় ও বহিরাগত ব্যক্তিদের দ্বারা প্রণোদিত হয়। ১৯০৯খ্রীঃ সমাবর্তন ভাষণেও আশুতোষ ক্ষোভের সঙ্গে বলেন—

"এটা দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে ছাত্রদের মধ্যে নিয়ম-শৃঙ্খলা বহুক্ষেত্রে শিথিল হয়েছে, অথবা কার্যত নষ্ট হয়ে গেছে।"

জাতির ভবিষ্যৎ বংশধর, আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ছাত্র ও কিশোরদের নিয়ে দায়িত্বহীন রাজনৈতিক নেতাদের অপরিণামদর্শী কার্যকলাপে বিচলিত আশুতোষ দায়িত্বশীল নাগরিকদের আহ্বান করে বলেছেন—

"The most strenuous effort must be falteringly made by all persons truely interested in the future welfare of the rising generation, to protect our youths from the hands of irresponsible people who recklessly seek to seduce our students from the paths of academic life and to plant in their immature minds the poisonous seeds of hatred against constituted Government."[৮]

[উঠ্তি বংশধরদের ভবিষ্যৎ কল্যাণে যাঁরা সত্যি সত্যি আগ্রহান্বিত তাঁদের অবিরাম চেষ্টা করে যেতে হবে যাতে দায়িত্বজ্ঞানশূন্য রাজনীতিকদের হাত থেকে আমাদের তরুণ সমাজকে রক্ষা করা যায়। এই নেতারা ছাত্র সমাজকে শিক্ষাজীবন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তাদের অপরিণত মস্তিষ্কে আইনানুগ প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষের বিষময় বীজ বপন করতে চাইছে।]

শিক্ষক ও রাজনীতি : রাজনীতি ও শিক্ষকতা একসঙ্গে চলতে পারে না

যেমন ছাত্র, তেমনি শিক্ষকদেরও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ আশুতোষের মনঃপূত ছিল না। শিক্ষক হলেন ছাত্রদের পথপ্রদর্শক, তিনি যেমন চলবেন চালাবেন, ছাত্ররাও তার অনুকরণ করবে। সুতরাং শিক্ষকগণ যদি রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মে লিপ্ত হয়ে ছাত্রদের পড়াশুনায় ব্যাঘাত ঘটান, ছাত্ররাও তাঁদের পিছু পিছু অধিকতর উৎসাহে ছুটবে। আশুতোষের চোখে আদর্শ শিক্ষক হবেন রাজনীতি মুক্ত শিক্ষাব্রতী। বড় জোর তিনি সমাজসেবামূলক কাজে অংশ গ্রহণ করতে পারেন—কিন্তু রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডে নৈব নৈব চ। তাঁর প্রথম সমাবর্তনী ভাষণেই তিনি শিক্ষকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বের কথাও উল্লেখ করে বলেন—

৮. Calcutta University Convocation Address, 1909.

"প্রত্যেক অধ্যাপককে হতে হবে ছাত্র আর প্রত্যেক প্রাগ্রসর ছাত্র উদ্বুদ্ধ হবেন নিছক কেতাবী জ্ঞান আহরণ ছাড়াও উচ্চতর আদর্শে। যতদিন না বিশ্ববিদ্যালয় তাঁদের অধ্যাপকদের গবেষণাগারের একটি সামগ্রিক রূপ দেখাতে পারবেন, যতদিন না তাঁরা তাঁদের যোগ্য ও ইচ্ছুক কর্মীদের জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় গবেষণার সুযোগ দিতে পারবেন, ততদিন বিশ্ববিদ্যালয়িক আদর্শের রূপায়ণ হয়েছে একথা বলা যাবে না।"[৯]

আবার যে সকল শিক্ষক স্কুল কলেজের সময় বাদে অবসর সময়ে রাজনীতি চর্চা করতেন, তাঁদের সম্পর্কেও আশুতোষ সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। তাঁরাও যে ছাত্রদের নির্ভরযোগ্য পরিচালক হতে পারেন না, তার কারণ উল্লেখ করে তিনি আরেকটি সমাবর্তন বক্তৃতায় বলেছেন—

"I earnestly call upon teachers who hold it to be their duty to figure as active politicians out of school or college hours, to reflect on the special responsibility incident to their station in life, in the present circumstances of the country. Men of this type are not safe guides of the young, if by a guide we mean a man who leads and influences not only in the way of instruction and advice, but also by the practical example he sets to students by the conduct of his own life. Let not the noble band of instructors of our youth forget that they are but priests in Temple of learning ; and let them take as their motto : "Happy is the man that findeth wisdom and the man that getteth understanding. *Give instruction to a wise man and he will be wiser ; teach a just man and he will increase in learning &.*"[১০]

[যে সব শিক্ষক স্কুল কলেজের সময়টুকু বাদ দিয়ে বাকি সময় সক্রিয় রাজনীতি করতে চান, তাঁদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে আবেদন করছি—দেশের বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, জীবনে তাঁরা যে বৃত্তি অবলম্বন করেছেন, তার সঙ্গে জড়িত বিশেষ দায়িত্ব সম্পর্কে যেন সবিশেষ অবহিত থাকেন।··· এই ধরণের শিক্ষকগণ ছাত্রশ্রেণীর নিরাপদ দিশারী নন, যদি দিশারী বলতে আমরা বুঝি তেমন লোককে যিনি কেবলমাত্র নির্দেশ ও উপদেশ দিয়েই চালিত ও অনুপ্রাণিত করেন না, বরং নিজের জীবনের আচার আচরণের

৯. সমাবর্তন ভাষণ—১৯০৭ (অনুবাদ) অনিল বিশ্বাস, আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা।
১০. Calcutta University Convocatoin Address, 12th March, 1910

মারফৎ ছাত্রদের সামনে বাস্তব আদর্শ স্থাপন করেন। যে মহান শিক্ষাব্রতীদের হাতে আমাদের ছাত্র ও যুবশ্রেণীকে তুলে দিয়েছি তাঁরা যেন ভুলে না যান যে তাঁরাই বিদ্যামন্দিরের পুরোহিত। তাঁরা যেন এই নীতিবাক্য আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন :

"যে ব্যক্তি জ্ঞানের সন্ধান পেয়েছেন এবং যাঁর বোধিলাভ হয়েছে সেই সুখী। একজন বুদ্ধিমানকে জ্ঞান দান করলে তিনি অধিকতর জ্ঞানী হবেন ; একজন নিষ্ঠাবান লোককে শিক্ষা দান করলে তার পাণ্ডিত্য বৃদ্ধি পাবে।"]

পাঠ্যাবস্থায় প্রত্যক্ষ রাজনীতির সংস্পর্শে না থাকার জন্য ছাত্রদের বারংবার সতর্কীকরণ এবং উপদেশ দান, আশুতোষের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন কিনা সে সন্দেহ মনে জাগে। বি. এ. পাঠরত অবস্থায় আশুতোষ নিজেই তো ছাত্র আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কারাবাসকে (১৮৮৩) কেন্দ্র করে বাংলা দেশের—এমন কি প্রেসিডেন্সীর মতো পয়লা নম্বরের সরকারী কলেজের ছাত্ররা যে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাতে অন্যতম অংশ গ্রহণকারী আশুতোষ সম্পর্কে পরবর্তীকালে বলেছেন :

"In the demonstration that followed the passing of the sentence, the students took a leading part, common among the youngmen all over the world, smashing the windows and pelting the police with stones. One of those rowdy youths was Asutosh Mukherjee, subsequently so well-known as a judge of the High Court and as a Vice-Chancellor of the Calcutta University."

(A Nation in Making :
Surendranath Banerjea)

হয় তো আশুতোষের পড়াশোনার বেশ ক্ষতি হয়ে থাকবে, তাই তিনি আর কাউকে জেনে শুনে বিষপানে উৎসাহিত করতে চান নি।

শিক্ষা ও রাজনীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ ও আশুতোষ

রাজনীতির প্রতি আশুতোষের এ রকম সর্বাত্মক অনীহার কারণ কি ? স্বামী বিবেকানন্দ (তখন নরেন্দ্রনাথ দত্ত) ছিলেন আশুতোষের প্রায় সমবয়সী। একই বছরে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক হন। দুইজনের পথ

বিপরীতমুখী হলেও দুইজনেই মানুষের জীবনে কল্যাণের পথ নির্দেশ করেছেন জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে। সে পথেই আসবে যথার্থ মুক্তি। স্বামীজী বিদেশ থেকে ফিরে এসে বলেছিলেন—

"I have nothing to do with the non-sense of Politics........ Education is the panacea of all evils. Educate ! Educate !! Educate !!! That is what is wanted."[১১]

এ প্রসঙ্গে তিনি শিক্ষার যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছেন তা কে না জানে :

"Education is the manifestation of the perfection already in man."

আশুতোষ যেন স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই রাজনীতির পথ সর্বতোভাবে পরিহার করে শিক্ষাবিস্তারের পথ বেছে নিয়েছিলেন। আর দেশবাসীর কানে কানে যেন বলেছিলেন—

"গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, আবার তোরা মানুষ হ'।"

তা হলেই জাতীয় মুক্তি ও স্বাধীনতা অনায়াসে করায়ত্ত হবে, সুরক্ষিত হবে।

---

১১. বিবেকানন্দ রচনাবলী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

শিক্ষক নির্বাচন

শিক্ষক নির্বাচন : জহুরী জহর চেনে—আনন্দ যজ্ঞে সবারে করি আহ্বান—এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে—'ছেলেধরা' আশুতোষ—শিক্ষকদের হাতে খড়ি—অঙ্কের অধ্যাপককে ট্রেনিং—পালির অধ্যাপককে ভরসা দান—ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপককে সাহস দান—চিত্রবিদ্যার অধ্যাপককে পথনির্দেশ—শিকারী পাখিই পারে বাচ্চাকে শিকার শেখাতে।

"........it is the eagle alone that is fit to teach the eaglets"
—Sir Asutosh.

*　　*　　*　　*

জহুরী জহর চেনে

আশুতোষ ছাত্রদের ফাঁকা উপদেশে ভুলিয়ে রাখেন নি। তাদের জন্য বিদগ্ধ অধ্যাপকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করেছেন, যেন ছাত্ররা পাঠাভ্যাসেই নিবিষ্ট থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক নির্বাচনে আশুতোষ এক অদ্ভুত স্বতঃসঞ্জাত ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। দেশ বিদেশ থেকে হীরা মাণিক সংগ্রহের অনেক জহুরী আছে। কিন্তু এমন মানুষ ধরার জহুরী স্বদেশে তো দূরের কথা, বিদেশেও দ্বিতীয় আর একজন কদাচিৎ দেখা গেছে। শিক্ষক বা অধ্যাপক নির্বাচনে তিনি দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনা করেন নি। তাঁর এই জাতি-ধর্ম-ভাষা বিমুক্ত মনোভাবের ফলেই দেশ-প্রদেশ-বিদেশের বেড়ি ছিন্ন করে "আত্মবিলোপী সমাহিত বিজ্ঞান সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালেন আশুতোষের আবিষ্কৃত মাদ্রাজী আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানবীর চন্দ্রশেখর বেঙ্কট রমন। ...আশুতোষের আমন্ত্রণে-আকর্ষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিলেন মনীষী ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, দাক্ষিণাত্যের দর্শনাচার্য সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, মহারাষ্ট্রীয় ভারতৈতিহাসিক দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, বহু ভাষাবেত্তা ভাষাবিজ্ঞানী পার্শী ব্যারিষ্টার জাহাঙ্গীর সোরাবজী তারাপুরওয়ালা, অর্থশাস্ত্রবেত্তা মনোহর লাল, গাণিতিক গণেশ প্রসাদ, কালিশ, বহুশ্রুত অধ্যাপক হেনরী ষ্টিফেন, প্রতীচ্য কলাবেত্তী ষ্টেলা ক্রামরীশ,

ফার্সী পণ্ডিত আগা কাজিম সিরাজী, আরবী ও ঐশ্লামিক শাস্ত্র বিশারদ আবদুল্লা সুরাবর্দী, দ্রাবিড়ী মহামহোপাধ্যায় লক্ষ্মণ শাস্ত্রী, অনন্তকৃষ্ণ শাস্ত্রী, আয়েঙ্গার ও রামচন্দ্রম্, জাপানী কিমুরা, সিংহলী শ্রমণ সিদ্ধার্থ।"

"১৯০৪ খৃষ্টাব্দের পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল একটি পরীক্ষাশালা মাত্র। এই প্রতিষ্ঠানে পরীক্ষা সম্বন্ধে আইন-কানুন, পরীক্ষার্থীদের নাম-ধাম, সংখ্যা, কোন্ স্কুল-কলেজ হইতে কোন্ পরীক্ষা দেওয়া হয় তাহার তালিকা, প্রশ্ন প্রস্তুত করা ও তাহা ছাপানো, পাসের তালিকা—ইত্যাদি পরীক্ষা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হইত এবং সিনেট-সিণ্ডিকেট প্রধানত এই সমস্ত বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন। ···সিনেটের থামওয়ালা বড়ো একতলা বাড়িটা এই সকল বিষয়ের জন্য সুপ্রচুর বিবেচিত হইত। সিনেট-হলের সম্মুখদিকের বামঘরের গৃহে রেজিষ্ট্রার বসিতেন···দক্ষিণ দিকের কামরায় অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট রেজিষ্ট্রার বিরাজ করিতেন। সিনেট হলের পশ্চিমদিকে ছোটো-খাটো সভা-সমিতি হইত এবং বৎসর ভরিয়া অল্পসংখ্যক কেরানিরা পরীক্ষা-সংক্রান্ত সমস্ত কাজ করিতেন। রাতারাতি যাদুকরের যাদুস্পর্শে যেন—"সিনেট হলে সেদিন পাগড়ী, ফেজ, হ্যাট, টুপি, নেকটাইয়ের সঙ্গে শিখা-ত্রিপুণ্ডক-তিলক-উত্তরীয়-উপবীতের নয়ন বিমোহন শোভায় শোভিত হল। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত বিশ্ববিদ্যার আদানপ্রদানরত গুরু শিষ্যমণ্ডলীর ঐকতানে অধুনা বিধ্বস্ত বিশাল সৌধটি গৃহবলিভূক বায়স সমাকুল চৈত্যবৃক্ষের মতো মুখরিত হয়ে উঠত।"[১]

আনন্দ-যজ্ঞে সবারে করি আহ্বান

আশুতোষ বিলক্ষণ জানতেন—"···জ্ঞানপথের পান্থের জাতিভেদ নাই, বর্ণবিচার নাই, কোনরূপ ভেদ-বৈষম্য নাই। যিনি যেখানে ছিলেন, আশুতোষের আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করিয়াছেন। মহারাষ্ট্র পণ্ডিত ডি. আর. ভাণ্ডারকর, সিংহলী পণ্ডিত রেভারেও সিদ্ধার্থ, ত্রিবাঙ্কুরের—রাও অনন্তকৃষ্ণ—হিন্দী পণ্ডিত ভাগবত সহায়—কাশীর পণ্ডিত সীতারাম শাস্ত্রী—মৈথিলী অধ্যাপক বাবুয়া মিশ্র—প্রয়াগবাসী অঙ্কের অধ্যাপক গণেশ প্রসাদ—মাদ্রাজী অধ্যাপক সি. ভি. রমন, রাধাকৃষ্ণণ—পার্শীজাতীয় পণ্ডিত প্রবর তারাপুরওয়ালা—পারস্য দেশবাসী

১. অধ্যাপক জনার্দন চক্রবর্তী—সুবর্ণলেখা, ১৯৭০

সিরাজী—জাপানী ও চীনা পণ্ডিত মাস্থদা ও কিমুরা—ইংরাজী অধ্যাপক স্টিফেন—অঙ্কের অধ্যাপক কালিস্—জার্মান পণ্ডিত ক্রল প্রভৃতি কত দেশের কত পণ্ডিত যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে কাজ করিয়া গিয়াছেন তাহা কি লিখিব।...তিনি মনস্থ করিয়াছিলেন, জগতের শিক্ষার্থীগণ, অন্ততঃ এশিয়া মহাদেশবাসী শিক্ষার্থীগণ আর লণ্ডন, কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড, বার্লিন, প্যারিস বা বোষ্টন বিদ্যালয়ে যাইবে না, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র মনে করিয়া...সকল দেশের লোক জ্ঞানার্জনের নিমিত্ত এই কলিকাতা মহানগরীতে আসিবে।"[২]

শিক্ষার মান উন্নয়নে এবং উন্নতি বজায় রাখতে তিনি সারা দেশ তো বটেই বিশ্বের সেরা গুণীদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে বক্তৃতা দানের জন্য। জ্ঞানান্বেষণে ব্রতী মহাপণ্ডিতগণ আশুতোষের আহ্বানে সবসময় সানন্দে সাড়া দিয়েছেন। "সর্বত্র গুণের পূজার জন্য তাঁহার হস্ত পুষ্প কুড়াইত, কোনো সম্প্রদায় ও ধর্মের প্রতি তাঁহার অতিরিক্ত অনুরাগ বা বিরাগ ছিল না। কোথায় কোন বিষয়ের কোন পণ্ডিত আছেন, তাহার সমস্ত খবর তিনি জানিতেন।"[৩]

"...এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাচ্য জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্যাকেন্দ্ররূপে পাশ্চাত্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির মধ্যে সর্বোচ্চ আসন না হউক—একাসন লাভ করিবে ইহাই ছিল তাঁর লক্ষ্য। যে সকল অধ্যাপক ও গুণী ব্যক্তিরা জগৎ জুড়িয়া যশঃ অর্জন করিয়াছেন, যাঁহাদের পুস্তক পড়িয়া আমরা তাঁহাদের পাণ্ডিত্য দর্শনে বিস্মিত হই, তাঁহাদের তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আনাইয়া বক্তৃতা দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

রাশিয়া হইতে ব্যবহার শাস্ত্রের গুরু ভিনোগ্রেডক্, ফরাসী হইতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য কলাবিৎ ফুসে...সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখক ম্যাকডোনেল... প্রাচ্যবিদ্যার অগাধ পণ্ডিত ডাঃ সিলভাঁ লেভি...স্যার এণ্ড্রু রাসেল ফরসিথ... হেনরী এডোয়ার্ড আরমষ্ট্রং, পণ্ডিত প্রবর ডাঃ গিলবার্ট টমাস ওয়াকার...জেকবি, ডাঃ থিবো, জার্মান পণ্ডিত প্রফেসর ওল্ডেনবর্গ, উইণ্টারনিজ, আর্থার স্মৃষ্টার... ইহাদের আবির্ভাবে সমস্ত বাঙ্গালা জুড়িয়া তরুণদের মধ্যে অপূর্ব প্রেরণা জাগিয়াছে।"[৪]

---

২. ৩. ৪. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন

রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, "বিদেশ হইতে বড় বড় অধ্যাপকেরা আসিয়া উপদেশ দিতেছেন এবং আমাদের দেশের মনীষীদেরও এখানে আসন পড়িতেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের এইটুকু ভদ্রতাও আশু মুখুর্জ্যে মশায়ের কল্যাণে ঘটিয়াছে।"[৫]

বিশিষ্ট অধ্যাপকমণ্ডলীর দ্বারা সূচনা থেকেই স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের গুরুত্ব অনুভব করেই আশুতোষ খুঁজে খুঁজে প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিভাবান শিক্ষক নিয়োগ করতে পেরেছেন এবং তজ্জন্য যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন তা তিনি ১৯১৪ খ্রীঃ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন উপলক্ষে বলেছেন—

> "It is a matter for sincere congratulation that we have been able to secure scholars of high distinction as our first Professors, because it is obviously of supreme importance that our work should be initiated under the guidance of not merely the most accomplished but also the most devoted and most enthusiastic workers available."

এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে

আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়-মহাতীর্থে সমস্ত জগৎকে আমন্ত্রণ করে আনন্দ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছেন। আশুতোষের আহ্বানে প্রায় সমগ্র বিশ্বের প্রতিনিধি সমবেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে এক মহামিলনক্ষেত্ররূপে পরিণত করেছিলেন। "ইসলামের মৌলবী, বৌদ্ধের ফুঙ্গী, হিন্দুর ভট্টাচার্য ও খ্রীষ্টানদের পাদ্রী যিনি যেখানে ছিলেন আশুতোষের আহ্বানে ছুটিয়া আসিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুয়ারে ভিড় করিয়াছেন।"[৬]

রবীন্দ্রনাথের কবি কল্পনায় পুণ্যতীর্থ "এই ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে"র যে চিত্র পাওয়া যায়, তারই বাস্তব রূপায়ণ করে যান আশুতোষ। "সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে" তিনি জ্ঞান-তীর্থকে পরিস্নাত করিয়েছিলেন।

> "Singularly free as he was from racial, sectarian and provincial narrowness, he helped to make the University a truly national Institution."[৭]

---

৫. শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৬. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন

৭. Dr. S. Radhakrishnan—Calcutta Review, July 1924

রবীন্দ্রনাথের পরিকল্পিত 'বিশ্বভারতী'র বাস্তব রূপ আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েই দেখিয়ে গেলেন।

'ছেলে ধরা' আশুতোষ

আশুতোষ দেশ বিদেশ থেকে খুঁজে খুঁজে যে কেবলমাত্র প্রবীন ও অভিজ্ঞ অধ্যাপকদের এনেছিলেন তা নয়, তাঁদের সহযোগী হিসাবে জুড়ে দিলেন এক দল অত্যন্ত প্রতিভাবান নবীন অধ্যাপক—যাঁরা উত্তরকালে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিভূ, মহারথী ও ভারতরত্ন দেশবরেণ্য বলে গণ্য হয়েছেন এবং এই শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত সারা ভারতে শিক্ষা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একাধিপত্য করে গেছেন। কলিকাতা তো বটেই, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদেরও তিনি খোঁজ খবর রাখতেন। কোথাও কোন বিষয়ে মেধাবী ছাত্রের সন্ধান পেলেই তিনি তাকে তার নিজের কিংবা অভিভাবকদের অভিলষিত পথ থেকে নিয়ে এসে শিক্ষকতায় নিযুক্ত করে দিতেন। এই একটি বিষয়ে আশুতোষকে একজন পাকা 'ছেলে ধরা' বলা যেতে পারে। বাঙালী যে দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সর্বাধিনায়কত্ব করেছে তার ষোলআনা কৃতিত্ব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের প্রাপ্য। ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ আশুতোষের এই নতুন প্রতিভার সন্ধান সম্পর্কে বলেছেন—

> "To my mind his claim to greatness rests not so much on the reforms he initiated and worked out—great as they are—as on his sympathy for scholars, enthusiasm for learning and the power to communicate them to all near to him. . . . . In years to come it will be recognised, to his lasting credit, that he furthered the true progress of his people by diverting some of the best among them, from the chief industries of the land, law and Government service, to scholastic careers. Many of those who have enhanced the reputation of the University in the world of letters—took to literary and scientific pursuits, thanks to the passionate pleadings of Sir Asutosh."[৮]

৮. The Late Sir Asutosh Mookerjee—S. Radhakrishnan, Calcutta Review, Asutosh Number, 1924.

শিক্ষকদের হাতে খড়ি

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের হাতে ধরে অধ্যাপনা শেখানো আশুতোষের শিক্ষা চিন্তার আর একটি উজ্জ্বল দিক। কাজের ধরণ বুঝিয়ে, reference বই'র সন্ধান দিয়ে, লাইব্রেরী ব্যবহারের সুযোগ দিয়ে তিনি তাঁদের অধ্যাপনায় সহায়তা করতে এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করতে সব সময় সচেষ্ট ছিলেন। একাধিক কৃতী অধ্যাপকদের জবানীই এই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্যরূপে গৃহীত হতে পারে।

(ক) অঙ্কের অধ্যাপকের ট্রেনিং

"বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে যোগদান করিলাম। কিন্তু মনে বড় ভরসা পাইতেছিলাম না। এম. এ. ক্লাসে পড়াইবার যোগ্যতা আছে কি ? কি এমন শিখিয়াছি আমি। অকপটে এই ভয়ের কথা আশুতোষকে বলিয়া ফেলিলাম একদিন। আশুতোষ এমন ভাব দেখাইলেন যেন তিনি নতুন কথা শুনিতেছেন। বেশ একটু রাগের আমেজ মিশাইয়া কহিলেন, "কেন, যা পড়েছিস এতদিন তাই পড়াবি, এতে আবার ভাবনার কি আছে। পড়াশুনা করেছিস এতদিন না ফাঁকি দিয়ে এসেছিস, পডাশুনা করে থাকলে ঠিক পারবি।
···আচ্ছা, এক কাজ কর, তোকে কতগুলি বই আর পত্রিকার নাম বলে দিচ্ছি। এগুলি বেশ করে দেখবি। অন্য কোথাও না পেলে আমার ওখান থেকেই নিয়ে যাস ওগুলি। ১৫ দিন পর পর আমার কাছে আসবি। কোথাও অসুবিধা হলে আমি বুঝিয়ে দেবো। তবে আমি কিন্তু পড়া নেবো সেকথা মনে রাখিস। ভাল করে পড়বি। যা—এইবার শুরু কর তোর কাজ।"[৯]

(খ) পালি ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপকের প্রতি

"একটা নতুন কিছু দেখাইতে চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ Original research হইবে আমাদের কাজের বৈশিষ্ট্য। ভয় কোরো না, Library আছে, তুমি আছ, আর—আমি আছি। প্রয়োজন হলেই আমায় সব জানাইবে।"[১০]

৯. স্মৃতিচারণ—সতীশচন্দ্র ঘোষ (বাণীমন্দির, আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৭১)
১০. স্মৃতিচারণ—শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র (ঐ ঐ ঐ

(গ) ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপককে পথ নির্দেশ

"নতুন এম. এ. পাশ, একেবারেই এম. এ. ক্লাসে পড়াতে হবে! এ প্রস্তাবটা শুনে বুক ঢিপ ঢিপ করছিল, তাঁর (আশুতোষ) সঙ্গে দেখা করে আমার আশঙ্কার কথা নিবেদন করি। তিনি সমস্ত ভয়, সমস্ত সঙ্কোচ, তাঁর সকল বাধা-উপেক্ষা করা, সকল ভয়-হরা উৎসাহের পিঠ চাপড়ানি দিয়ে বললেন, "ভয় কি? যে টুকু পড়েছ, সেটুকু ভালো করেই পড়েছ, এ বিশ্বাস মনে আছে তো? এই তো পড়বার সময় হলো, সারা জীবন এখন থেকে জ্ঞানে এগোতে হবে। সাহস কর, উচ্চ সংকল্প নিয়ে নেমে যাও, যাতে নিজের ইউনিভার্সিটির নাম, দেশের নাম উজ্জ্বল করতে পার"।[১১]

(ঘ) চিত্রবিদ্যার অধ্যাপকের সাক্ষ্য

"অত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার ব্যাপার, তার কোনখানে একটুখানি ফাঁক ছিল, তা আমার স্বপ্নেরও অগোচর ছিল, যখন তিনি (আশুতোষ) আমাকে এই জায়গাটা নির্দেশ করে দিয়ে বল্লেন—"ও দিকটা দেখ," তখন আমার চোখ পড়লো সেদিকে, আমি দেখলেম সত্যিই একটা স্থান আছে রূপবিদ্যার ওখানে।···

আশুতোষ বলিলেন, "তুমি মাঝে মাঝে বিশ্ববিদ্যালয়ে চিত্রশিল্প সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবে এবং যদি কেহ ডিগ্রি পাইতে চায়, তবে তাহাকে উপদেশ দিয়া ও শিখাইয়া সেই উপাধির যোগ্য করিয়া তুলিবে, তোমার বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিবার দরকার হইবে না।···

পরীক্ষা দিতে হল একদিন, লেকচারের পর তিনি বললেন, দেখ, আগে আমিও একটু আধটু আর্ট সম্বন্ধে চর্চা করেছি। এর পর থেকে প্রত্যেক প্রবন্ধ আমাকে অতি সাবধানে লিখতে হতো। এই যে তিনি বলেছিলেন তিনি আর্ট চর্চা করছেন, তার প্রমাণ হঠাৎ পেলাম একদিন তাঁর বাড়ির ঘরে একটা আলমারি ঠাসা আর্টের বই দেখে—চিত্রবিদ্যার অমূল্য সমস্ত পুস্তক, খুব পুরাতন, খুব আধুনিক সব ধরা সেখানে।···"[১২]

---

১১. স্যার আশুতোষ—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (বঙ্গবাণী, ৩য় বর্ষ, আষাঢ় ১৩৩১)

১২. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্মৃতি সভায় পঠিত ভাষণাংশ

ঈগল পাখিই তার বাচ্চাকে শিকার শেখাতে পারে

আশুতোষ মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন উপযুক্ত শিক্ষকের তত্ত্বাবধান ছাড়া, কখনো ছাত্রদের যথোপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া যায় না। শিক্ষক নির্বাচনের মাপকাঠি কি হওয়া উচিত এবং এ সম্পর্কে তার মূলমন্ত্র কি ছিল তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন—

"Ample provision should be made for liberal, for professional and for mental studies, under the guidance of first-rate teachers, the most eminent, the most earnest, the most independent in their work, for it is the eagle alone that is fit to teach the eaglets."[১৩]

(খ্যাতিমান, নিষ্ঠাবান ও কর্তব্যকর্মে স্বাধীনচেতা প্রথম শ্রেণীর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে ছাত্রদের ব্যাপকতর, বৃত্তিমূলক ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়াদি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ, একমাত্র শিকারী পাখিই জানে কেমন করে বাচ্চাকে শিকার ধরা শেখাতে হয়।)

অভিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত শিক্ষকের সাহচর্যে ছাত্রসমাজ কেমন ভাবে উপকৃত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে ১৯১৬ খ্রীঃ ভারত সরকার আশুতোষের সভাপতিত্বে যে কমিটি গঠন করেন, তার রিপোর্টে বলা হয়—

"All students gain inestimably from an intimate association with a teacher of ripe experience and scholarly habits, who will not only assist him in solving difficulties but also inculcate in him the proper habits of study and thought".[১৪]

শিক্ষক নির্বাচনে বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব ঃ অধ্যাপকের কর্তব্য

ছাত্রদের মনে উৎসাহ উদ্দীপনা জাগাতে পারে, তাদের জীবনে ও চরিত্রে সততা, ন্যায়নিষ্ঠা, শৃঙ্খলাপরায়ণতার স্থায়ী ছাপ ফেলতে পারে এমন অধ্যাপক নিয়োজিত করা যে বিশ্ববিদ্যালয়েরই দায়িত্ব আশুতোষ সে কথা বিস্মৃত হন নি—

"No University is worthy of its reputation which does not enrol among its Professors men best fitted to advance the

---

১৩. Sir Asutosh Mookerjee's Mysore Address.

১৪. Report of the Committee on Post-graduate Teaching, 1916.

bounds of knowledge which does not relieve them of administrative and tutorial work and thus place them in a position consistent with the most effective discharge of their legitimate duties."

আর সেই অধ্যাপকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে আশুতোষ স্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। পুস্তকস্থ বিষয় তোতাপাখির মতো আউড়ে যাওয়া অধ্যাপকের ধর্ম নয়। তাঁর মতে :

"Every Professor must be a student and every advanced student must be animated by a higher ideal than mere absorption of knowledge. ....While it is manifestly the duty of a Professor to assimilate existing knowledge, he has a higher duty to perform up to the limits of his powers and his opportunities—he must make strenuous effort to contribute to the increase of knowledge and the advancement of truth."[১৫]

উল্লিখিত ধরণের অধ্যাপক কেমন করে জ্ঞানের বিকাশ ও বিবর্ধনে সহায়তা করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে আশুতোষ বলেন—

"A Professor of this type, himself engaged in research, widens the bounds of knowledge, and incorportes in his lectures all the important information on his subject available at the time ; he discusses new facts that come to light, new theories that are put forward, on the earliest opportunity, and is expected to bring up his lectures to date constantly and to refer his students to the original authorities."[১৬]

অধ্যাপক তাঁর এই পবিত্র কর্মে ছাত্রকেও সহযোগী হিসেবে নেবেন এবং ছাত্র ও অধ্যাপক উভয়ের যৌথ গবেষণার ফলে জ্ঞান রাজ্যের পরিসীমা বিস্তৃততর হবে, সত্যানুসন্ধান অব্যাহত থাকবে। এই উদ্দেশ্য সাধনে বিশ্ববিদ্যালয়েরও কর্তব্য হল গবেষণায় উৎসাহ দান এবং যে কোন প্রান্ত থেকে মননশীল অধ্যাপক নিয়োগ করা :

"No University can rightly be regarded as fulfilling the purpose of its existence unless it affords to the best of its students, adequate encouragement to carry on research and it enables intellectual power whenever detected, to exercise its highest functions."[১৭]

---

১৫. ১৬. ১৭. C. U. Convocation Address

তৃতীয় অধ্যায়

পাঠক্রম নির্ধারণ, প্রশ্নপত্র রচনা ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন

(ক) পাঠক্রম নির্ধারণে আশুতোষের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী—স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে নির্দিষ্ট সীমারেখা ও সামঞ্জস্য—প্রথা-বহির্ভূত বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা—চিত্রবিদ্যা বিভাগ স্থাপন—সঙ্গীত বিভাগ স্থাপনের অপূর্ণ ইচ্ছা—

(খ) পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রি-দোষ—পরীক্ষা প্রথার সংস্কার—প্রশ্নপত্র রচনায় উত্তর পত্রের মূল্যায়নে আশুতোষের ছাত্রদরদী মনোভাব—পরীক্ষার অর্থ ছাত্রমেধ যজ্ঞ নয়—পরীক্ষা ব্যবস্থার কড়াকড়ি করে শিক্ষা সংকোচন অনভিপ্রেত।

*　　*　　*　　*

পাঠক্রম নির্ধারণে আশুতোষের দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব

কথায় বলে 'কালি কলম মন, লেখে তিন জন'; তেমনি বলা যায় 'শিক্ষা শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রম, তিন নিয়ে বিদ্যাশ্রম'। এই ত্রি-ধারার একই সঙ্গে সুষ্ঠ সমন্বয় না হলে কোন শিক্ষা সর্বাঙ্গসুন্দর কল্যাণদায়ক হতে পারে না। ছাত্র ও শিক্ষক নিয়ে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাক্রম বা পাঠক্রমের কথাও অবশ্যই আলোচনার দাবী রাখে।

পাঠক্রম বলতে আশুতোষ বই'র তালিকা বোঝেন নি। তিনি পাঠক্রম স্থির করেছেন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য সামনে রেখে। শিক্ষাক্ষেত্রের তিনটি স্তরের মধ্যে প্রথম স্তর অর্থাৎ স্কুল স্তর সম্পর্কে তিনি প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই উল্লেখ করেছেন—

"প্রবেশিকা স্তরে পাঠ্যের অন্তর্ভুক্ত হবে এমন সব বিষয় যা শিক্ষা দেওয়া হলে প্রকাশ-শক্তি, যুক্তি-শক্তি ও দর্শন-শক্তি উন্নীত হবে। প্রকাশ-শক্তি বিকাশের শ্রেষ্ঠ বাহন হল মাতৃভাষা··· ছাত্রের নিজ মাতৃভাষার জ্ঞান ও রচনা-শক্তির প্রয়োজন হবে প্রবেশিকা স্তর থেকে স্নাতক স্তর পর্যন্ত। তাছাড়া প্রয়োজন··· স্পষ্ট, সরল ও নির্ভুল ইংরেজী জ্ঞান। আরও থাকা চাই—প্রাচীন ভাষায় নির্ভুল জ্ঞান।

যুক্তি-শক্তি বিকাশের জন্য তাকে শিখতে হবে গণিত ও জ্যামিতি। প্রায়োগিক কাজ দিয়ে তা আরম্ভ হবে, এবং ক্রমে ক্রমে জ্যামিতিক যুক্তি প্রক্রিয়ায় হবে সে দীক্ষিত। দর্শন-শক্তির অনুশীলনের জন্য তাকে দিতে হবে প্রায়োগিক পদার্থবিদ্যা বা কলা-বিদ্যা বা অজৈব রসায়ন বিদ্যা।" মহীশূর সমাবর্তন ভাষণে তিনি স্কুল বা প্রবেশিকা স্তরে নতুন আর কয়েকটি বিষয় যোগ করেন—

"তার (ছাত্রের) মানস-দৃষ্টি প্রসারণের জন্য প্রাচীন ভাষা, ভূগোল, ইংল্যাণ্ড ও ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন একান্ত দরকার। এবং আধুনিক ইতিহাসের প্রারম্ভিক জ্ঞানেরও প্রয়োজন। এর পরে দুই স্তরের কলেজীয় ও বিশ্ববিদ্যালয়িক শিক্ষা। আশুতোষ কলেজী শিক্ষায় জোর দিয়েছেন 'পুঙ্খানুপুঙ্খতার' উপর, আর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গবেষণার' উপর।"

প্রথা-বহির্ভূত বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা

শুধু মাত্র প্রচলিত পাঠক্রমের দিকেই আশুতোষের নজর নিবদ্ধ ছিল না, নতুন নতুন বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানেও তিনি যত্নবান ছিলেন। ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাময় বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ে তাঁর অনুরাগ অপরিসীম। কিন্তু ঐতিহ্যশালী প্রাচীন বিষয়ে শিক্ষাদান ও গবেষণাতেও তাঁর সমান উৎসাহ। তিনি আধুনিক যুগের অঙ্ক-শাস্ত্র, রসায়নশাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা বিষয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার ব্যবস্থা করেছেন, সেই সঙ্গে পালি, সংস্কৃত, প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস অধ্যয়ন ও গবেষণাকে একই মর্যাদা দিয়েছেন। কোন বিষয়েই শিক্ষা বা জ্ঞানের সীমা পরিসীমা তিনি মানতেন না। এই প্রসঙ্গে দু'একটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার প্রচেষ্টা থেকে আশুতোষের মানসিকতার এবং নতুন নতুন বিষয়ে শিক্ষাদানের আগ্রহের পরিচয় মিলবে।

ললিতকলা শিক্ষা ব্যবস্থার কথা

"আশুতোষ ঠিক করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে ললিতকলা (Fine Arts) শিক্ষার ব্যবস্থা করবেন। চিত্রবিদ্যা ললিতকলার অন্তর্গত, তিনি প্রথমে চিত্রবিদ্যা দিয়েই কাজটা আরম্ভ করলেন। তাঁর ইচ্ছা অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই বিভাগের ভার গ্রহণ করেন। ···তিনি শিল্পগুরুকে সিনেটের একজন 'ফেলো' করলেন

এবং চিত্রবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক নিযুক্ত করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাগেশ্বরী বক্তৃতামালা'র ইহাই সূচনা।" এরপর স্বয়ং অবনীন্দ্রনাথের কলমে শোনা যাক—

"সকল বিষয়ে জানার জন্য কি একান্ত উৎসাহ ছিল তাঁর মনের মধ্যে। রূপ-বিদ্যা, বিদ্যাচর্চার মধ্যে তাকে স্থান দিলেও চলে, না দিলেও সংসার চলে যায়, এই তো আমাদের ধারণা। রূপবিদ্যার চেয়ে ডাক্তারি অস্থিবিদ্যা বেশি কাজে আসে, জীবনে এ ধারণাও সাধারণ। কিন্তু এই অসাধারণ মানুষটি রূপতত্ত্বের স্থান আছে বিশ্ববিদ্যালয়ে বেশি, এটা ধরলেন এবং সেইভাবে কাজ আরম্ভ করলেন।"[১]

সঙ্গীত বিভাগ স্থাপন সম্বন্ধে আশুতোষের অপূর্ণ ইচ্ছা

সঙ্গীত সম্বন্ধেও একটি স্নাতকোত্তর বিভাগ খোলার ইচ্ছা ছিল আশুতোষের। তিনি সাধক-গায়ক দিলীপকুমার রায়ের কাছে কথা প্রসঙ্গে এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা স্বয়ং দিলীপকুমার লিপিবদ্ধ করে গেছেন।

"পূজার সময় আমি তখন মধুপুরে। আশুতোষের ওখানে সন্ধ্যায় আহারের নিমন্ত্রণ ছিল। অনেকক্ষণ গান বাজনা হোল। তাঁকে সংগীতে বেশ উৎসাহী দেখে মনটা ভারি খুসী হোল। কারণ আমার ধারণা ছিল যে সংগীত সম্বন্ধে তাঁর ধারণা আমাদের অন্যান্য বড়লোকদেরই মত—অর্থাৎ 'ও একটা সখ মাত্র' গোছের। আমাদের মধ্যে কথায় কথায় উচ্চশিক্ষায় ললিতকলার (Fine Arts) স্থান সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল। আশুতোষ বললেন, 'আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে সংগীত শেখাবার আমার খুবই ইচ্ছা ছিল হে। কিন্তু কি বলব সঙ্গীতের জন্য কেউ টাকা দিতে চায় না। আমি একবার চেষ্টা করেছিলাম—তাই একথা বলতে পারি।' আমি বললাম যে এটা দুঃখের বিষয়। কারণ ইউরোপে অনেক বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়েই তারা সংগীত প্রভৃতি আর্টের অধ্যাপনার ব্যবস্থা করেছে—অথচ আমরা এ সম্বন্ধে এতই উদাসীন!" আশুতোষ একটু হেসে বললেন, "তা আর বলতে! আমাদের দেশ এ সম্বন্ধে এতই পেছিয়ে রয়েছে যে চিত্রবিদ্যায় আমি অধ্যাপনার ব্যবস্থা করার দরুণ লোকে বলে, 'আমাদের গরীবের ও ঘোড়া রোগ কেন?' ইত্যাদি ইত্যাদি।

১. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—স্মৃতি সভায় পঠিত ভাষণ থেকে

আমাকে এজন্য কি কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছে ? সে যাই হোক সঙ্গীত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি ঢোকাবই ।"[২]

এই ঘটনার পর আশুতোষ আর কয়মাস মাত্র বেঁচে ছিলেন। তাই তাঁর জীবদ্দশায় এ সঙ্কল্প পূর্ণ হতে পারে নি। তবু এই ঘটনা থেকে আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার আরেকটি দিক পাঠকের সামনে উন্মোচিত হল।

পরীক্ষার অর্থ ছাত্রমেধ যজ্ঞ নয়

শিক্ষার বৃহত্তর দিকই শুধু নয়, ক্ষুদ্রতর খুঁটিনাটি দিকেও আশুতোষের সমান সজাগ দৃষ্টি ছিল। সে দৃষ্টিপাতে ছাত্রদের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগই প্রকাশ পেত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে স্কুল ও কলেজ শিক্ষা যেমন অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তেমনি শিক্ষক শিক্ষার্থী শিক্ষাক্রমের সঙ্গে প্রশ্নপত্র তৈরী, পরীক্ষা নেওয়া ও উত্তরপত্র দেখাও যে একসূত্রে গ্রথিত তা আশুতোষের সতর্ক সূক্ষ্ম নজর এড়ায়নি। শিক্ষানীতি সম্পর্কে ভারত সরকারের ১৯০৪ খ্রীঃ সংকল্পে আছে—

"পরীক্ষা অর্থে বর্তমানে যা বোঝায় তা সাধারণ শিক্ষার বাহন হিসেবে অনুপস্থিত ছিল প্রাচীন ভারতে। এমনকি ১৮৫৪-এর প্রেরিতকেও (despatch) তা প্রাধান্য পায় নি। অধুনা এর আয়তন কল্পনাতীত ভাবে বেড়ে গেছে এবং এর প্রভাব প্রাধান্য বিস্তার করেছে ভারতীয় গোটা শিক্ষা পদ্ধতির উপর। ফলে পাঠ্যধারায় কঠিন ছকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে শিক্ষা, যে সব শিক্ষা প্রণালী লিখিত পরীক্ষায় অনির্ণেয় সে সব হয়েছে অনাদৃত, এবং শিক্ষক ও ছাত্ররা যতটা পরীক্ষকের প্রশ্নের উপর মনোযোগ দিয়েছেন, তাঁদের শক্তি ততটা সংহত করেন নি বিশুদ্ধ অধ্যয়নে।"

(অনুবাদ—অনিল বিশ্বাস, আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা)

পরীক্ষা ব্যবস্থার ত্রি-দোষ

অধ্যয়নের চেয়ে পরীক্ষা গ্রহণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের কুফলের প্রতি আশুতোষ শিক্ষাবিদ্‌দের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় সমাবর্তন

২. গৌরব - দীপ—দিলীপকুমার রায় (বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩১)

ভাষণেই। শুধুমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের জন্যই বিশ্ববিদ্যালয়—এই ভুল ধারণার জন্যই অধ্যয়নের গুরুত্ব হ্রাস পায়, এবং যেন তেন প্রকারেণ পরীক্ষা দান ও পাস করাই মুখ্য স্থান অধিকার করে। এই প্রথার দোষাবলী সুনিপুণভাবে বিশ্লেষণ করে আশুতোষ বলেন :—

"While it may be conceded that a system of examinations propearly and reasonably conducted, has undoubted advantages in every system of academic study, it would be idle to deny that there are grave abuses and distinct tendencies to abuse in the extraordinary development of the Examination System in modern times.

One of the greatest evils is hasty cram at the last moment instead of the quiet and deliberate appropriation of knowledge from day to day. Another, and, perhaps, a still greater evil, is the desire to adapt the teaching to the examination, or to put it from the point of view of the student, an ingenious attempt to circumvent the examiner by a close study of his habits and proclivities. A third evil, equally disastrous, is an artificial determination of subjects of study which are selected by the student, not entirely from the view of his special aptitude but very often from considerations whether a particular subject pays well at the examination. These and other evils which, if not inherent in, are at any rate concomitant to all elaborate systems of examinations, are naturally aggravated, where, as here, a University exists exclusively for purpose of Examination."*

[অর্থাৎ পরীক্ষা পদ্ধতির দোষের মূল হল ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন। ঐ আইনেই বিশ্ববিদ্যালয়কে কেবলমাত্র পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের প্রতিষ্ঠানরূপে স্থাপিত করা হয়েছিল। যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল "Advancement of Learning", কিন্তু উদ্দেশ্যের বিপরীত কর্ম করার ফলেই পরীক্ষা ব্যবস্থায় তিনটি প্রধান দোষের সূত্রপাত ঘটে। প্রথমতঃ শেষ মুহূর্তে না বুঝে গোগ্রাসে মুখস্থ করা, দ্বিতীয়তঃ, পরীক্ষকের পছন্দ অপছন্দ, অভ্যাস ও ধরণ-ধারণ দেখে শুনে নানাবিধ চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাঁর চোখে ধুলা দেয়ার

*. Convocation Address, 1908.

প্রচেষ্টা, তৃতীয়তঃ, সহজে পরীক্ষা পাশের উদ্দেশ্যে অধিক নম্বর পাওয়ার উপযোগী বিষয় নির্বাচন। একমাত্র পরীক্ষার মধ্যেই কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ থাকলে এ-জাতীয় অনাচার হতে বাধ্য।]

পরীক্ষা প্রথার সংস্কার

পরীক্ষা প্রথার ত্রি-বিধ দোষ উদ্‌ঘাটন করে আশুতোষ তাঁর প্রতিকারার্থে বদ্ধপরিকর হলেন। উপাচার্যরূপে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভার গ্রহণের অব্যবহিত পরে থেকে পরীক্ষা গ্রহণের বিষয়ে যে তিনি অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন উপরোক্ত ভাষণাংশেই তার প্রমাণ মেলে। প্রশ্নপত্র তৈরী, উত্তরপত্র দেখা, উত্তরপত্রের মূল্যায়ন প্রভৃতি ব্যাপারে আশুতোষ নিজস্ব বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করেন। বিদ্যা শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হলে এযাবত যেমন সুদীর্ঘ প্রশ্নপত্র রচনা ও কঠোরভাবে তার উত্তরপত্র দেখার ব্যবস্থা ছিল তা তিনি শিথিল করে দেন। তিনি বলতেন, "ছাত্র হইয়া ছাত্রদের পরীক্ষক হইতে হয়।" এই প্রশ্নপত্র তৈরী, খাতা দেখা, নম্বর দেওয়া প্রভৃতি বিষয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠদের কলমে অনেক সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। তা থেকেই আশুতোষের অন্তরে ছাত্রদের জন্য কি অসীম দরদ লুকিয়েছিল তা ধরা পড়ে। প্রথমেই আশুতোষের ঘনিষ্ঠতম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপান্তরের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের কথা দিয়ে শুরু করা যাক। "আশুতোষের সহিত প্রশ্নকর্তাদের অনেক বিষয়েই পরামর্শ করিবার রীতি প্রবর্তিত হইল। পোষ্ট-গ্রাজুয়েট বিভাগের বহু-সংখ্যক ফ্যাকালটিরই সভাপতি ছিলেন আশুবাবু। প্রশ্নকারীদের উপর নির্দেশ হইত প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যেন পরামর্শ করিয়া প্রশ্ন তৈয়ার করা হয়। খসড়া প্রস্তুত হইলে আমরা আশুবাবুর নিকট লইয়া যাইতাম।

তখন পূর্বকার রীতি অনুসরণ করিয়া যে খসড়া প্রস্তুত করিতাম, তাহার জন্য তাহার কত ভ্রূকুটি সহ্য করিয়াছি তাহা আর কি লিখিব? প্রশ্নকারীকে তিনি বলিতেন, মহাশয়, এটি স্মরণ রাখিবেন যে, প্রশ্নদ্বারা আপনার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় আমরা মাপ করিব না। আপনি কত বড় বিদ্বান, তাহা ক্ষুদ্র বালকদিগকে বুঝাইয়া আশ্চর্যান্বিত করিতে যাইবেন না, —এটি সর্বদা স্মরণ রাখিবেন যে —যে শ্রেণীর ছাত্রদের পরীক্ষা হইবে, সেই সেই শ্রেণীর বালকদিগের নিকট আপনারা যাহা ন্যায়ত প্রত্যাশা করিতে পারেন, সেই পরিমাণ বিদ্যা তাহাদের

হইয়াছে কিনা, তাহাই দ্রষ্টব্য, অতিরিক্ত কোন জটিল সমস্যা-দ্বারা পরীক্ষা গৃহে তাহাদের মাথা ঘুরাইয়া দিবেন না।"[৪]

ছাত্র-দরদী আশুতোষ : কয়েকটি দৃষ্টান্ত

অধ্যাপক গৌরীশঙ্কর দে ছিলেন অঙ্কের বিশিষ্ট অধ্যাপক। একবার ম্যাট্রিকুলেশনের অঙ্কের প্রশ্নপত্র তৈরী করে তিনি স্যার আশুতোষকে দেখাতে নিয়ে যান। প্রশ্নের খসড়া দেখেই আশুতোষ বুঝলেন—প্রশ্ন খুব কঠিন হয়েছে। তিনি তখন অধ্যাপক দে-কেই ঐ প্রশ্নের উত্তর করতে বললেন। তাতে তাঁর আড়াই ঘণ্টা সময় লাগল। আশুতোষ তখন তাঁকে বললেন— "এখন দেখিতে পাইতেছি আপনার মত মনস্বী ও গণিতের প্রধান অধ্যাপকের নিজের রচিত প্রশ্নের উত্তর দিতে ২½ ঘণ্টা সময় ব্যয় করিতে হইয়াছে। ছাত্রেরা কি আপনার মতো কৃতী যে, তাহাদের নিকট আপনি এইরূপ ফল প্রত্যাশা করিতে পারেন ?" তারপর তাঁকে বললেন—"খুব মেধাবী ও মনস্বী ছেলেরা যেরূপ জানে, সেই আদর্শে প্রশ্ন প্রস্তুত করিবেন না। যাহারা মাঝামাঝি দলের ছেলে তাহাদের অনুযায়ী প্রশ্ন দিবেন। জানিবেন প্রশ্ন হইবে average ছেলেদের জন্য।"[৫]

এই প্রসঙ্গে আশুতোষের স্নেহধন্য আরো একজন খ্যাতনামা অধ্যাপকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে—

"আশুতোষ ছাত্রদরদী ছিলেন তাহা সকলেই জানেন। শিক্ষার ব্যাপক প্রসারে আশুতোষ মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। বাংলার ঘরে ঘরে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ যুবক এবং প্রতিগ্রামে অন্তত একজন স্নাতক তিনি দেখিতে চাহিয়াছিলেন। দেশের প্রধান সমস্যা শিক্ষার সমস্যা, একথা সকলেই বলেন। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে সেই সমস্যার সম্মুখীন হওয়া এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনার আয়োজন আর কোন মনীষী করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, আমার জানা নাই।

মনে আছে, একবার আমি বলিয়াছিলাম—আপনি বড় সহজ প্রশ্ন করেন। ক্যালকুলাসে ছাত্ররা এত বেশী নম্বর পায় যে, অন্য পেপারে পরীক্ষা না দিলেও ওদের চলে। আশুতোষ কি ভাবিয়া বলিলেন—'বেশ তুই এবার প্রশ্ন কর। কি করিস দেখব'। আমি প্রশ্ন করিয়া লইয়া গেলাম। আশুতোষ প্রশ্নের

৪. ৫. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশ চন্দ্র সেন

উপর একবার চোখ বুলাইয়া ওটা ছুঁড়িয়া ফেলিলেন দূরে। তারপর শুরু হইল বজ্রগর্জন।

'এই তোর paper হয়েছে। বিদ্যা জাহির করবার আর জায়গা পেলি না। যা—আবার সেট করে নিয়ে আয় পেপারটা।' লজ্জায় অধোবদন হইয়া রহিলাম।"[৬]

পরীক্ষা পত্রের মূল্যায়নের প্রশ্নটি তাঁর মনকে এমনই নাড়া দিয়াছিল যে, সমাবর্তন ভাষণেও তিনি তার উল্লেখ না করে পারেন নি। তিনি বলেছেন—

> "Mere severity of examination does not always effectively advance the standard of teaching ; and the aims of all sound systems of education ought to be, not so much to keep back the unqualified as to reduce their number to an absolute minimum."[৭]

(কেবলমাত্র পরীক্ষার কড়াকড়িতেই সব সময়ে শিক্ষার মানের উন্নয়ন সূচিত করে না, নিটোল শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্যই হল অযোগ্যদের আটকে রাখা নয়, বরং যথাসম্ভব তাদের সংখ্যা কমিয়ে একদম নিম্নতম সীমায় নিয়ে যাওয়া।)

ইংরাজীতে এম. এ. পরীক্ষায় কয়েকটি উত্তরপত্র পুনর্বিবেচনার জন্য ইংরেজীর অধ্যাপক ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের (পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল) কাছে পাঠান হয়েছিল। তিনি ওদের নম্বর আরো কমিয়ে দেন। আশুতোষ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। ঘরে ঢুকতেই আশুতোষ তাঁকে বললেন, "হরেন, তুমি কি পরীক্ষক না কসাই? পুনর্বিচারের জন্য পাঠান হয় সেই সব খাতা যেগুলি একটু উদারভাবে দেখলে পরীক্ষার্থী পাশ হয়ে যায়। এদের পাশ করে দাও।"[৮]

পরীক্ষা ব্যবস্থার অকারণ কড়াকড়ির ব্যাপারে আশুতোষ বড় স্পর্শকাতর ছিলেন। কলে-কৌশলে পাশের হার কমান'র চিন্তা তিনি অমানবিক মনে করতেন। ঢাকা জগন্নাথ কলেজের সেক্রেটারী একবার কথা প্রসঙ্গে তাঁকে

---

৬. স্মৃতিচারণ—সতীশচন্দ্র ঘোষ (বাণী মন্দির, আশুতোষ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা, ১৩৭১)

৭. C. U. Convocation Address, 11.3.1911

৮. আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা—অনিল বিশ্বাস

বলেছিলেন—"পাশ না কমালে তো আর রক্ষা নেই।" আজীবন শিক্ষা প্রসারে উৎসর্গীকৃত প্রাণ আশুতোষ তাঁর জবাবে বলেছিলেন—"দশটা কলেজ করুন না। আমি চাই দেশে শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করে নি, বাংলাদেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।"[১]

প্রশ্নপত্র রচনায় আশুতোষের তদারকি

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, আশুতোষের ঐকান্তিক পাঠানুরক্তি এবং জ্ঞানের বিশালতা ছিল প্রবাদতুল্য। তাঁর এক জীবনীকারের ভাষায়—

> "The range of his reading, the extent of his studies and the variety of his cultural tastes and interests were greater than almost all other men of his generation."

রহস্য করে বলতে গেলে এই পেটুক পাঠকের অগাধ পাণ্ডিত্য এবং একই সঙ্গে ভিন্ন ধর্মী ও বিপরীত বিষয়ে অবাধ বিচরণ ক্ষমতার সুফল পেয়েছিল সেকালের ছাত্র সম্প্রদায়। প্রশ্নপত্রে ছাত্রদের সঙ্গে লুকোচুরি খেলা তিনি একদম পছন্দ করতেন না। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রায় সকল বিষয়ে প্রশ্নপত্র রচনায় তিনি তদারক করতেন. নির্দেশ দিতেন, সংশোধন করাতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের প্রথম অধ্যাপক পার্শী পণ্ডিত ডঃ আই, জে, এস, তারাপুরওয়ালা নিজে তার সাক্ষ্য দিয়েছেন :—

> "The thing that struck one most in Sir Asutosh was his vast intellect as well as his imagination. There were few subjects taught in this University about which he did not know more than an average professor, while in some subjects his knowledge was profound. He used to set papers along with others—for almost all the University examinations; he would also correct or modify the papers prepared by others in such diverse subjects as Mathematics, Physics, Economics, English, Sanskrit, Bengali, Pali, History, Anthropology, Philosophy etc. He would even adjudge thesis for the degree of Doctor of Science and Philosophy and P. R. Studentship—the blue ribbon of the University."

---

১. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন

চতুর্থ অধ্যায়

শিক্ষা ও গবেষণা

উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার স্থান—গবেষণা কি ও কেন: বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি অশুতোষের ব্যাখ্যা—গবেষণার সুযোগবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় অসম্পূর্ণ—শিক্ষাগুরুর অভিপ্রায় সম্পর্কে কবিগুরুর অভিমত—'বিশ্বভারতী' প্রতিষ্ঠার পেছনে আশুতোষের চিন্তাধারার প্রেরণা?—গবেষণা সম্পর্কে আশুতোষের নিজের কথা, মনের ব্যথা।

*　　*　　*　　*

উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার স্থান

আশুতোষের শিক্ষা প্রকল্পে উচ্চতম শিক্ষা ও গবেষণা অবিচ্ছেদ্য, অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এবং তাঁর মতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম দায়িত্ব ও কর্তব্য হল গবেষকদের গবেষণার সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও সুবিধা করে দেওয়া। অনুসন্ধিৎসু শিক্ষক ও আগ্রহী ছাত্রের সমন্বয়েই এই চিন্তার সার্থক রূপায়ন সম্ভব। আশুতোষ নিজেই ছাত্র জীবনে গবেষণায় অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন। কিন্তু নানা কারণে তাঁর আকাঙ্ক্ষা পুরোপুরি তৃপ্ত হয়নি বলে অন্তরে যথেষ্ট ক্ষোভ ছিল। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করেই ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তুলতে তিনি সচেষ্ট হলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে একই সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্র ও গবেষণা কেন্দ্ররূপে গড়ে তুলবেন এই ছিল তাঁর মনোগত বাসনা। স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজের এক্তিয়ার সম্পর্কে তাঁর মতো অভিজ্ঞ তো আর কেউ ছিলেন না। শিক্ষার ভিত তৈরী করে দেওয়া হল স্কুলের কাজ। আর "কলেজের কাজ হলো মানস-জগৎ তৈরী করা। সেখানে জাতির মনোজগতের অভিজ্ঞতা সসম্মানে রক্ষিত আছে এবং সে অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার বেড়েই চলেছে। এই জ্ঞান রাজ্যে তাঁরা সেই সব ছাত্রদের প্রবেশানুমতি দেন যারা এতে আগ্রহী। বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ থেকে আরো বড়ো। এখানে বিদ্যার্জন চলে শ্রেষ্ঠ ও উচ্চতম স্তরে। আর নানা বিদ্যার উদ্ভাবনও চলে এখানে। আজকাল বয়ে চলেছে বহু অ-পূর্বকল্পিত অপরীক্ষিত খাতে। যেখানে মানুষের বিষয়-আশয় চাইছে মানসিক বিশ্লেষণ, বিবেচনা, সমালোচনা, সূত্রায়ন

ও স্বার্থায়ন, সেখানেই এসেছে বিশ্ববিদ্যালয়।" (অনুবাদ—অনিল বিশ্বাস) মিঃ পুসী এ কথা বলেছেন ১৯৬০ খ্রীঃ তার ৫৩ বছর আগে ১৯০৭ খ্রীঃ প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই একথা আরো সুদৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে বলেছেন আশুতোষ—

"No University can rightly be regarded as fulfilling the purpose of its existence, unless it affords to the best of its students, adequate encouragement to carry on research; and unless it enables intellectual power wherever detected, to exercise its highest functions."[১]

[কোন বিশ্ববিদ্যালয় যদি তার সব চেয়ে মেধাবী ছাত্রদের গবেষণা কার্য চালাবার জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা এবং কোথাও দুর্লভ প্রতিভার সন্ধান পেলে তাকে পরিপূর্ণ স্ফূরণের ব্যবস্থা করতে না পারে, তবে সেই বিশ্ববিদ্যালয় তার অস্তিত্ব বজায় রাখার উদ্দেশ্য সাধন করছে বলা যায় না।]

গবেষণা কি ও কেন ঃ
বিরুদ্ধবাদীদের প্রতি আশুতোষের ব্যাখ্যা

অধ্যাপক ও ছাত্রদের গবেষণায় পর্যাপ্ত সুযোগ দেওয়া অপরিহার্য কর্তব্য বলে মনে করতেন আশুতোষ। ১৯০৮ খ্রীঃ দ্বিতীয় সমাবর্তনী ভাষণে আশুতোষ গবেষণা বিষয়ে তাঁর চিন্তাধারাকে আরো স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ করেন এবং বিরুদ্ধবাদীদের যুক্তি খণ্ডন করে বলেন—

"Another fundamental idea, to some extent inseparably associated with the position I have just indicated, is partially recognised for the first time, by the new Regulations, and when further developed, may have far-reaching consequences —I mean the recognition of the claims of research in every system of advance education. I am not unmindful that there is an unwholesome dread of the very term 'research' among some people who profess to be interested in education, but I sincerely trust there is none such in this assembly. It is rather late in the beginning of the twentieth Century to doubt or dispute the value and importance of research as a part of academic training and as necessary qualification for admission to the highest Degrees of the University."

১. Convocation Address, 1907.

তাঁর মতে গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার অপরিহার্য অঙ্গ। আর সেই গবেষণা বস্তুটা কি তারও এক সুন্দর সংজ্ঞা দিয়েছেন তিনি—

"Call it by what name you will, describe it if you please, as investigation, or as advancement of knowledge in the language of Bacon, or as creative action in the phrase of Emerson, or as constructive scholarship in the words of Munsterberg, there can be no possible controversy as to the importance of the conception."[২]

[অর্থাৎ নতুন আইনে উচ্চ শিক্ষার প্রত্যেক শাখায় গবেষণার স্থান স্বীকৃত হয়েছে। অবশ্য কিছু লোকের মনে 'গবেষণা' শব্দটির উচ্চারণেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রীর অচ্ছেদ্য অঙ্গ গবেষণার মূল্য ও গুরুত্ব সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ ও তর্ক করা প্রশ্নাতীত। অনুসন্ধান, জ্ঞানের অগ্রগতি, সৃজনশীল কাজ, গঠনমূলক পাণ্ডিত্য ইত্যাদি যে নামেই কথিত হোক না কেন, উচ্চতম শিক্ষায় গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।]

গবেষণার সুযোগবিহীন বিশ্ববিদ্যালয় অসম্পূর্ণ

উচ্চ শিক্ষায় গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে আশুতোষ একাধিক সমাবর্তন ভাষণে বলেছেন। কলা ও বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখায় পঠন ও গবেষণার সুযোগ যে বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই, তাকে অসম্পূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় আখ্যা দিয়ে তিনি বলেন—

"No University is now-a-days complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of the Sciences and Arts and unless it provides ample opportunities for research."[৩]

শুধু সমাবর্তন ভাষণে নয়, অপরাপর উপলক্ষেও আশুতোষ স্নাতকোত্তর গবেষণার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন—

"কলিকাতার প্রশিক্ষণী বিশ্ববিদ্যালয় হলো শিক্ষণ-সংস্থা—এর কাজ শুধুই স্নাতকোত্তর শিক্ষা দানই নয়, গবেষণার উন্নয়নে বিদ্যার সম্প্রসারণও। আমি

২. Convocation Address, 1908.

৩. Convocation Address, 1912.

সব সময়েই বলে এসেছি যে উচ্চতর প্রশিক্ষণ অকিঞ্চিতকর বলে গণ্য হবে যদি না এ বিতরিত হয় তাঁদের দিয়ে যাঁরা নিজেরাই ব্যাপৃত আছেন জ্ঞানের সীমাবর্ধনে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে স্নাতকোত্তর কর্মী নিয়োগকে মনে করতে হবে অনুসন্ধিৎসা ও গবেষণা বিস্তারের ছাত্রবৃত্তি।"[৪]

পোষ্ট-গ্রাজুয়েট শিক্ষার উপর তদন্ত করার জন্য গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে—

> "The claims which we venture to put forward for our university is that it is not merely a teaching university, but also a research university. We maintain a distinguished staff, not solely with a view to communicate existing knowledge to our young men but also to extend the boundaries of the domain of knowledge. We adopt as our motto ; "*Search for the truth is the noblest occupation of man ; its publication a paramount duty.*"[৫]

[বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে যে দাবি উত্থাপন করতে চাই তা হলো —এটি শুধুমাত্র শিক্ষা-কেন্দ্রিক বিশ্ববিদ্যালয় নয়, এটি এক গবেষণাধর্মী বিশ্ববিদ্যালয়ও বটে। আমরা আমাদের যুবশ্রেণীকে কেবলমাত্র সীমাবদ্ধ জ্ঞানদানের জন্যই একদল প্রতিভাসম্পন্ন শিক্ষক সমাবেশ করিনি—পরন্তু জ্ঞানের পরিধি বিস্তারই আমাদের লক্ষ্য।

'সত্যানুসন্ধান মানুষের মহত্তম অধিকার, তার প্রকাশ মানুষের প্রধান কর্তব্য'। —এটাকেই আমরা আমাদের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করতে চাই।]

শিক্ষাগুরুর অভিপ্রায় সম্পর্কে কবিগুরুর অভিমত

আশুতোষের পূর্বে 'research' বা গবেষণা সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনরকম ব্যবস্থা ছিল না। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণা ব্যতিরেকে বিশ্ববিদ্যালয় অসম্পূর্ণ, এ সম্পর্কে আশুতোষ দৃঢ় মত পোষণ করতেন। তিনি বলেছিলেন—"ছাত্রদের মধ্যে গবেষণা প্রবৃত্তি জাগিয়ে তোলা এবং এই বিষয়ে তাদের

---

৪. স্নাতকোত্তর শিক্ষা (Post-graduate Teaching, 1918-19)

৫. Post-graduate Teaching in the University of Calcutta, 1919-20

আনুকূল্য করার মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৃত সার্থকতা। আমাদের এই বিদ্যাপীঠ সকলরকম গবেষণার পথ প্রশস্ত করে দেবে—ইহাই আমার অভিপ্রায়।"[৬]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণাধর্মী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার ষোল আনা কৃতিত্ব আশুতোষের।

"বিশ্ববিদ্যালয়ের অগৌরব ঘোচাবার জন্য পরীক্ষার শেষ দেউড়ি পার করে দিয়ে আশুতোষ এখানে গবেষণা বিভাগ স্থাপন করেছিলেন। বিদ্যার ফসল শুধু জমানো নয়, বিদ্যার ফসল ফলানোর বিভাগ। আলোকের অভাব, অর্থের অভাব, স্বজন-পরিজনের প্রতিকূলতা কিছুই তিনি গ্রাহ্য করেন নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মশ্রদ্ধার প্রবর্তন হয়েছে এখানেই। তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ আপন করে দেখতে পেরেছিলেন। সেই অভিমানেই এই বিদ্যালয়কে তিনি সমস্ত দেশের আপন করে তোলবার ভরসা করতে পারলেন।"[৭]

শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী'র প্রতিষ্ঠা দিবসে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা এবং নিয়োজিত শিক্ষকদের কর্তব্য সম্পর্কে বলেছিলেন—

"বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা। বিদ্যার ক্ষেত্রে সেই সকল মনীষীদিগকে আহ্বান করিতে হইবে, যাহারা নিজের শক্তি ও সাধনা দ্বারা অনুসন্ধান, আবিষ্কার ও সৃষ্টির কার্যে নিবিষ্ট আছেন। তাহারা যেখানেই নিজের কাজে একত্র মিলিত হইবেন সেইখানে স্বভাবতই জ্ঞানের উৎস উৎসারিত হইবে। সেই উৎস-ধারার নির্ঝরিণী তটেই দেশের সত্য বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হইবে।"[৮]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এবং শিক্ষকমণ্ডলীর কর্তব্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার উপর আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা ও প্রচেষ্টার ছাপ সুস্পষ্ট। কারণ একই চিন্তায় আশুতোষ অনেক বছর অগ্রগামী।

---

৬. সমাবর্তন ভাষণ, ১৯০৮

৭. শিক্ষার বাহন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৮. বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩ বৈশাখ, ১৩২৬

গবেষণা সম্পর্কে আশুতোষের আরও কথা ঃ নিজের কথা, মনের ব্যথা

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণার উপর আশুতোষ কি গভীর গুরুত্ব আরোপ করতেন তা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণ ছাড়া অন্যত্রও প্রকাশ করেছেন। 'ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের বিকাশে, প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির লুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধারে, এর প্রাচীন ইতিহাসের পুনর্বিন্যাস সাধনে'র সাধু উদ্দেশ্যে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মহামতি স্যার উইলিয়ম জোন্স কর্তৃক স্থাপিত এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতিরূপে ১৯০৯ সালে তিনি ভাষণ প্রসঙ্গে গবেষণার প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করে বলেন —

"The objects of this Society is to extend the bounds of knowledge in various departments of intellectual activity and I hope that the younger members of our Society will feel convinced that the field of research they have just entered is boundless, and that the toiler is likely to be rewarded in the future by as rich and varied a harvest as ever fell to the lot of our predecessors."

জ্ঞানের রাজ্যে স্থিতাবস্থায় আস্থাহীন আশুতোষ গবেষকদের সতর্ক করে বলেছেন—

"Let us remember that arrested development forebodes decay. Let us, therefore, draw within our ranks all devoted investigators of Man and Nature in this continent and with their co-operation, let us march on in the path of progress."

গবেষণার প্রতি আশুতোষের এই যে প্রবল অনুরাগ তার সূত্রানুসন্ধান করে দেখা গেছে যে, তাঁর নিজের জীবনের অতৃপ্ত বাসনাই তাঁকে বাংলার মেধাবী ছাত্রদের সামনে গবেষণার দুয়ার খুলে দেবার প্রেরণা জুগিয়েছে। কে না জানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কেরানী তৈরীর কারখানা। আশুতোষ তাকে রূপান্তরিত করলেন জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চা ও অনুশীলনের সাধনক্ষেত্রে। যে অদম্য উৎসাহ, সংগঠনশক্তি এবং দুর্দমনীয় জেদের বশে তিনি এই অসাধ্য সাধন করেছেন, তার গোপন চাবিকাঠিটির কথা তিনি কর্মজীবনের প্রায় শেষ লগ্নে প্রকাশ করে গেছেন। ১৯২০ সনের মার্চমাসে আশুতোষ ভারত সরকার কর্তৃক কলিকাতা হাই কোর্টের 'অ্যাকটিং' প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত হন।

২৭শে মার্চ (১৯২০), তারিখের সিনেটে তৎকালীন উপাচার্য স্যার নীলরতন সরকার এই দুর্লভ সম্মান লাভের জন্য অশুতোষকে সিনেটের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে বলেন—

"**The Hon'ble the Vice-Chancellor** : Before proceeding with the business of the day, I desire to refer to a happy event, at which we the members of this University, have reasons to be specially gratified. One of our distinguished members has just been summoned by Government to occupy a position which is one of the greatest trust and responsibility. It is befitting, therefore, that I should take this opportunity to offer on behalf of the Senate and of myself our warmest congratulations to the receipient of this high honour. We most heartily rejoice that Sir Asutosh Mookerjee has been appointed to preside over the High Court of Calcutta, of which he has all these years been so brilliant an ornament. It is our pride and pleasure that one who has so intimately identified himself with the affairs of this University from his early manhood, should now be called upon to fill the highest judicial appointment in the land. Whatever position Sir Asutosh has filled, he has adorned by his transcendent abilites and brilliant attainments. In him the University has one of its most gifted students. In his remarkable career, in various spheres of life in which he has worked, he has by his rare powers of organisation, by his unwearied energy and wonderful devotion to duty, and by his unique idealism always supported by a resourceful practical common sense, and above all by his strong personality spread far and wide the fame of this University no less than that of this Presidency and this country. As a Syndic and Fellow, as an Examiner, as Vice-Chancellor, as President of the Post Graduate Councils, of the Faculties of Arts and Law, and of various Boards of Studies, in whatever capacity Sir Asutosh has worked, he has advanced the cause of education as no other person in this generation has done. We, members of this University, have, therefore, special reasons to congratulate Sir Asutosh on the signal honour that has been conferred on our illustrous colleague. He has served the University with his whole

heart, and the University congratulates him to-day with her whole heart.

With these words I move the following resolution :—

"That the Senate of the Calcutta University do offer its warmest congratulations to the Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee, Kt., C.S.I., on his appointment as Acting Chief Justice of Bengal, and express its pleasure and pride that one who has rendered the most conspicuous service to the cause of University education in the country should be selected to fill the highest judicial appointment in the land."

এই প্রস্তাব সমর্থন করে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আশুতোষের অনুরাগ ও অবদানের কথা অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করে অকৃত্রিম আন্তরিকতার সঙ্গে বক্তব্য রাখেন অধ্যাপক এইচ স্টিফেন, অধ্যক্ষ জে. আর. ব্যানার্জী, ডঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, অধ্যক্ষ গিরীশচন্দ্র বসু প্রমুখ সিনেট সদস্যবৃন্দ। সতীর্থদের এই আন্তরিক অভিনন্দনে অভিভূত আশুতোষ জবাবী ভাষণ দেন। তাতেই তিনি কি কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন এবং কেনই বা তিনি গবেষণার উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দান করতেন সেই গোপন রহস্যটি প্রকাশ করেন—

The Hon'ble Sir Asutosh Mookerjee : Mr. Vice-Chancellor and my colleagues in the Senate, you will believe me when I tell you that I was not prepared for this reception, and you will not misunderstand me if I am unable by reason of lack of suitable words, to give full expression to my feelings of deep gratitude to all of you. Nothing is dearer to me, nothing has been dearer to me, than my University. I began life as a research student in Mathematics when research was practically unknown in this country, and I hoped that the mission of my life was to be a Research Professor in my University. Mr Justice Banerjee, who was then Vice-Chancellor of this University, made a desperate attempt to create a chair for me, but such were the times that he failed to collect even such sum as would give a modest income of Rs.4,000 a year which was all that he and I thought would be sufficient to maintain me as a Research Professor. The consequence was

that I drifted into Law, but I made a determination at the time that, Heaven willing I would devote myself to the service of the University so that in the next generation any aspiring scholars in my position might not drift into Law and might have adequate opprotunities to devote themselves to the cause of Letters and Seience. It has been given to me through the inspiring help of many distinguished countrymen of mine, foremost amongst them men like Sir Rashbehary Ghose, Sir Taraknath Palit, The Maharaja of Cossimbazar, and the Maharajah of Darbhanga, to lay the foundations of a Teaching University in Calcutta. I do not now regret that I drifted into Law. If I had not taken to Law and attained the position and influence which carry weight in the world , it might never have been given to me to do for my University what I have been able to achieve. Let me add that to me it is a source of intense satisfacticn that I enjoy the confidence of you all as my colleagues and of my educated countrymen outside the walls of this House.

The resolution was carried, all present standing.

সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থিত দুই কর্মক্ষেত্রেই আশুতোষ অনন্যসুলভ প্রতিভা ও সংগঠন শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। আশুতোষের এই অবিশ্রান্ত কর্মপ্রতিভাকেই রবীন্দ্রনাথ 'magic wand' বা যাদুদণ্ড আখ্যা দিয়েছেন ; কারণ তিনি যে কাজে হাত দিয়েছেন তাকেই সাফল্যের স্বর্ণচূড়ায় উন্নীত করেছেন।

পঞ্চম অধ্যায়

পরীক্ষার আলয়কে বিদ্যার আলয়ে রূপান্তর

কেন্দ্রীয় আইন কলেজ স্থাপন—হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাস তৈরী—দারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবন : বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী ও মুদ্রণালয় প্রতিষ্ঠা—স্নাতকোত্তর শিক্ষার সূচনা—"চেয়ার" প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত—তারকনাথ পালিতের দান—রাসবিহারী ঘোষের দান—আশুতোষের বিদায় লগ্ন : বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপন—আশুতোষের বিদায় ভাষণ—কলা ও বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা—কলেজগুলির পক্ষ থেকে দৃঢ় প্রতিরোধ—খয়রার রাজকুমার ও রাজমাতার দান—বিভিন্ন 'চেয়ার' ও 'চেয়ারম্যান' (অধ্যাপক)।

*　　*　　*　　*

আশুতোষের শিক্ষা প্রচেষ্টা

আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার বিভিন্ন দিক নিয়ে মোটামুটি আলোচনা করা গেল। এবার তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টার অর্থাৎ সেই চিন্তাকে কাজে রূপ দানের কথা। অবশ্য শিক্ষাচিন্তা আলোচনা কালেই শিক্ষা প্রচেষ্টার কথা প্রসঙ্গতঃ আংশিক আলোচিত হয়ে গেছে। যেহেতু আশুতোষ অলস কল্পনাবিলাসী ছিলেন না, ছিলেন কঠিন বাস্তববাদী, সুতরাং তাঁর চিন্তা ও প্রচেষ্টা সম্ভাব্য ক্ষেত্রে হাত ধরাধরি করেই এগিয়েছে।*

১৯১৪ খ্রীঃ ৩০ মার্চ আশুতোষ উপাচার্য পদ থেকে প্রথম বারের মতো অবসর গ্রহণ করেন। বিদায়ের প্রাক্কালে সিনেট এক বৈঠকে আশুতোষের সুমহান কীর্তিকলাপের উল্লেখ করে বলেছিলেন—

"তাঁর কাজের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো—কেন্দ্রীয় আইন কলেজ স্থাপন, দারভাঙ্গা গ্রন্থাগার ও হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাসের বাড়ি তৈরী, বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষণের বিশদ প্রণালী প্রবর্তন, বিশ্ববিদ্যালয় আইন

* "His mind was open to all ideas from whatever source they come.... for him thought meant not only contemplation but action."
—Mr. P. G. Hartog, Member, Sadler Commission.

কলেজের সম্প্রসারণ, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা, উন্নত ছাত্র ও অধ্যাপকদের গবেষণার ব্যবস্থা ও ভারতীয় ভাষার উন্নয়ন।"

আশুতোষের শিক্ষা প্রচেষ্টার মহোত্তম নিদর্শন কয়টি উপরের কয় ছত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। তিনি কেমন করে এসকল প্রকল্প কার্যে রূপায়িত করেছেন, তা থেকে তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টার স্বরূপ ও প্রয়োগ কৌশল অনুধাবন করা যাবে।

কেন্দ্রীয় আইন কলেজ স্থাপন

১৮৫৪ খ্রীঃ ডেসপ্যাসে আইন পঠন-পাঠন সম্পর্কে বলা হয়েছিল—

"It will be advisable to establish in connection with the Universities, Professorships in various branches of learning and the most important of those branches is law."[১]

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২২ বছর আগে চিকিৎসা বিদ্যা এবং এক বছর আগে ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা শিক্ষার জন্য কলেজ স্থাপিত হয়। কিন্তু উক্ত ডেসপ্যাসে পরিষ্কারভাবে আইন শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ থাকা সত্বেও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অর্ধ শতাব্দী কাল পরেও আইন পড়াবার কোন ব্যবস্থা হয় নি। আশুতোষ উপাচার্য পদে আসীন হয়েই এ সম্পর্কে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং ১৯০৮ খ্রীঃ বিষয়টি বিবেচনার জন্য সিণ্ডিকেটে নিম্নোক্ত 'মিনিট' পেশ করেন—

"The branch of our education system which stands in the need of the most urgent and radical reform is that concerned with teaching of law of our degree examinations. It is a noteworthy fact that we have not got a single College devoted entirely to the study of Law as we have in the cases of Medicine and Engineering."[২]

আশুতোষের এই 'মিনিট' ৪ঠা জুলাই ১৯০৮ সিণ্ডিকেটে যথারীতি বিবেচনার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে—

"The Syndicate recommend to the Senate that a University Law College be established and the Syndicate be authorised to appoint a provisional Committee to organise it."[৩]

---

১. Wood's Education Despatch, 1854

২, ৩. C. U. Syndicate Minutes, July, 4, 1908

১৪ই জুলাই ১৯০৮ তারিখে Faculty of Law এই 'মিনিট' বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নিলেন—

"That the Faculty to record its opinion that for the promotion of legal education of students for degrees in law, it is desirable to establish a University Law College to serve as a model, but not so as to create a monopoly either general or local."[৪]

অবশেষে এই সুপারিশ বিবেচনার জন্য ২১ জুলাই, ১৯০৮, সিনেট সভায় উত্থাপিত হল। আশুতোষ স্বয়ং নিম্নোক্ত প্রস্তাব সিনেটের অনুমোদনের জন্য পেশ করেন—

"(*a*) That the University Law College be established and that the Syndicate be authorised to appoint a provisional Committee to organise it. (*b*) That with a view to avoid misconception, it be recorded that in establishing a University Law College the University does not wish to deviate from the principle enunciated in the resolution of the Government of India dated the 24th October, 1902 ; the College is to be established for the promotion of legal education of students for degrees in law and to serve a sa model college and not with a view to create a monopoly either general or local".[৫]

স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের এক শক্তিশালী গোষ্ঠী এই প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। তাঁদের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন করে অবশেষে প্রস্তাব গৃহীত হল। এই প্রস্তাবের উপর আলোচনাকালেই আশুতোষ আইন শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীপ্রসূত এই ঐতিহাসিক উক্তি করেছিলেন—

"*Law is neither a trade nor a solemn jugglery but a living science in the proper sense of the word.*"

(আইন ব্যবসাও নয়, যাদুবিদ্যাও নয় ; বরং এ এক জীবন্ত বিজ্ঞান।) ১৯০৯ খ্রীঃ ৫ই জুলাই থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজ যাত্রা শুরু করল। কিছুদিনের মধ্যেই আইনবিষয়ক এক মূল্যবান গ্রন্থাগারও তার সঙ্গে সংযোজিত হল।

---

৪. Minutes of the Faculty of Law, 14. 7. 1908

৫. C. U. Senate Minutes, 21. 7. 1908

হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাস তৈরী

১৯০৪ খ্রীঃ বিশ্ববিদ্যালয় আইনে নির্দেশ আছে যে কলেজগুলিকে ছাত্রাবাসের উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় স্থাপিত প্রথম কলেজ হল আইন কলেজ। সুতরাং আইনতঃ বিশ্ববিদ্যালয়ও কলেজ ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। আইন কলেজ স্থাপনের অব্যবহিত পরেই আশুতোষ এদিকে মনোযোগ দিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ যখন আচার্য পদে আসীন হলেন তিনিও এবিষয়ে উদ্যোগী হলেন। সরকারী সাহায্যে হার্ডিঞ্জ ছাত্রাবাস তৈরী হল এবং গ্রন্থাগারের জন্য বই ও সাজসরঞ্জামের জন্যও আর্থিক সাহায্য পাওয়া গেল।

দারভাঙ্গা লাইব্রেরী ভবন ঃ বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী

আশুতোষ কর্মভার গ্রহণের আগে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার ছিল না। ১৯০৮ খ্রীঃ সিণ্ডিকেট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ৫০০ টাকা মঞ্জুর করে।

এদিকে বেসরকারী সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্প্রসারণের কাজও শুরু হল আশুতোষের আমলেই। দারভাঙ্গার মহারাজা রামেশ্বর সিং আড়াই লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। সে সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব তহবিল ও সরকারের অনুদান মিলিয়ে সেই অর্থে ১৯১২খ্রীঃ তৈরী হল "দারভাঙ্গা লাইব্রেরী বিলডিং"। বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আইন কলেজ ও রেজিষ্ট্রারের অফিসের জন্য স্থান নির্দিষ্ট হল ঐ ভবনে।

বিশ্ববিদ্যালয় মুদ্রণালয়

প্রতিষ্ঠা বর্ষ থেকে ৫০ বৎসর অর্থাৎ ১৯০৮ খ্রীঃ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব কোন মুদ্রণ বিভাগ ছিল না। আশুতোষ উপাচার্য পদ গ্রহণের অত্যল্প কালমধ্যে—শিক্ষা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম এমন বিপুলাকারে বেড়ে গেল যে, বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব ছাপাখানার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল। তখন রেজিষ্ট্রার মহোদয় সিণ্ডিকেটের সামনে প্রস্তাব পেশ করেন—

335. The Registrar laid before the Syndicate a rough estimate for a Press of the University.

RESOLVED—That the Registrar be authorised to take the matter in hand at once and to make the necessary arrangement. (23.12.1908)

অনতিকাল মধ্যে রেজিষ্ট্রার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত কার্যে রূপদান করে সিণ্ডিকেটকে জানালেন—

1344. The Registrar laid before the Syndicate the following statement of the staff appointed for the new University Press.

* * *

RESOLVED—That the staff be sanctioned (12. 6. 1909)

এবং—

1790. On a reference from the Registrar it was ordered that a Machine Press be bought for the University Press. (17. 7. 1909)

লোক নিযুক্ত হল, মেসিন কেনা হল এবং পুরনো সিনেট হল ও দারভাঙ্গা বিল্ডিং-এর মাঝখানে টিনের শেডের নিচে ছাপাখানার কাজ শুরু হল। কালক্রমে বিশ্ববিদ্যালয় ছাপাখানা কলিকাতার অন্যতম বৃহৎ ছাপাখানা বলে গণ্য হয় এবং প্রকাশনা বিভাগ ভারতের শ্রেষ্ঠ পাঠ্য ও রেফারেন্স পুস্তক প্রকাশন সংস্থা বলে মর্যাদা লাভ করে। কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বছর এভাবে চলল। তারপর—

"On account of enormous increase of work in the Press, the accommodation available in the structure was found insufficient and on the recommendation of the Syndicate a sum of Rs. 1,40,000 was sanctioned by the Senate on the 4th June, 1938, for erecting a Press Building at 48, Hazra Road, which being a portion of the Palit Estate, the Governing Body of the Sir Taraknath Palit Trusts resolved that the land might be taken on a lease for 90 years on a rent of Rs. 60 per month or the land might be purchased by the University for the purpose. The construction of the Press Building on the land was completed in the early part of the year 1940 and was occupied by the Press in July, 1940." (C. U. Calender)

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার সূচনা

আশুতোষ কর্মভার গ্রহণের এক বছরের মধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষাগার থেকে শিক্ষাগারে পরিণত করার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। তাঁর মহৎ প্রচেষ্টা চারটি ধাপ অতিক্রম করে পূর্ণ পরিণতির দিকে অগ্রসর হতে থাকে—

"In the first stage, he attempted to give instruction to M.A. students through University lecturers under the Universities Act of 1904. These were professors in affiliated Colleges. With them were associated readers who were all scholars of both eminence and distinction so that contact with them by advanced students might stimulate their original thinking. In the second stage, he attempted to establish University Chairs held by distinguished scholars. In the third stage, regular whole-time University professors, readers and lecturers were appointed. With the magnificent gifts of Taraknath Palit and Rashbehary Ghose, Asutosh Mookerjee founded the University College of Science and Technology. In the fourth stage, after a good deal of consideration and opposition, post-graduate study and research in Calcutta was centralised in the hands of the University, and the post-graduate departments of Arts and Science came into existence."*

বিশ্ববিদ্যালয় 'চেয়ার' প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত

১৯০৭ খ্রীঃ আশুতোষ কয়েকটি বিষয়ে 'বিশ্ববিদ্যালয় লেকচারার' নিযুক্ত করেন। ১৯০৮ খ্রীঃ ভারতবর্ষে প্রথম সরকারী অর্থানুকূল্যে অর্থনীতিতে "Minto Professorship" নামে "Chair of Economics" স্থাপিত করেন। আশুতোষের আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল কলিকাতাকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে সারা ভারতের রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবীদের রাজধানীতে পরিণত করা। কিন্তু—

"In 1911, with the transfer of Capital of India from Calcutta to Delhi, melted away the dreams of Asutosh Mookerjee

---

*. Hundred Years of the University of Calcutta.

to make Calcutta the political and intellectual Capital of India."[৭]

রাজধানী স্থানান্তর ঃ মুকুটহীন বঙ্গদেশ

বঙ্গ ভঙ্গ রদের আনন্দে উদ্বেল বাঙালী সেদিন কলিকাতা থেকে ভারতবর্ষের রাজধানী স্থানান্তরের তাৎপর্য অনুধাবনে সক্ষম হয় নি। কিন্তু সেদিন থেকেই যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বাঙালীর অবনমন শুরু হয়েছে তা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন আশুতোষের নজর এড়ায় নি। তিনি এই সিদ্ধান্তকে বাঙালী জাতি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে এক দুর্দৈব বলে মনে করেছেন এবং ভারাক্রান্ত মনে সমাবর্তন ভাষণে মনোবেদনা ব্যক্ত করেছেন—

"Bengal has been for more than a century the leading province of India ; Calcutta has been the Capital in name, no less than in fact of a great empire and now these high distinctions are all at once passing away from us. Calcutta, Bengal, are discrowned and cannot help feeling desolate. The gloom of grevious bereavement lies heavy in our minds ; we feel like men who have 'fallen from their high estate.' . . . ."[৮]

যা হোক, সম্রাট পঞ্চম জর্জের 'দিল্লীর দরবার' উপলক্ষে ভারতে আগমনের সুযোগ নিয়ে তিনি বড়লাট ও আচার্য লর্ড হার্ডিঞ্জকে ধরে দুটি 'অধ্যাপক পদ' প্রতিষ্ঠা মঞ্জুর করে নিলেন। তার কিছুদিন পরেই আশুতোষ "Ancient Indian History & Culture"—এ আর একটি 'চেয়ার' স্থাপন করেন। এভাবে—

"By the year 1912, for the benefit of post-graduate students, arrangements were made for the delivery of regular University lecturers and for post-graduate study and research in English, Sanskrit, Pali, Arabic, Persian, Mental and Moral Philosophy, History, Economics and Mathematics."[৯]

---

৭. Hundred Years of the University of Calcutta.

৮. Calcutta University Convocation Address, 1912.

৯. Hundred Years of the University of Calcutta

দেখা যাচ্ছে তাঁর কার্যকালের প্রথম ছয় বছরের মধ্যেই আশুতোষ Arts Faculty-র অন্তর্গত নয়টি মুখ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা করতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্র আশুতোষের মন তাতে ভরল না। বর্তমান যুগ ও জীবনের চাহিদা মেটাতে বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার কোন ব্যবস্থাই তখনো করা যায়নি। কারণ তার জন্য যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তা যোগাবে কে? সরকার তো আইন পাস করেই খালাস; কিন্তু আইনকে কার্যে রূপায়ণের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনও উদ্যোগ আয়োজন দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাবেই বা কেন? বিশেষতঃ বঙ্গ-ভঙ্গ উপলক্ষে শিক্ষিত সম্প্রদায় যে ভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছেন, তার ফলে সরকার শিক্ষা সম্প্রসারণ ব্যাপারে একেবারেই নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছে। আশুতোষ নিজেও হতাশা ও মর্মপীড়া অনুভব করছেন। তাঁর মর্মবেদনা প্রকাশ পেল সমাবর্তন ভাষণে; বিশ্ববিদ্যালয়ের অসম্পূর্ণতা দূর করতে পারছেন না বলে—

> "No University is nowadays complete unless it is equipped with teaching faculties in all the more important branches of the Sciences and Arts and unless it provides ample opportunities for research."[১০]

অর্থাগমের সূচনা : স্যার তারকনাথ পালিতের সর্বস্ব দান

ঠিক এই সময়ে বিনা মেঘে বারিপাতের মতো অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে কয়েক লক্ষ টাকা দানের প্রস্তাব এল। স্বনামধন্য আইনজীবী স্যার তারকনাথ পালিত উক্ত সমাবর্তন ভাষণের কয়েক মাসের মধ্যে ১৯১২ সালের জুন মাসে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের হাতে সাত লক্ষ টাকা (নগদ সাড়ে চার লাখ এবং বসত বাড়ি সমেত বালীগঞ্জ ও রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজের জমি মিলে আড়াই লাখ) অর্পণ করেন। চার মাস বাদেই স্যার তারকনাথ আরো সাত লক্ষ টাকা দান করলেন। এই অর্থ থেকে আহৃত আয়ে পদার্থবিদ্যা ও রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপনা ও গবেষণার জন্য দুইটি অধ্যাপক পদ সৃষ্টি সমেত যে মহৎ উদ্দেশ্যের কথা দানপত্রে উল্লেখ করা ছিল তা উদ্ধৃতিযোগ্য—

---

১০. Convocation Address, 1912

..the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advance of science, pure and applied, amongst his countrymen by and through indigenous agency. Such chairs shall always be filled by Indians (persons born of Indian parents as contradistinguished from persons who are called statutory natives of India) to be nominated by a Governing Body."[১১]

অত্যন্ত দুশ্চিন্তার সময়ে তারকনাথের এই অযাচিত দানে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতায় অভিভূত আশুতোষ পরবর্তী সমাবর্তন ভাষণে সর্বসমক্ষে এই মহান দাতার গুণকীর্তন করে বলেছিলেন—

"To the benefactor we cannot indeed be grateful enough. Sir Taraknath Palit stands before us in a double character,—in the first place, as an eminent and learned lawyer, and in the second place as a great benefactor of our University on a scale hitherto unparalleled......He has given not a fraction or part only of his wealth—he has freely given us the whole."

তারকনাথের ঐতিহাসিক চিঠি ও দানপত্র

বঙ্গদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম পথিকৃৎ দানবীর তারকনাথ পালিত দানপত্র তৈরী করে আশুতোষের কাছে প্রেরণ করেন। ১৫ জুন, ১৯১২ সে দানপত্র সিণ্ডিকেটে পেশ করা হয় অনুমোদনের জন্য। বিজ্ঞান শিক্ষার ইতিহাসে অসাধারণ ঐতিহাসিক মূল্য বিবেচনায় আশুতোষের কাছে লিখিত তারকনাথের পত্রখানি এবং দানপত্রের মুখবন্ধটুকু নিচে উদ্ধৃত করা গেল—

2349. Read a letter from Mr. T. Palit, Bar-at-Law, forwarding a draft of the Deed of Endowment he proposes to execute in favour of the Calcutta University, which ran as follows :—

১১. C. U. Calendar, 1956

35, Baliganj Circular Road,
14th June, 1912.

To

THE VICE-CHANCELLOR,
Calcutta University.

DEAR MR. VICE-CHANCELLOR,

I enclose herewith draft of the Deed of Endowment which I propose to execute in favour of the University.

Regard being had to my health, it is very desirable that the Deed should be executed without any delay, and, if possible, to-morrow evening.

Yours truly,
T. PALIT.

This Indenture made this the 15th day of June in the year of Christ one thousand nine hundred and twelve **Between Taraknath Palit** of No. 35, Baliganj Circular Road within the Municipal limits of the town of Calcutta (son of Kalikinkur Palit deceased) by caste Kayastha Barrister-at-Law (hereinafter called the Founder) of the **One Part** And the **University of Calcutta** incorporated by and under Act II of 1857 (hereinafter called the said University) of the **Other Part.** **Whereas** the Founder is seized and possessed of or otherwise well and sufficiently entitled as and for an absolute and indefeasible estate of inheritance in fee simple in possession or an estate equivalent thereto free from encumbrances to the messuage land hereditaments and premises No. 92 Upper Circular Road fully described in the first Schedule hereto **and whereas** by an **Indenture** bearing date the sixth day of September one thousand nine hundred and two and registered **at** the Calcutta Registry Office in Book I Vol. 62, pages 57 to 74 being No. 1864 for 1906. ....

স্যার রাসবিহারী ঘোষের দানযজ্ঞ

কিন্তু একটি পরিপূর্ণ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ বিজ্ঞান কলেজ ও গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনে তারকনাথ প্রদত্ত অর্থই তো যথেষ্ট নয়; আরো অর্থের প্রয়োজন। কথায়

বলে, 'যে খায় চিনি, জোগায় চিন্তামণি'। তারকনাথের দানপত্র সম্পাদনের কয়েক মাসের মধ্যে আশুতোষ সুপ্রসিদ্ধ আইনজীবী স্যার রাসবিহারী ঘোষের কাছ থেকে নিম্নোক্ত পত্র পেলেন—

46, Theatre Road,
Calcutta
8th August, 1913

My Dear Sir Asutosh,

For some time past, it has been my desire to place at the disposal of my University, a substantial sum for the promotion of Scientific and Technical Education and for the Cultivation and advancement of Science, Pure and Applied, amongst my countrymen by and through indigenous agency. I have now decided to make over to the University a sum of ten lakhs of Rupees in furtheronce of the University College of Science projected by you with sanction of the Senate etc. etc.

Believe me,
Yours Sincerely,
Rashbehary Ghose.

স্যার রাসবিহারী ঘোষের থেকে এই বিপুল অর্থ পেয়ে আশুতোষ আনন্দে আত্মহারা হলেন। তিনি সিনেট সভায় দাঁড়িয়ে মুক্তকণ্ঠে রাসবিহারী ঘোষের বদান্যতার উল্লেখ করে বললেন—

"I ask you for a moment to consider the munificent gift of Dr. Rashbehary Ghose not merely in relation of the University College of Science projected by you, but also in relation to the wider and more comprehensive scheme for the development of this University into a true teaching University, which it has been the aim of the Senate to accomplish during the last five years."

এই অর্থ থেকে অর্জিত আয়ে চারটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করার শর্ত ছিল। বিষয় চারটি হল—(১) ফলিত গণিত, (২) পদার্থ বিদ্যা, (৩)

রসায়নশাস্ত্র এবং (৪) উদ্ভিদ্‌বিদ্যা। প্রত্যেক অধ্যাপকের কর্তব্যকর্মও দানপত্রে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল—

"(*a*) To carry on original research in his special subject with a view to extend the bounds of knowledge and to improve by the application of his researches the arts, industries, manufactures and agriculture of this country. (*b*) To stimulate and guide research by advanced students and generally to assist them in post-graduate work so as to foster the growth of real learning amongst our own men."

পূর্বোক্ত দশ লাখ টাকা দানের কিছুকাল পরেই স্যার রাসবিহারী তাঁর দানপাত্র উজাড় করে পুনরায় এগার লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে ঢেলে দিলেন। শুধু তাই নয়—যেমন কথায় বলে বার বার তিন বার—স্যার রাসবিহারীও তেমনি তৃতীয় দফায় আরো দু-লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকার দানপত্র লিখে দিলেন। সর্বসাকুল্যে তাঁর দানের পরিমাণ দাঁড়াল তেইশ লাখ তিরানব্বই হাজার টাকা। দানবীর রাসবিহারীর এই রাজকীয় দানের কথা সিনেট সভায় আবেগজড়িত কণ্ঠে উল্লেখ করে আশুতোষ তাঁর 'মাষ্টারমশাই'র গুণগান করে বলেছিলেন—

"Logic and eloquence are equally superficial to justify the acceptance of a truly munificent offer. It would be inappropriate in the highest degree if, I his pupil, were to use language with regard to my revered Master, which might bear the semblance even of patronising commendation of his great achievement as the foremost benefactor of our University.... To us all, it is a source of infinite joy that by the liberality of Sir Rashbehary Ghose we are placed in a position to take one decisive step forward towards the accomplishment of what has been our avowed purpose for many years past, viz., the establishment of a University College of Science and Technology." (Senate, 16.8.13)

প্রদত্ত অর্থ ব্যবহারের একটা মোটামুটি ছক তৈরী করে দিয়ে রাসবিহারী তাঁর উপযুক্ত ছাত্রের হাতেই পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপায়ণের ভার দিয়ে লিখলেন—

"This is an outline of the scheme I have in mind, and I trust you will exert yourself to the utmost so that my long cherished

ambition to promote scientific and technical education amongst my countrymen may be speedily realised."

স্যার রাসবিহারী ঘোষ প্রদত্ত প্রথম দশ লাখ টাকার আয় থেকে পূর্বোক্ত চারটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ বা "চেয়ার" প্রতিষ্ঠা ছাড়াও আটটি ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা ছিল। বৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রদের দুই জন করে প্রত্যেক অধ্যাপকের সঙ্গে যুক্ত থেকে তাঁর তত্ত্বাবধানে তত্ত্বানুসন্ধান করবে কিংবা মৌলিক গবেষণাকর্মে তাঁকে সহায়তা করবে। এর ফলে প্রতিভাবান ও প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন ছাত্রদের ভবিষ্যৎ জীবনে নিজ-নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম হয়। অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অধ্যাপক মেঘনাথ সাহা, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি, অধ্যাপক জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র প্রমুখ খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা "পালিত" অথবা "ঘোষ" অধ্যাপকদের অধীনেই 'সহকারী' হিসেবে রিসার্চ অ্যাসিস্টেন্টরূপে কাজ করেছিলেন।

১৯১৯ সালের ২৭ ডিসেম্বর রাসবিহারী দ্বিতীয় দফায় যে ১১ লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা দান করেন তা সম্পূর্ণভাবে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নে ফলিত পদার্থবিদ্যা ও ফলিত রসায়ন শাস্ত্রের দুইটি "চেয়ার" প্রতিষ্ঠা এবং প্রত্যেক অধ্যাপকের সঙ্গে দুই জন করে রিসার্চ স্কলার নিযুক্তির জন্য ব্যয় করার শর্ত ছিল।

আর ২৩ মে ১৯২০ তারিখের শেষ দানপত্রে প্রদত্ত দুই লাখ ৫০ হাজার টাকা দ্বারা ভারতের বাইরে শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান এবং গবেষণার জন্য তিনটি ট্র্যাভেলিং ফেলোশিপ বা শিক্ষামূলক ভ্রমণ বৃত্তির ব্যবস্থা ছিল।

তারকনাথের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে বিজ্ঞান কলেজের কাজ শুরু করার পাকাপাকি সিদ্ধান্ত নেওয়া হল এবং সে কাজে পরিপূরক অর্থ সাহায্যের জন্য ভারত সরকারের কাছে আবেদন জানান হয়।

কিন্তু ইতিমধ্যে আশুতোষ সম্পর্কে সরকারের মোহচ্যুতি ঘটে গেছে। সরকারের তখন ছুঁচো গেলার অবস্থা। আশুতোষ তাঁদের কোন প্রত্যাশাই পূর্ণ করেন নি। সরকারি জজিয়তিকার্যে নিযুক্ত আশুতোষ সরকারের মনোরঞ্জনার্থে শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি রূপায়ণে কোন কার্যকরী ব্যবস্থা তো নিলেনই না, বরং সরকারের আশা ও দেশবাসীর আশঙ্কা নস্যাৎ করে দিয়ে উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণার দরজা দেশবাসীর সামনে উন্মুক্ত করে দিলেন। উপরন্তু স্বদেশী আন্দোলনে সরকারবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত বিভিন্ন স্কুল

কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের শাস্তি না দিয়ে তাদের প্রতি নমনীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করায় এবং সরকারের কাছে রাজনৈতিক কারণে অবাঞ্ছিত কোন কোন ব্যক্তিকে অধ্যাপনা কাজে নিযুক্ত করায় সরকার বিশ্ববিদ্যালয় তথা আশুতোষের উপর হাড়ে হাড়ে চটেছিল। সুতরাং বিশ্ববিদ্যালয়কে অর্থ সাহায্য করা তো দূরের কথা, বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠার সূচনালগ্নেই আশুতোষকে উপাচার্যপদ থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্ত হল। অথচ সেই সময়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর অবস্থিতি ছিল সর্বাধিক প্রয়োজন।

আশুতোষের বিদায় লগ্ন : বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিস্থাপন

তাঁর কার্যকাল শেষ হবার মাত্র চার দিন আগে ২৭ মার্চ ১৯১৪ সালে বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিস্থাপন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তৃতায় আশুতোষ স্নাতকোত্তর বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ব্যাপারে সরকারি ঔদাসীন্য সম্পর্কে তাঁর ক্ষোভ চাপা রাখতে পারেননি—

> "Considerable disappointment was in store for the promoters of the scheme. The Government of India did not respond to the request of the University for liberal financial assistance to supplement the gift of Sir Taraknath Palit."

আশুতোষের জায়গায় স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। তিনিই প্রথম বে-সরকারি উপাচার্য। এই পরিবর্তনে স্নাতকোত্তর বিভাগ গঠনে কোন বাধাই সৃষ্টি হল না। দেবপ্রসাদের পূর্ণ সহযোগিতায় আশুতোষ অনন্যমনা হয়ে স্নাতকোত্তর পড়াশোনা ও গবেষণার ব্যবস্থায় নিমগ্ন রইলেন। ইতি-মধ্যে আরো একটি বিরাট অঙ্কের দান বিশ্ববিদ্যালয় ভাণ্ডারে জমা পড়ল। খয়রার কুমার গুরুপ্রসাদ সিং পাঁচ লাখ টাকা দান করলেন কয়েকটি বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টির জন্য। তা ছাড়া দুই বিজ্ঞান শিক্ষক ও সাধক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় ও আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দিলেন যথাক্রমে দুই লাখ ও এক লাখ টাকা। এ প্রসঙ্গে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর দানের কথাও অবশ্যই স্মরণীয়।

বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যম ও অর্থদানের বহর দেখে সারা ভারতে সাড়া পড়ে গেল। বলতে গেলে বিদেশী সরকারের সাহায্যের

তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ বে-সরকারি প্রচেষ্টা ও প্রেরণাতেই কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়। "গোলদিঘির গোলামখানা" বলে কথিত বিশ্ববিদ্যালয়কে আশুতোষ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং প্রকৃত মানুষ তৈরির কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিলেন। আর এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে দেশ ও জাতির কল্যাণকামীদের স্বার্থলেশহীন অর্থসাহায্য এবং আশুতোষের অন্তহীন সামর্থ্যের সার্থক সমন্বয়ে। ভাবতে অবাক লাগে, পরাধীন ভারতে মুষ্টিমেয় ধনাঢ্য ব্যক্তির স্বোপার্জিত অর্থসাহায্যে যে বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্ভব হয়েছে, স্বাধীন ভারতে অলিতে গলিতে কোটিপতিরা কিলবিল করলেও সেই হৃদয়বত্তার পরিচয় আর নেই। এখন গবেষণাকর্মে অর্থসাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এবং গবেষণামূলক কাজে অর্থসাহায্যকারী সংস্থা-গুলির দুয়ারে দুয়ারে ধর্ণা দিতে দিতেই গবেষকদের উৎসাহে ভাটা পড়ে যায়।

যা হোক, দাতারা উদার হাতে দান করেছেন, দানযজ্ঞে ব্রতী দাতাদের সেই অর্থে জ্ঞানতপস্বী কর্মবীর আশুতোষ দানকৃত অর্থের সর্তানুসারে নতুন নতুন বিষয়ে অধ্যাপক পদ সৃষ্টি করে পড়াশোনার ব্যবস্থা এবং রিসার্চ ফেলোশিপ, ট্রাভেলিং ফেলোশিপের ব্যবস্থা করে দেশে-বিদেশে প্রতিভাবান ছাত্রদের গবেষণাকর্মে নিয়োজিত করলেন। শিক্ষক নির্বাচনে তাঁর একটা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও মাপকাঠি ছিল। তিনি বলতেন—

> "All students gain inestimably from an intimate association with a teacher of ripe experience and scholarly habits who will not only assist him in solving difficulties but also inculcate in him the proper habits of study and thought."

এই মাপকাঠির ভিত্তিতে তিনি সারা ভারত থেকে বেছে বেছে যে সব শিক্ষককে বিভিন্ন 'চেয়ারে' প্রথম নিযুক্ত করলেন তার তালিকা থেকেই শিক্ষক নির্বাচনে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও ভূয়োদর্শিতার প্রমাণ মেলে। শিক্ষকতা কর্মে নিষ্ঠাবান, উৎসাহী ও উৎসর্গীকৃতপ্রাণ শিক্ষক নির্বাচনে আশুতোষ যে কত বড় জহরি ছিলেন নিম্নোক্ত তালিকাই তার অকাট্য প্রমাণ। তদুপরি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণামূলক পঠনপাঠনের দিকে স্যার আশুতোষ কেমন দৃষ্টি রেখেছিলেন তা রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক ও গবেষকদের নিম্নোক্ত কর্মবিন্যাস থেকেই সুস্পষ্ট হবে।

রসায়ন বিভাগ

প্রফুল্লচন্দ্র রায়—পালিত অধ্যাপক

প্রফুল্লচন্দ্র মিত্র—ঘোষ অধ্যাপক

জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জী
জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ } অধ্যাপকদের সহকারী

নীলরতন ধর
পুলিনবিহারী সরকার
প্রিয়দারঞ্জন রায় } লেকচারার

পদার্থবিদ্যা বিভাগ

সি. ভি. রমন—পালিত অধ্যাপক

দেবেন্দ্রমোহন বসু—ঘোষ অধ্যাপক

যোগেশচন্দ্র মুখার্জি
ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ } সহকারী অধ্যাপক

সত্যেন্দ্রনাথ বসু
মেঘনাথ সাহা
অবিনাশচন্দ্র সাহা } রিসার্চ স্কলার

সুশীলকুমার আচার্য
শিশিরকুমার মিত্র } অধ্যাপকদের সহকারী

রিসার্চ স্কলার, লেকচারার ও অধ্যাপকদের সহকারীদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তীকালে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিশিষ্ট অবদান রেখে গেছেন।

এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল যে সরকারী সাহায্যের তোয়াক্কা না করে সম্পূর্ণ বেসরকারী অর্থানুকূল্যে বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের মতো মহাযজ্ঞানুষ্ঠান তৎকালীন বিদেশী সরকার সুনজরে দেখেন নি। বিজ্ঞান কলেজে তাঁরা যেন বারুদের গন্ধ পেলেন। তদুপরি জীবনের কোনও এক সময়ে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কয়েক জনকে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপনায় নিযুক্ত করায় সরকার আশুতোষের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হলেন। তারা রাজদ্রোহীদের প্রতি আশুতোষের সহানুভূতির আঁচ পেলেন। তাই সরকার আশুতোষের কার্যকাল

আর বাড়াতে রাজী হল না। এমন কি ১৯১৪ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনোৎসবে চ্যান্সেলার (বড়লাট) কিংবা রেক্টর (ছোটলাট) কেউই হাজির ছিলেন না। অনুষ্ঠান উপলক্ষে আহূত বিশেষ সিনেট সভায় উপস্থিত সুধীমণ্ডলীর সামনে আশুতোষ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের আনুপূর্বিক ইতিবৃত্ত ও ভবিষ্যৎ রূপরেখা বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করে সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। সেই ভাষণের প্রারম্ভ ও শেষাংশটুকু উদ্ধৃত করা গেল—

The Senate met to lay the Foundation Stone of the Laboratory Building for the University College of Science at 92, Upper Circular Road, the land given by Sir Tarak Nath Palit, Kt., D.L., for the purpose. There was a large assembly of Registered Graduates, Professors, University Students and notable gentlemen of the city.

The Hon'ble the Vice-Chancellor delivered the following address :—

FELLOWS, GRADUATES, TEACHERS AND STUDENTS OF THE UNIVERSITY OF CALCUTTA,

I do not give expression to mere conventional politeness when I say that I deem it a high honour to be permitted to lay the Foundation Stone of the University College of Science. I sincerely regard it as a high privilege thus to associate myself intimately with the actual establishment of an institution, the project for the foundation of which has been nearest to my heart, ever since it became incumbent upon our University to make provision for the instruction of students under the Indian Universities Act of 1904.

* * * *

Gentlemen, I shall now, with your permission, lay the Foundation Stone of the University College of Science, and I call upon you all to bless this great undertaking from the innermost depths of your souls.

The Hon'ble the Vice-Chancellor on behalf of the Senate then laid the Foundation Stone which was of white marble and which bore the following inscription :—

UNIVERSITY COLLEGE OF SCIENCE

FOUNDATION STONE

LAID BY

SIR ASUTOSH MOOKERJEE, Kt., C.S.I.,

VICE-CHANCELLOR

The 27th March, 1914

বঙ্গদেশে শিক্ষাসম্প্রসারণে আইনজীবীদের অবদান

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে আশুতোষ পর্যন্ত আইনজীবীদের অবদান অসামান্য, অতুলনীয়। তা সে নগদ দানেই হোক, আর শ্রমদানেই হোক। স্যার রাসবিহারীর দাতাকর্ণতুল্য দান পরিগ্রহণোপলক্ষে আহূত সিনেট সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই লক্ষ্যণীয় বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছিলেন—

"Many years ago, educational experts not very unnaturally viewed with jealousy the dominance of lawyers in the deliberations of the University. I refer to those times not in an unkindly spirit but in a spirit of joy.....We may now gratefully acknowledge our obligations to Themis for the help she has given us in men and money through her votaries. The greatest gifts of Themis......has been that our present learned, able and energetic Vice-Chancellor whose record of University work for quality and quantity, for brilliancy and solidity, stand altogether without a parallel."

আশুতোষের বিদায় ভাষণ

১৯১৪ খ্রীঃ ২৭শে মার্চ বিজ্ঞান কলেজের ভিত্তি স্থাপনের তিন দিন পরে ৩০শে মার্চ দীর্ঘ আট বছর অন্তে আশুতোষ উপাচার্য পদ থেকে অবসর নিলেন। বিদায়কালে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণ প্রশিক্ষণী বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করতে পারেন নি। সেজন্য তাঁর মনে আশঙ্কা ও দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। ২৮শে মার্চ তাঁর শেষ সমাবর্তন ভাষণে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানপীঠে রূপান্তরিত করতে যে প্রাণপাত করেছেন, সে কথা প্রসঙ্গে বলেন—

"The last eight years, in truth, have been years of unremittent struggle ; difficulties and obstacles kept springing up like the heads of the Hydra, each head armed with sharp and often venomous fangs......Plans and schemes to heighten the efficiency of the University have been the subject of my day dreams, they have haunted me in the hours of nightly rest. To University concerns, I have sacrificed all chances of study and research, possibly to some extent, the interest of family and friends and certainly, I regret to say, a good part of my health and vitality."

অপরিসীম আত্মত্যাগ, স্বার্থত্যাগ সত্ত্বেও আরব্ধ কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত হয় নি। অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও কর্মশক্তির জোরে সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে তিনি তাঁর লক্ষ্যপথে এগিয়ে গেছেন। সাফল্যের চাবিকাঠি যখন প্রায় তাঁর হাতের মুঠোয়, তখন তাঁকে সরে যেতে হচ্ছে বলে আরব্ধ কর্মযজ্ঞের সফল সমাপ্তি সম্পর্কে তাঁর মনে উদ্বেগ উৎকণ্ঠার সুর বেজে উঠেছিল—

"I dread that pusillanimity which shrinks at the first rough collition with determined hostility, that cowardly spirit of compromise which so often induces the weak man to accept a fraction of the reward for which he has hitherto contended, while one resolute step in advance, one bold thrust of the arm, might have secured for him the whole glorious prize. All these dangers I vividly realise, and hence my feelings are some time not unlike those of the husbandman when he sees dark clouds massing on the horizon and hears

the muffled sound of distant thunder. To me also, nothing is left but to hope, to pray, to trust."

সেদিন আশুতোষের কণ্ঠে শুধুমাত্র আশঙ্কা, উৎকণ্ঠা ও নৈরাশ্যের বাণীই ফুটে ওঠে নি; আজন্ম আশাবাদী আশুতোষ কালো মেঘের আড়ালে আলোর ঝিলিকও দেখতে পেয়েছিলেন—দুর্যোগের ঘনঘটা কেটে যাবার ইঙ্গিতও অনুভব করেছিলেন—

"But far be it from me to close this address of mine on a note of fear and despondency. The spectres of doubt and apprehension which at times crowd round the bravest even, vanish into nothingness when faced with resolution. When all is said and done, there is alive in the depth of my soul the unshakable conviction that I and my helpers have, during these last years, fought a good fight; that the light, which has kept beckoning us onward on our rough and dark path was not the fitful gleam of a will-o-the-wisp, but the steady radiance of a pure and holy flame forever burning in a glorious temple however far remote—a shrine dedicated to the worship of Truth and the Ideal."

অবশেষে সকল উদ্বেগ উৎকণ্ঠাকে দু'হাতে সরিয়ে চির-অকুতোভয় আশুতোষের কণ্ঠে আশার বাণী ধ্বনিত হল—

"I feel that a mighty new spirit has been aroused, a spirit that will not be quenched; and this conviction, indeed, is a deep comfort to me at the moment when I take leave from work dear to me for so many weighty reasons. The workers pass away; the solid results of their work remain and fructify. I thus bid farewell to office and fellow workers, not without anxiety for the future of my University, but yet with a great measure of inward contentment; and let this be my last word—from the depth of my soul, there rises a fervent prayer for the perennial welfare of our Alma Mater—for whom it was given to me to do much work and suffer to some extent—and of that greater parental divinity to whom even our great University is a mere hand-maiden as it where—my beloved Motherland."[১২]

১২. Convocation Address, March 28, 1914.

আশুতোষের এই ঐতিহাসিক সমাবর্তন ভাষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে সেদিনের শ্বেতাঙ্গ সমাজের মুখপত্র "Statesman" লিখেছিল—

> "We do not remember to have ever read such a lofty convocation speech from the Vice-Chancellor of any University in India or elsewhere. It throws a flood of light into the inner recesses of Sir Asutosh's unique character and genious."

কলা ও বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রচলন

উপাচার্য পদ থেকে অবসর নিলেও রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েট কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত সিনেট সদস্য হিসেবে আশুতোষ স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থার অসমাপ্ত কাজে অনন্যমনা হয়ে লেগে রইলেন। "আশুবাবু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার না হইয়াও কর্ণধারই রইলেন, প্রতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কর্ম তাঁহারই ছাপ মারা, তাঁহারই ইঙ্গিতে নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং কর্তৃপক্ষ বুঝিলেন, আশুবাবু যাহা বুঝিবেন তাহাই হইবে, অপরের কোন নির্দেশ পালনের জন্য সেই বিশাল শিক্ষাশালায় তিলমাত্র অবকাশ নাই।"

বলতে গেলে সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত দানের উপর নির্ভর করে বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়েছিল। কিন্তু তাতে সম্পূর্ণ ব্যয় সঙ্কুলান না হওয়ায় আর্থিক সঙ্কট দেখা দিল। সরকার প্রায় বদ্ধ-মুষ্টি, তেমন কোন সাহায্যই সে তরফ থেকে আসছে না। এই অবস্থায় ১৯১৭ খ্রীঃ সরকার সিনেটের সঙ্গে পরামর্শ না করেই আশুতোষকে সভাপতি করে ৭ সদস্যের এক "Post-graduate Enquiry Committee" গঠন করল—যার ৪ জনই ইউরোপীয় সদস্য। কিন্তু আশুতোষের দুর্দমনীয় প্রভাবে সকল সদস্য একমত হয়ে সর্বসম্মত রিপোর্ট পেশ করল। সেই রিপোর্ট নিয়ে ৪ দিন ধরে (১৭ ও ৩১ মার্চ এবং ১৪ ও ১৬ এপ্রিল, ১৯১৭) সিনেটে তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলে। শেষ দিনের সভায় বিষয়টি চূড়ান্ত আলোচনার পর কিছুটা সংশোধিত আকারে গৃহীত হয়—

> "So ended the Herculean struggle for the establishment of a Centralised Post-graduate system of teaching, study and research in Calcutta."[১০]

১০. Hundred Years of the University of Calcutta.

উক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে সিনেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনুমোদিত কলেজ থেকে এম. এ. ও এম্. এস. সি.র পঠন পাঠন উঠে যায় এবং সমগ্র স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে কেন্দ্রীভূত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। আশুতোষ কলেজ থেকে এম. এ.পড়াবার ব্যবস্থা বন্ধ করে কেবলমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা করায় সংশ্লিষ্ট কলেজের অধ্যক্ষগণ রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজেদের গৌরব ও মর্যাদা হারাবার আশঙ্কায় তাঁরা কিছুতেই আশুতোষের শুভ প্রচেষ্টায় সম্মতি দিতে রাজী ছিলেন না। সেদিনের সেই তুমুল প্রতিবাদ ও প্রচণ্ড বাধা বিপত্তি কেমন করে আশুতোষ প্রতিহত করেছিলেন তার বিবরণ দিয়ে গেছেন দীনেশচন্দ্র সেন—

"যে দিন কলিকাতায় কলেজগুলির এম. এ. ক্লাস ভাঙিয়া দিবার প্রস্তাব লইয়া আশুতোষ ফ্যাকালটির সভায় দাঁড়াইলেন, সেদিন তাঁহাকে সম্মিলিত কলেজসমূহের দৃঢ়-সংকল্পিত প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছিল। কলেজের অধ্যক্ষরা বলিলেন—কেহ যদি মাথার মুকুট কাড়িয়া লয়, তবে যে দশা হয়, আজ এম. এ. ক্লাস-বর্জিত কলেজগুলি সেইরূপ সঙ্কটের অবস্থায় দাঁড়াইবে। সুদীর্ঘকাল যে উচ্চস্থান ও মর্যাদা কলেজগুলি ভোগ করিয়া আসিতেছে, আজ তাহা হইতে তাহারা কেন বঞ্চিত হইবে? উত্তরে আশুতোষের প্রধান যুক্তি এই ছিল যে, এখন কলিকাতার কৃতী অধ্যাপকেরা নানা কলেজে বিক্ষিপ্তভাবে কাজ করিতেছেন। মনীষী অধ্যাপকগণ ঘাটেপথে পড়িয়া নাই। হয়তো কোন বিশেষ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ অধ্যাপকদের একজন আছেন প্রেসিডেন্সী কলেজে, একজন আছেন স্কটিশচার্চ বা অপর কোন কলেজে। সমস্ত ছাত্রমণ্ডলী যাঁহাদের অধ্যাপনা দ্বারা উপকৃত হইতে প্রত্যাশা করে, তাঁহারা কলেজ বিশেষের একচেটিয়া হইয়া থাকিবেন কেন? বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. ক্লাসগুলি যদি এরূপভাবে গঠিত হয় যে, এই দেশের যাঁহারা উৎকৃষ্ট অধ্যাপক, তাঁহাদিগকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অধ্যাপনার্থ বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ করা যায়, তবে সমস্ত ছাত্রই তাঁহাদের অধ্যাপনার ফল এবং উপকার পাইতে পারিবে।"[১৪]

১৪. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন।

স্যাডলার কমিশনের সদস্যরূপে আশুতোষ

'Post-graduate Enquiry Committee'র কাজ চলাকালেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে তদন্তের জন্য ভারত সরকার ৭ সদস্যের (৫ জন ইউরোপীয় ও ২ জন ভারতীয়) এক কমিটি গঠন করে। কমিশনের সভাপতি লীড্‌স বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার এম. ই. স্যাডলারের নামানুসারে উক্ত কমিশন 'স্যাডলার কমিশন' নামেই সমধিক পরিচিত। আশুতোষ ছিলেন কমিশনের অন্যতম সদস্য। এই কমিশন সারা ভারত পরিভ্রমণ করে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং বহু কলেজ পরিদর্শনান্তে সুবিস্তৃত রিপোর্টে যে সব সুচিন্তিত অভিমত প্রকাশ ও সুপারিশ করেন, তা শিক্ষা সম্বন্ধে এক অনবদ্য, ঐতিহাসিক দলিল। কমিশনের রিপোর্টের ছত্রে ছত্রে আশুতোষের শিক্ষা সম্পর্কীয় দৃষ্টিভঙ্গী প্রতিফলিত হয়েছে। কমিশনের বহু সুদূরপ্রসারী সুপারিশের মধ্যে (ক) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি পুরোদস্তুর Teaching University রূপে পুনর্গঠন করা এবং (খ) মাধ্যমিক শিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষার ব্যবহার—এই দুটি সুপারিশের সঙ্গে আশুতোষ ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত বলে এই সম্পর্কে পরে একটু বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

স্যাডলার কমিশনের সুপারিশের আগেই আশুতোষ দেশীয় শিক্ষানুরাগীদের বদান্যতায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা প্রবর্তন করেছেন। কিন্তু তখনো অনেক কাজ বাকি, অথচ অর্থভাণ্ডার শূন্য। এই সময়েই (জানুয়ারী ১৯২০) আবার তাঁর হাতে এলো রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় দফার দান। এবার দানের পরিমাণ সাড়ে এগার লক্ষ টাকা। ঐ বছরের মে মাসে তিনি তাঁর উইল মারফত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে 'Travelling Fellowship' স্থাপনের উদ্দেশ্যে আরো আড়াই লক্ষ টাকা দান করেন। রাসবিহারী ঘোষের দ্বিতীয় কিস্তির দানের টাকায় আরো দু'টি অধ্যাপক পদের সৃষ্টি হল।

খয়রার রাজকুমার ও রাজমাতার দান

ইতিমধ্যে আর একটি বিরাট অঙ্কের দানও আশুতোষের হাতে আসে। খয়রার রাণী বাগীশ্বরী দেবী ও কুমার গুরুপ্রসাদ সিং সাড়ে ছয় লক্ষ টাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করেন। তাঁদের নামে স্থাপিত হল পাঁচটি অধ্যাপক পদ। এ ছাড়াও ক্ষুদ্র বৃহৎ আরো অনেক মহৎ দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাণ্ডার পূর্ণ হতে থাকে। সরস্বতীর সাধনায় লক্ষ্মী অকৃপণ হাতে অর্থ যোগাতে থাকেন—যা

নাকি তাঁর স্বভাবের পরিপন্থী, কিন্তু পূজারী তো আশুতোষ। দেশবাসী করেছে অর্থ দান, তা দিয়ে তিনি করেছেন শিক্ষাদান। সার্থক হলো আশুতোষের স্বপ্ন ও সাধনা। কলাবিদ্যার সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যাও বিভিন্ন শাখা প্রশাখায় বিস্তৃত হল। সৃষ্টির আনন্দে অভিভূত আশুতোষের কণ্ঠে উচ্চারিত হল বিজ্ঞানের বন্দনা বাণী—

"Science in its ultimate essentials, echoes the voice of the living God."

(বিজ্ঞান ভগবানের জাগতিক কণ্ঠধ্বনির প্রতিধ্বনি মাত্র—এই হল পরম সত্য।)

যেমন 'চেয়ার' তেমনি 'চেয়ারম্যান'

আশুতোষের প্রচেষ্টায়, শিক্ষানুরাগী দেশবাসীর দানে এবং সরকারী সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন বিষয়ে যে সব 'চেয়ার' অধ্যাপক পদ সৃষ্টি হয়েছিল সেগুলির নাম ও প্রথম পদাধিকারী অধ্যাপকদের তালিকা থেকে বোঝা যায় আশুতোষ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ও বিজ্ঞান বিভাগকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কযুক্ত এক সর্ব ভারতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করেছিলেন—

(*A*) Professorship created with financial assistance from the Government :—
1. Minto Professor of Economics—Manohar Lal.
2. King George V Professor of Mental & Moral Science —Brajendranath Sil/S. Radhakrishnan.
3. Hardinge Professor of Advanced Mathematics— —A. R. Forsyth./W. H. Young.

(*B*) Professorship created in the name of Taraknath Palit :—
1. Taraknath Palit Professor of Chemistry—Prafulla Chandra Ray.
2. Taraknath Palit Professor of Physics—C. V. Raman.

(*C*) Professorship created in the name of Rashbehary Ghose :—
1. Rashbehary Ghose Professor of Applied Mathematics—Ganesh Prasad.
2. Rashbehary Ghose Professor of Physics—Debendramohan Basu.

3. Rashbehary Ghose Professor of Chemistry—Prafulla Chandra Mitra.
4. Rashbehary Ghose Professor of Botany—S. P. Agharkar.
5. Rashbehary Ghose Professor of Applied Physics— —Phanindranath Ghosh.
6. Rashbehary Ghose Professor of Applied Chemistry— Hemendrakumar Sen.

(*D*) Professorship created out of Khaira Fund :—

1. Rani Bagiswari Professor of Fine Arts—Abanindranath Tagore.
2. Guruprasad Singh Professor of Philology—Suniti Kumar Chatterjee.
3. Guruprasad Singh Professor of Physics—Meghnad Saha.
4. Guruprasad Singh Professor of Chemistry—Jnanendranath Mukherjee.
5. Guruprasad Singh Professor of Agriculture—Nagendranath Ganguli.

(*E*) Professorship created out of University fund :—

1. Carmaichael Professor of Ancient Indian History & Culture—George Thibaut.
2. University Professor of Comparative Philology—Otto Strauss/I. J. S. Tarapoorwala.
3. University Professor of English—Robert Knox/Henry Stephen.
4. University Professor of Mentaland Moral Philosophy —Hiralal Haldar.
5. University Professor of Botany—P. Bruhl.
6. University Professor of Biology—S. N. Maulik.

(*F*) 1. Emeritus Professor—C. E. Cullis.

(*G*) 1. University Professor of International Law—Arther Brown.

(*H*) 1. Principal, University College of Law—S. C. Bagchi.

বলতে গেলে একক প্রচেষ্টায় উচ্চ শিক্ষা প্রসারের এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত ভূ-ভারতে আর কোথাও নেই।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার ঃ শিক্ষায় গণতন্ত্র

শিক্ষায় স্বরাজ—বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা—প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে বিবাদ—টাকা দিয়ে স্বাধীনতা হরণের প্রচেষ্টা—আশুতোষের জ্বালাময়ী ভাষণ—শর্তসাপেক্ষে উপাচার্যপদে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব—ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান—বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার বিনিময়যোগ্য পণ্য নয়—শিক্ষা ও গণতন্ত্র।

*　　*　　*　　*

শিক্ষায় স্বরাজ

শিক্ষায় স্বরাজ, শিক্ষা ও গণতন্ত্র, শিক্ষায় সরকারী হস্তক্ষেপ, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা ইত্যাদি প্রশ্নে আশুতোষের চিন্তাধারা ছিল খুবই স্পষ্ট। উদার-নৈতিক গণতন্ত্রবাদী আশুতোষ সক্রিয়ভাবে কোন রাজনৈতিক আন্দোলনে বা সরকার বিরোধী বিক্ষোভে সামিল হন নি। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধিকার রক্ষায় তাঁকে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। অবশ্য তার আগেও "শিক্ষা ও সরকার" এই প্রশ্নটি নিয়ে তিনি গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। বস্তুতপক্ষে পেশাগত রাজনীতিবিদ না হলেও স্বদেশ প্রেম, স্বজাতি প্রীতি, স্বাধীনতা স্পৃহা কত গভীরভাবে তাঁর অন্তরের অন্তঃস্থলে গ্রথিত ছিল তার পরিচয় মেলে সরকারের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পর্ক নিয়ে যে পত্র চালাচালি ও বাদানুবাদ হয়েছে, তা থেকে।

বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার ঃ চিন্তার স্বাধীনতা চাই সর্বাগ্রে

শিক্ষা তথা বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকার—এই দুই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক কি ধরণের হবে, তার কিছুটা আভাস আশুতোষ "বিশ্ববিদ্যালয় আইন—১৯০৪" কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় আলোচনাকালেই দিয়েছিলেন। তখনো তিনি উপাচার্য হন নি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের "অটোনমি" বা স্বাধীনতা এবং চিন্তার

স্বাধীনতা সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট চিন্তাভাবনার পরিচয় মেলে তখন থেকেই। তিনি বলেছেন—

"In the prosecution of its academic aims, the University should be free from all external censorship of doctrine ; it should also be free from all external control over the range or the modes or the subjects of teaching. Above all, thought should be free from fetters of official type ; whether political from the State, or ecclesistical from the Churches, or civil from the community, or pedantic from the corporate repressive action of the University itself."

বিশ্ববিদ্যালয়কে সরকারী দপ্তরে পরিণত করার যে কোন প্রকার সম্ভাবনার ঘোরতর প্রতিবাদ করে তিনি বলেন—

"I deny most emphatically that it is necessary or desirable to have any provision in the law, which may possibly convert the University into mere departments of the State ; *it is quite possible to stunt the growth of a beautiful tree by constant prunning and too affectionate care.*"

[বিশ্ববিদ্যালয় সরকারী দপ্তরে পরিণত হতে পারে, আইনে এমন কোন ধারার যৌক্তিকতা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করছি। একটা সুন্দর চারাগাছকে অতিরিক্ত যত্ন করলে এবং ক্রমাগত ছাঁটতে থাকলে, তার স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও পুষ্টি ব্যাহত হতে বাধ্য।]

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা

আশুতোষ ছিলেন দুর্নিবার স্বাধীনচেতা মানুষ। আজীবন কারো কাছে মাথা নত করেন নি। তিনি জানতেন 'academic freedom' না থাকলে কোন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানই তার দায় দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। তার উপর সরকারী খবরদারি বা তদারকি আরোপিত হলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ও বিকাশ ব্যাহত ও বিঘ্নিত হবেই। এই চিন্তাধারায় দীক্ষিত আশুতোষকে একান্ত আস্থাভাজন বিবেচনায় সরকার শিক্ষা সঙ্কোচন নীতি কার্যকর করতে যখন তাঁকে উপাচার্য পদে বসালেন, তখন তাঁরা স্বপ্নেও ভাবেন নি যে তিনি সেই ইস্পাত কঠিন কাঠামোর ভেতরে থেকেই সরকারী শিক্ষানীতিকে বানচাল করে দেশ ও জাতির পক্ষে মঙ্গলদায়ক শিক্ষা প্রসার

করে যাবেন। হতভম্ব ব্রিটিশ সরকার এবং সন্দেহপ্রবণ দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে দেখল—ব্রিটিশ সরকারের বানর তৈরী করার জন্য আয়োজিত মাল মসলা দিয়েই আশুতোষ কেমন চমৎকার শিব গড়ে তুলেছেন—যা একাধারে সত্য ও সুন্দর।

আশুতোষের স্বাজাত্যাভিমান, জাতীয়তাবোধ তেজস্বিতা এবং নয়কে হয় করার ক্ষমতাই শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর বিরোধের মূল। তা অবশেষে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পৌছেছিল। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য—

"দেশহিতের জন্য আশুবাবু আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা-সংক্রান্ত সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা চাহিয়াছিলেন ; পাঠ্য নির্ধারণ, অধ্যাপক মনোনয়ন, শিক্ষার বিষয় স্থিরীকরণ প্রভৃতি খুঁটিনাটি বিষয়ে রাজপুরুষেরা কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন ? শিক্ষা বিষয়ে গৃহীত সিনেটের সিদ্ধান্তকে তাঁহারা কেন ডিঙাইয়া যাইবেন ? সিনেটের এক শত জন সদস্যের মধ্যে আশীজনই গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত। ইহা ছাড়া পদাধিকারবলে সদস্যগণের অনেকেই একরূপ গভর্ণমেণ্টের তরফেরই লোক। এইরূপ অনুকূলভাবে গঠিত সিনেটের শিক্ষা-বিষয়ে গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর তাঁহারা আবার কথা বলার অধিকার রাখিতে চান কেন,—ইহাই ছিল আশুতোষের প্রশ্ন। রাজপুরুষেরা তো এই দেশের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহেন। এইরূপ ক্ষেত্রে শিক্ষা সম্বন্ধে সিনেটের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ আশুতোষ অন্যায় মনে করিতেন।"[১]

কিন্তু চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী। কর্তৃপক্ষের কানে এসব হিতকথা মধুর শোনাবে কেন ? তাদের যুক্তির জোর নেই, আছে গায়ের জোর, আর সাম্রাজ্য স্বার্থ রক্ষার তাগিদ। আশুতোষ যখন রাজনীতি বিবর্জিত গণতান্ত্রিক শিক্ষানীতি রূপায়ণে ব্যস্ত, কর্তৃপক্ষ তখন রাষ্ট্রনীতির কুট-কচালে ব্যতিব্যস্ত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক সরকারের সঙ্গে বিবাদ

আশুতোষ শেষ সমাবর্তন ভাষণ দেন ১৯২৩ খ্রীঃ। তখন আচার্য ছিলেন ছোটলাট লর্ড লিটন। সমাবর্তন অনুষ্ঠানের প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি

১. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন

বিশ্ববিদ্যালয়কে ভারত-সরকারের তত্ত্বাবধান থেকে প্রাদেশিক সরকারের নিয়ন্ত্রণে আনার নতুন সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন—

"The connection of Government with the University, and the supervision by Government of the affairs of the University are new things which we are seeking for the first time."[২]

বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অছিলা অজুহাত তৎকালীন বাংলা সরকার কিছুদিন থেকেই যে খুঁজছে, আশুতোষ তা আগেভাগেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। সরকার প্রণোদিত এই ষড়যন্ত্রের কথা—যার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং আচার্য তথা গভর্ণর লর্ড লিটন—আশুতোষ লাট সাহেবের মুখের উপরেই বলে দিলেন—

"We cannot shut our eyes to the lamentable fact that there have been abundant indications in recent times of the existence of what looks like a determined conspiracy to bring this University into disesteem and discredit."[৩]

(গত কিছুকাল ধরে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে লোকচক্ষে অশ্রদ্ধেয় ও হেয় প্রতিপন্ন করতে যে উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষড়যন্ত্র চলছে সেই শোচনীয় অথচ সত্য ঘটনার প্রতি আমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না।)

সেদিন লাট সাহেবের পাশে দাঁড়িয়ে আশুতোষ দীপ্তকণ্ঠে বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দাবী করে বলেছিলেন—

"The University must be free from external control over the range of subjects of study and methods of teaching and research. We have to keep it equally free from trammels in other directions—political fetters from the State, ecclesiastical fetters from religious corporations, civic fetters from the community and pedantic fetters from what may be called the corporate repressive action of the University itself."[৪]

আর্থিক সাহায্যের বিনিময়ে স্বাধীনতা বিসর্জন দেব না

বিশ্ববিদ্যালয়ের চরম আর্থিক সংকটের সুযোগ নিয়ে বিদেশী সরকারের দেশীয় শিক্ষামন্ত্রী স্যার প্রভাসচন্দ্র মিত্র শর্তসাপেক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়কে কিছু

২. Convocation Address of Lord Lytton, 1923.

৩, ৪. Convocation Address of Sir Asutosh Mookerjee, 1923.

আর্থিক সাহায্য দেবার প্রস্তাব করেন—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বভৌমত্ব হরণেরই নামান্তর। এই ঘৃণ্য প্রস্তাব সক্রোধে প্রত্যাখ্যান করে সিনেট সভায় আশুতোষ বলেছিলেন—

"Take it from me that as long as there is one drop of blood in me, I will not participate in the humiliation of this University. This University will not be a manufactory of slaves. We want to think truly. We want to teach freedom. We shall inspire the rising generation with thoughts and ideas that are high and ennobling. We shall not be a part of the Secretariat of the Government. Forget not that what is offered is not even a periodical grant, much less a perpetual grant. What is the offer ? Two and a half lakhs ; and you solemnly propose that you should barter away your independence for it........what authority, I ask, have we, who are assembled here tonight, to barter away for ever the rights and privileges of this University ? What will Bengal say ? What will India say ? What will the Post-graduate teachers say ? They will resign to-morrow. They will go into banishment rather than take money under these humiliating conditions. What will posterity say ? Will not future generations cry shame, that the Senate of the University of Calcutta bartered away their freedom for two and half lakhs of rupees ?"[৫]

স্বাধীনতা আগে : স্বাধীনতা পরে : স্বাধীনতা সর্বক্ষণ

এই ভাষণের শেষাংশে আশুতোষ যে বৈপ্লবিক উক্তি করেছিলেন তা পৃথিবীর যে কোন দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা সংগ্রাম বা শিক্ষায় স্বরাজ আন্দোলনের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকার উপযুক্ত। আশুতোষের অন্তরে স্বাধীনতার অন্তঃসলিলা প্রবাহ যে ফল্গু-ধারার মতো প্রবাহিত ছিল, এই ভাষণে ঘটে তার বহিঃপ্রকাশ। তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছিলেন এই কথা বলে—

---

৫. Calcutta University Senate Minutes, 1923.

"*If you give me slavery in one hand and money in the other, I despise the offer.* We will not take the money. We shall retrench and we shall live within our means. We shall go from door to door all through Bengal. We shall rouse the public conscience of Bengal, which has been lying dormant for some time past, and make the people of Bengal realise their responsibility for the maintenance, in a state of efficiency, of their chief seat of learning, their potent instrument for the human activity. Our cause is just and we shall not submit to humiliating conditions. Our Post-graduate teachers would starve themselves, rather than give up their freedom ....I call upon you, as members of the Senate to stand up for the rights of your University. Forget the Government of Bengal. Forget the Government of India. Do your duty as Senators of this University, as true sons of your *Alma Mater. Freedom first, freedom second, freedom always ; nothing else will satisfy me.*"[৬]

শর্তসাপেক্ষে উপাচার্য পদে পুনর্নিয়োগের প্রস্তাব : ঘৃণার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান

দ্বিতীয় দফায় আশুতোষের উপাচার্যকাল শেষ হয়ে এলে লর্ড লিটন তাঁকে এক লম্বা চিঠি লেখেন। এই চিঠিতে তিনি সরকারী নীতির বিরোধিতা করার জন্য আশুতোষকে অভিযুক্ত করেন এবং সরকারী নীতি যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করবেন এই মুচলেকা দিলে তাঁকে পুনরায় উপাচার্য পদে নিয়োগের প্রস্তাব দিয়ে লেখেন—

"........if you can give an assurance that you will not work against the Government or seek the aid of other agencies to defeat our Bill then I am prepared to seek the concurrence of my Minister to your reappointment as Vice-Chancellor........"[৭]

এই অবমাননাকর প্রস্তাবে ক্রুদ্ধ আশুতোষ রুদ্রমূর্তি ধারণ করে লর্ড লিটনকে দীর্ঘতর যে পত্র লেখেন, তা যে কোন জাতির কাছে স্বাধীনতার

৬. Calcutta University Senate Minutes, 1923.

৭. Lord Lytton's letter to Sir Asutosh.

সনদ বলে গণ্য হবার যোগ্য। আশুতোষ যে উত্তর দিয়েছিলেন তার মোদ্দা কথা হলো—আমি লর্ড কার্জন, লর্ড মিণ্টো, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড রোনাল্ডসে প্রভৃতি রথী মহারথী বড়লাটের সঙ্গে মাথা উঁচু করে ইচ্ছামত কাজ করেছি—তুমি তো ছোটলাট চুনোপুঁটি! তোমাকে তোয়াক্কা করে কাজ করতে হবে? পত্রের উপসংহারে আশুতোষ লিখেছিলেন—

"I am not surprised that neither you nor your Minister can tolerate me. You assert that you want us to be men. You have one before you, who can speak and act fearlessly according to his convictions, and you are not able to stand the sight of him. It may not be impossible for you to secure the services of a subservient Vice-Chancellor, prepared always to carry out the mandates of your Government, and to act as a spy on the Senate. He may enjoy the confidence of your Government but he will not certainly enjoy the confidence of the Senate and the public of Bengal. We shall watch with interest the performance of a Vice-Chancellor of this type, creating a new tradition for the office.

I send you without hesitation the only answer which an honourable man can send, an answer which you and your advisers expect and desire; I decline the insulting offer you have made to me."[৮]

লর্ড লিটনের চিঠি ও আশুতোষের জবাব সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবার পর সারা দেশে মহা আলোড়ন উপস্থিত হয়েছিল। পরাধীন দেশের কোন প্রজা যে শাসকগোষ্ঠীর প্রতিভূকে এমন ভাষায় চিঠি লিখতে পারে তা অনেকের কল্পনার বাইরে। শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী 'Servant' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে মন্তব্য করেছিলেন—

"Sir Asutosh has vindicated the honour of this country in a manner which is unprecedented in the annals of our history. His words will ring from soul to soul for generations to come."[৯]

৮. Sir Asutosh's letter to Lord Lytton, the Governor and the Chancellor. C. U. Senate Minutes, 1923.

৯. Editorial in the 'Servant' —Syamsundar Chakraborty.

শিক্ষা ও গণতন্ত্র

বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সরকারী নিয়ন্ত্রণের সম্পূর্ণ বিরোধী হলেও আশুতোষ 'জনগণতান্ত্রিক' নিয়ন্ত্রণে খুব আস্থাবান ছিলেন না। তিনি বলতেন "প্রকৃত শিক্ষা ও সংস্কৃতি ব্যতিরেকে যে গণতন্ত্র অথবা দায়িত্ববোধহীন যে গণতন্ত্র, তা আদৌ গণতন্ত্র নয়। এই যে আমাদের দেশে unenlightened ও uninformed ডেমোক্রেসি, এটা কি ব্যুরোক্রেসির চেয়ে কম ক্ষতিকারক ?"

এই প্রসঙ্গে লক্ষৌ বিশ্ববিদ্যালয় ইউনিয়নে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ' সম্পর্কে প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন—

> "I yield to none ...... in my fervent admiration of democracy and democratic institutions ; at the same time I realise the weakness and dangers of democracy. When a democracy imperiously demands control over the University, I answer without hesitation, "pause my friends, your claim will become admirable only when democracy ceases to be a democracy and is transformed into an intellectual aristocracy."[১০]

বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আশুতোষের এই সুচিন্তিত অভিমতের একটি মাত্র অর্থ তিনি শিক্ষাব্যবস্থাকে রাজনীতি বহির্ভূত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন এবং শিক্ষাক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন। সবশেষে, শিক্ষাকে রাজনীতিমুক্ত রাখা এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে স্বাধীনভাবে পরিচলনা করা কেন প্রয়োজন, তা বিশ্লষণ করে তিনি বলেছেন—

> (*a*) "We stand unreservedly by the doctrine that if education is to be our policy as a nation, it must not be our politics ; freedom is its very life-blood, the condition of its growth, the secret of its success .... Supremely gifted must be that friend of the University who can see gladsome light through darkness visible, and predict with confidence the result of this clash and conflict of ideals. But when all is said and done, there stands forth unshaken the conviction that our insistant claim

---

১০. Address at the Lucknow University Union, 8.1.1924

for the freedom of the University is a fight for a righteous cause, a fight for the most sacred and impalpable of national privileges." (C. U. Convocation Address)

(b) "What is the University ? It is the crown of our educational edifice. No University man will seriously suggest that we should hand over the control of the University to a democracy, which has not yet come under the influence, much less realised the value, of the highest ideals of education in the life of the nation. ......it is the function of the University to raise the nation, to guide the nation, to elevate the leaders of the democracy, not to be guided by them......There was no democracy more cultured than the democracy of the Greeks the most cultured of the nations of antiquity the world has witnessed. Yet, it was this democracy which so grievously failed to recognise the sacredness of liberty of thought and speech that it made Socrates drink the juice of hemlock. Your democracy is not more cultured than the democracy of the Greeks, and yet you suggest that the Universities should be placed under democratic control. If your contention prevailed, do you imagine a Bacon would be given a place in your University or a Darwin be tolerated in the novel academic sphere ?"[১১]

---

১১. Address at the Lucknow University Union, 8.1.1924.

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি

চরৈবেতি, চরৈবেতি—এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো—শিক্ষানায়ক আশুতোষ—চাই সক্রিয় সহায়তা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়—আশুতোষ বনাম গান্ধী—আশুতোষ শুধু শিক্ষাবিদ নন, জাতি সংগঠকও বটে—শিক্ষাস্বার্থে স্বার্থত্যাগ—আশুতোষের শিক্ষাপ্রীতি দেশপ্রেমের নামান্তর।

* * * *

চরৈবেতি, চরৈবেতি : এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো

আধুনিক শিক্ষানীতির রেখাচিত্র অঙ্কনকারী, যুগোপযোগী শিক্ষা প্রসারে মহাব্রতী আশুতোষ এদেশের প্রাচীন শিক্ষা সংস্কৃতির প্রতিও গভীর আস্থাবান্ এবং শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কিন্তু তা সত্বেও তিনি ছিলেন কূপমণ্ডুকতার চরম বিরোধী। প্রাচীন, জীর্ণ ও অচলায়তনে তাঁর ঘোরতর অনীহা। তাঁর শিক্ষাচিন্তাও ছিল এগিয়ে চলার আহ্বান। পিছুর টানে আবদ্ধ থাকার মানসিকতায় তাঁর ঘোর বিতৃষ্ণা। তিনি মহীশূরের সমাবর্তন ভাষণে বলেছেন—"এটা নিশ্চিত সত্য যে, যে সমাজ যে জাতি বা যে গোষ্ঠী নিজের ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে বাস করবে, সে অনন্ত বিশ্বের সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত হয়েই থাকবে। আমরা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ; আমাদের চলতে হবে নতুবা আমরা ভেসে যাবো।" নিচে আশুতোষের মুখের কথাগুলিই উদ্ধৃত করা গেল—

"We cannot disentangle ourselves even if we wish from irresistible world-currents and sit on the lovely snow-capped peaks of the Himalayas absorbed in contemplation of our glorious part. It is most emphatically true that the country, the people, the nation, the race which like the Greek philosopher will live in its own tub and ask the conquering powers around it to move away from its sunshine, will soon be

enveloped in external darkness, the object of derision for its helplessness and of contempt for its folly. We cannot afford to stand still ; we must move or be overwhelmed. *The past is of value, only in so far as it illuminates the present ; the present is of value, only in so far as it guides us to shape the future.*"[১]

[আমরা ইচ্ছা করলেও অপ্রতিরোধ্য বিশ্বঘটনা প্রবাহ থেকে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন রেখে এবং বরফাচ্ছাদিত হিমালয়ের মনোহর শীর্ষ দেশে বসে অতীত গৌরবে ধ্যাননিমগ্ন থাকতে পারি না। এটা অবিসংবাদিত সত্য যে, কোন দেশ, জনগোষ্ঠী, জাতি বা সম্প্রদায় গ্রীক-দার্শনিকের মতো নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে বাস করে চারদিক আলোকিত করা সূর্যকররাশিকে দূরে সরে যেতে হুকুম করলে, সে দেশ ও জাতি অচিরে তমসাবৃত হয়ে পড়বে, এবং পরিশেষে নিজেদের অসহায়তার জন্য অপরের পরিহাসের পাত্র হবে ও মূর্খতার জন্য নিন্দনীয় হবে। আমরা এক স্থানে স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারি না ; হয় এগিয়ে যাব, নয়তো অপরের পদস্পৃষ্ট হতে হবে। অতীত যদি বর্তমানকে আলো দেখাতে পারে তবেই তার সার্থকতা ; আর বর্তমান যদি ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে সঠিক পথনির্দেশ করে, তা তবেই যথার্থ মূল্যবান বিবেচিত হবে।]

শিক্ষানায়ক আশুতোষ

কিন্তু এগিয়ে চলার পথ তো রুদ্ধ। সরকারী আইন প্রতিবন্ধক। তাকে ডিঙিয়ে এগোনো অসম্ভব। অথচ সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা ছাড়া কিছু করাও অসম্ভব। লর্ড কার্জনের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বিশ্ববিদ্যালয় আইনের (১৯০৪) বলে সরকার বিশ্ববিদ্যালয়কে 'Officialise' করতে এবং শিক্ষা-সংকোচন নীতি প্রয়োগ করতে উদ্যত। এই সন্দেহ অবিশ্বাস এবং আশঙ্কা যখন দেশবাসীর মনে দানা বেঁধেছে, তখন আশুতোষ উক্ত আইনকে কার্যে রূপায়িত করতে উপাচার্য নিযুক্ত হলেন। কিন্তু আশুতোষ সুকৌশলে শিক্ষা সম্পর্কীয় 'Settled fact' কে সম্পূর্ণ 'Unsettled' করে দিলেন। তিনি যে এমন সূঁচ হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বেরিয়ে আসবেন, তা ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট

১. Address at the Convocation of Mysore University, 19.10.1918.

স্বপ্নেও ভাবেনি। আশুতোষ নিজেই অনেক সময় তাঁর বন্ধুদের কাছে বলতেন—"লর্ড কার্জন নিজে বিশ্ববিদ্যালয়ের রথ চালিয়েছিলেন। অথচ সে রথ তাঁর অভিষ্ট স্থানে না গিয়ে ঠিক তার বিপরীত দিকে গেল। ভগবানের ইচ্ছা বুঝা কঠিন!"

দেশের লোকের মন থেকে সন্দেহ অবিশ্বাস কেমন করে অন্তর্হিত হল সে সম্পর্কে বাংলা ভাগের 'Settled Fact'কে 'Unsettled' করার নায়ক রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বলেন—

"His long familiarity with the Calcutta University, his wide grasp of the educational problems and his extra-ordinary capacity for dealing with them, made Sir Asutosh the most commanding figure in the University. ....During the time he was Vice-Chancellor he ruled the University with a supreme sway ; and it is but right to say that he enforced the regulations with a measure of discretion, a regard for all interest, that partly allayed the suspicion and anxiety they had created in the mind of the educated community of Bengal. He was a unique figure in the educational world of Bengal."[২]

চাই সক্রিয় সহায়তা, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়ঃ আশুতোষ বনাম গান্ধী

কেমন করে আশুতোষ এই অসম্ভবকে সম্ভব করে তুললেন, সরকারের শিক্ষানীতিকে ভেতর থেকে বানচাল করে দিলেন—তাঁর সেই আত্মশক্তির উৎস কোথায়, তার হদিস মিলবে নিম্নোক্ত তুলনামূলক পর্যালোচনা থেকে—

"কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিদিত অধিপালের তুলনায় গান্ধী হলেন ব্যবহারিক জীবনে শিশু। গুজরাটি সাধুর প্রশাসনী প্রতিভা ছিল না, বিশাল বিদ্যাবত্তাবলম্বিত মানবতাই বাঙালী আইন বিশারদ ও শিক্ষাবিদকে মানুষশ্রেষ্ঠ করে তুলেছিল। গান্ধীর কোন রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল না, মুখোপাধ্যায়ের এটা পূর্ণভাবে ছিল এবং মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল গভীর। গান্ধী ছিলেন নিষ্ক্রিয় প্রতিবন্ধকে বিশ্বাসী, মুখোপাধ্যায় শত্রুরাজ্যে ধর্মযুদ্ধের পরিচালনায় আস্থাশীল। গান্ধীর আত্মশক্তির ভিত্তি হলো পাশ্চাত্য সভ্যতার

২. A Nation in Making—Sir Surendranath Banerjee

দূরীকরণ : মুখোপাধ্যায়ের চলচ্ছক্তির ভিত্তি হলো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সমন্বয়—যার মূল বিধৃত রয়েছে সদাজাগ্রত নির্ভুল বাস্তববোধে। ...তিনি স্থির থাকতেন বিজ্ঞতার ভারকেন্দ্রে।"[৩]

স্পষ্টতঃই দেখা যাচ্ছে আশুতোষ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি সরকারের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে তৎকালীন পরিস্থিতিতে দেশ ও জাতির শিক্ষালাভের সম্ভাব্য সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে গেছেন। ব্রিটিশ সরকারের শিল নোড়া দিয়েই তিনি তাদের দাঁতের গোড়া ভেঙ্গে দিয়েছিলেন এবং তা সম্ভব হয়েছিল ঐ সক্রিয় সহযোগিতার ফলেই, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধে নয়। তাঁর মহীশূর ভাষণে তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন—

> "Good men are not like trees, planted by rivers of water, flourishing in their pride and for their own sake, but they are like eucalyptuses reared in the marshes, differing a healthful tonic influence and countervailing the poisonous miasma. They are like the tree of paradise whose leaves are for the healing of noisome. Be not content, therefore, merely to avoid evil and the forces of corruption. *Society requires, not passive resisters, but active helpers. It lies in you to illustrate the inefficiency of an education which produces learned sharks and refined skulkers.*"[৪]

[ভাল মানুষ জলে ভেসে আসা বীজ থেকে স্বয়ং গজিয়ে ওঠা বৃক্ষের মতো নয়। তারা সরস ভূমিতে সযত্নে রোপিত স্বাস্থ্যকর ও বলকারক প্রভাব বিস্তারী এবং দূষিত বাষ্প-বিনাশী ইউক্যালিপটাস বৃক্ষ যেন। তারা নন্দনকাননের তরুরাজির মতো—যাদের পাতায় রয়েছে স্বাস্থ্যহানিকর বিষাক্ত প্রভাব উপশমের গুণ। অতএব কেবলমাত্র শয়তান ও দুর্নীতির প্রভাব এড়িয়ে থাকাতেই সন্তুষ্ট থেক না। সমাজ চায় সক্রিয় সহযোগী, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নয়। যে শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষিত প্রবঞ্চক ও ভদ্রবেশী পলাতক তৈরী করে, তার অসারতা প্রমাণ করা তোমাদের উপরেই নির্ভর করছে।]

---

৩. Ditcher in 'Capital'—বঙ্গবাণী, আষাঢ়, ১৩৩১.

৪. Address at the Convocation of Mysore University, 19.10.1918.

তিনি শুধু শিক্ষাবিদ নন্, জাতি সংগঠকও বটে

দেখা যাচ্ছে, যে শিক্ষাব্যবস্থা শিক্ষিত প্রতারক ও জীবন সংগ্রাম-বিমুখ ভদ্রলোক তৈরী করে সেই শিক্ষাব্যবস্থার মূলোচ্ছেদ করে, সংগ্রাম মুখর, সমাজ দরদী ও দেশপ্রেমী মানুষ গড়ে তোলার মতো শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করাই তাঁর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা। এবং অত্যন্ত প্রতিকূল পরিবেশে সে চিন্তাকে কার্যে রূপদান করার মধ্যেই রয়েছে তাঁর অবিস্মরণীয় কীর্তি ও অনন্যসুলভ প্রতিভার সাক্ষর। তাঁর এই অনন্যসাধারণ ক্ষমতা ও অবদানের কথা বলতে গিয়ে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বলেছেন—

> "It has been said that he was a great educationist, undoubtedly he was. He was one of the foremost, and if you count the number of educationists all the world over I doubt whether you can come across a greater educationist than Sir Asutosh Mookerjee. But here again I stand on my original observation—he was far greater than merely a great educationist. His heart was with the nation. He was a builder. He tried to build this great Indian nation and honour it by his activities......"
>
> —(Extract from the speech at Calcutta Corporation)

সুতরাং আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হল মানুষ তৈরী করা, জাতি গঠন করা ; কিন্তু তা করতে গিয়ে তিনি শিক্ষানীতি বিষয়ক কোন সুনির্দিষ্ট 'theory' বা 'formulae' বা 'policy' র ভিত্তিতে পরিকল্পনা মাফিক কাজ করতে পারেন নি। অত্যন্ত সীমিত ক্ষমতা ও বাধ্যবাধকতার ভেতর থেকেই তিনি শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে শিক্ষার বিভিন্ন দিক নিয়ে যে সব প্রকল্প তৈরী করেছেন, কর্মে রূপায়িত করেছেন, যা করবার ইচ্ছা ছিল অথচ করতে পারেন নি ; কিন্তু সে সম্পর্কে নিজের অভিমত দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ব্যক্ত করে গেছেন—সে সব একত্রে মিলিয়ে দেখলেই আশুতোষের শিক্ষাচিন্তার রূপরেখা ধরা দেবে। কোন 'theory' বা 'formulae'-র পেছনে ছুটে বেড়াতে হবে না। তিল তিল সৌন্দর্য সংগ্রহ করে যেমন তিলোত্তমা সৃষ্টি, একটি একটি করে ফুল গেঁথে যেমন মালা তৈরী, আবার আলাদা আলাদা ক্ষুদ্র-বৃহৎ যন্ত্রাংশ জুড়ে ও সুসংবদ্ধ করে যেমন গতিশীল চলমান ও উৎপাদনক্ষম যন্ত্র তৈরী করা হয়, তেমনি অনেকগুলি খণ্ডচিত্র একত্র করেই তৈরী হয়েছে আশুতোষের শিক্ষা-আলেখ্য। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর স্বপ্ন উদ্যোগ উদ্যম পরিকল্পনা ও রূপায়ণ পদ্ধতি থেকেই

মিলবে তাঁর শিক্ষাচিন্তার স্বরূপ—যার একমাত্র উদ্দেশ্য—"মানুষ তৈরী করণ ও জাতি গঠন।"

শিক্ষার স্বার্থে স্বার্থত্যাগ

শিক্ষা নিয়ে আশুতোষের এত ভাবনা চিন্তা, এত মাথাব্যথার কারণ কি। তিনি আহার নিদ্রা ত্যাগ করে, নিজের ও পরিবারের বৈষয়িক উন্নতির পথ পরিহার করে, স্বদেশীয়দের গঞ্জনা, বিদেশী সরকারের উষ্মা সহ্য করেও দেশবাসীর শিক্ষার পথ সুগম করতে প্রাণপাত পরিশ্রম করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে তাঁকে শারীরিক মানসিক ও আর্থিক যে ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছিল, তা উল্লেখ করে তিনি সমাবর্তন ভাষণে বলেছেন—

"For years now, every hour, every minute I could spare from other unavoidable duties—foremost among them the duties of my judicial office—has been devoted by me to University work. Plans and schemes to heighten the efficiency of the University have been the subject to my day dreams, they have haunted me in the hours of nightly rest. To University concerns I have sacrificed all chances of study and research, possibly to some extent, the interests of family and friends, and certainly, I regret to say, a good part of my health and vitality. Sympathy has failed us in quarters where we had a right to demand it, and where we confidently reckoned on it."[৫]

[বছরের পর বছর প্রতি ঘন্টা প্রতি মিনিট আমি অন্যান্য কাজ উপেক্ষা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে উৎসর্গ করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ণ পরিকল্পনা ও অগ্রগতির রূপরেখা ছিল আমার দিবসের স্বপ্ন; ঘুমের মাঝেও তারা আমাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদপীঠে আমি উৎসর্গ করেছি আমার অধ্যয়ণ ও গবেষণা, সম্ভবতঃ কিছুটা আমার পরিবার ও বন্ধুবর্গের স্বার্থ এবং নিশ্চিতভাবে, দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, আমার স্বাস্থ্য ও শক্তির অনেকাখানি। প্রতিদানে যেখান থেকে সহানুভূতি দাবী করার অধিকার আছে এবং যেখান থেকে তা পাওয়ার আশায় নিশ্চিত ছিলাম, তা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।]

৫. Convocation Address, 1914.

আশুতোষের শিক্ষাপ্রীতি দেশপ্রেমের নামান্তর

প্রশ্ন উঠতে পারে, এই অমানুষী ত্যাগ তিতিক্ষার পেছনে কোন্ মহৎ প্রেরণা আশুতোষকে উল্কার মতো ছুটিয়েছিল। কিসের আশায়, কিসের নেশায়, তিনি প্রায় মরীচিকার পেছনে ছুটে দেশবাসীর জন্য সুপেয় জলের ব্যবস্থা করে গেছেন্; সমস্ত বাধা প্রতিবন্ধকতাকে দুপায়ে মাড়িয়ে গুঁড়িয়ে তিনি তাঁর অভীষ্টে পৌঁছেছিলেন। তাঁর সেই অভীষ্ট ছিল এ দেশে 'মানুষ' তৈরী করা। শুধু বিদ্যাশিক্ষার প্রসার নয়—তাঁর মুখ্য চিন্তা ছিল সেই শিক্ষা পেয়ে ঘরে ঘরে যেন মানুষ তৈরী হয়। তাঁর 'মনের মানুষ' কেমন হবে সে প্রশ্ন বিবেচনার আগে তিনি মানুষটি কেমন ছিলেন, কেমনই বা তাঁর ব্যক্তি-মানস সে সম্পর্কে সামান্য আলোচনা প্রয়োজন। তা না হলে যে শিক্ষার জন্য তিনি জীবনপাত করেছেন সেই শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যাবে না।

আশুতোষের মূলমন্ত্র ছিল: "সকল পদার্থেরই অনুভূতি চাই, সমস্ত বিষয়েই মগ্ন হওয়া চাই—প্রাণ অকৃপণ ভাবে ঢালিয়া দেওয়া চাই, অন্যথা সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত।"

আশুতোষ এই মন্ত্র শুধু যন্ত্রের মতো জপ করেন নি। এই 'মন্ত্রের সাধনের জন্য' শরীর পাতন করেছেন। "উচ্চ আদর্শের সঙ্গে কর্মকুশলতা প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু স্যার আশুতোষের ভিতর উভয় গুণের অপূর্ব সমাবেশ ছিল। তিনি যে পরিমাণে আদর্শময় ছিলেন, ঠিক সেই পরিমাণেই তিনি কর্মকুশল ও ভয়ানক practical ছিলেন।" তাঁর এই কর্মবহুলতার পরিচয় তিনি নিজেই দিয়েছেন—নিজের কথায় নয়, কবির কাব্য ভাষায়। ১৯২২খ্রীঃ মার্চ মাসের সমাবর্তন ভাষণে তিনি রবীন্দ্রনাথের 'নৈবেদ্য' কাব্যগ্রন্থ থেকে 'প্রার্থনা' কবিতাটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করেন। এবং সে সঙ্গে তার ইংরেজি তর্জমাও পাঠ করেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের দেশ, স্বপ্নের ভারতের পরিকল্পনা করেছিলেন বিশ্বকবির ভাষায় ও ভাবনায়—

"Tell me not that the task of (such) regeneration of our people through the path of education is supremely difficult of achievement, for unalterable is my faith in the lesson taught by my preceptors in the stirring words of the poet :

"If thou canst plan a noble deed,
And never flag till it succeed,
Though in the strife thy heart must bleed :
Whatever obstacles control,
Thine hour will come. Go on true soul,
Thou'lt win the prize, thou'lt reach the goal."

I call upon you to take this as your motto and to join with me in a fervent prayer for the well-being of our motherland in the words of the message of our great national poet, Rabindra Nath Tagore :

চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির,
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গনতলে দিবস শর্ব্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি',
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হতে
উচ্ছ্বসিয়া উঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্ম্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় ;
যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
পৌরুষেরে করেনি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব্ব কর্ম্ম চিন্তা আনন্দের নেতা,—
নিজ হস্তে নির্দ্দয় আঘাত করি' পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত।

"Where the mind is without fear and the head is held high :
Where knowledge is free ;
Where the world has not been broken up into
fragments by narrow domestic walls :
Where words come out from the depth of truth :
Where tireless striving stretches its arms
towards perfection :
Where the clear stream of reason has not lost
its way into the dreary desert sand of dead habit :

Where the mind is led forward by Thee into
ever- widening thought and action—
Into that heaven of freedom, my Father,
let my country awake !"[৬]

আশুতোষের বক্তব্যের সারমর্ম এই যে, দেশের মঙ্গলচিন্তা করলেই ধর্মভাব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি হতে পারে। এই দেশ জলমাটি নিয়ে গঠিত ভূ-খণ্ড মাত্র নয়, সেই ভূ-খণ্ডের মানব সন্তানগণই তার সকল রকম কর্মস্পৃহার উৎসস্থল। চণ্ডীদাসের 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই', কিংবা বিবেকানন্দের 'বহুরূপে তোমার সম্মুখে ছাড়ি, কোথায় খুঁজিছ ঈশ্বর'—এ সকল মহাজন-বাণীর কার্যে রূপদানের ভারই যেন নিয়েছিলেন আশুতোষ। তাঁর ব্রত ছিল মানুষকে মানুষ করে তোলা। এবং তার মধ্য দিয়ে দেশের সেবা করা। এই দেশসেবা ব্রত নিজে তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেননি কেবল, এ ছিল যেন আজন্ম আশৈশব তাঁর স্বপ্ন ও সাধনা। জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি সেই সেবার ভার বহন করবার শক্তি কামনা করেছেন দেশ-জননীর কাছে—ইংরাজ কবির কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে—

"I call upon you, Fellow Graduates, to join with me, in the words of the warrior poet, in a solemn pledge of eternal devotion to the Spirit of our Motherland, the protecting divinity of our Alma Mater,

"I vow to thee, my country—
all earthly things above—
Entire and whole and perfect,
the service of my love —
The love that asks no question ;
the love that stands the test,
That lays upon the altar
the dearest and the best ;
The love that never falters,
the love that pays the price,
The love that makes undaunted
the final sacrifice."[৭]

—Sir Cecil Spring-rise

৬. Convocation Address, 1922

৭. Convocation Address, 1923,

"স্বদেশ আমার! তোমার সেবায় এ ব্রত লইনু আজি
পূজিতে তোমারে আনিব খুঁজিয়া ধরণীর ধনরাজি।
তুমি যদি চাও প্রাণ প্রিয়ধন—দ্বিধা না জাগিবে মনে,
শুধাব না কথা, প্রফুল্ল বদনে এনে দেব ও চরণে।
আমার প্রাণের প্রীতি হবে দেবী। তব পূজা উপচার
অবাধে সকলি সঁপিয়া তোমায় লইব সেবার ভার।"

নিজেকে যেমন আশুতোষ দেশমাতৃকার সেবায় উৎসর্গ করেছেন তেমনি দেশের সকল সন্তান-সন্ততিকে মায়ের পূজার উপযুক্ত করে তুলতে অনলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। দেশে প্রকৃত মানুষের অভাব অনেক দিন থেকেই অনুভূত হয়েছে। তা না হলে সর্বক্ষেত্রে কেন এমন শোচনীয় অবনতি ও পশ্চাৎগামী অবস্থা? কেন কবি আক্ষেপ করে গেয়েছেন—

"ভারত আমার, জননী আমার,
ধাত্রী আমার, আমার দেশ,
কেন গো মা তোর শুষ্ক নয়ন,
কেন গো মা তোর মলিন বেশ।"

কারণ তো আর কিছুই নয়, সত্যিকার খাঁটি মানুষের অভাব। দেশে মানুষ নাই আছে দ্বিপদবিশিষ্ট জীব; লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি। মাতৃপূজার অনুপযুক্ত। প্রকৃত মানুষের অভাব অনুভব করেই না, চারণ কবি আক্ষেপোক্তি করেছেন—

"ভাইরে মানুষ নাই রে দেশে,
ভাইরে মানুষ নাই রে দেশে।"

এই মানুষ গড়ার বিশ্বকর্মা হলেন আশুতোষ। "শিক্ষা-শিক্ষা-শিক্ষাই ছিল তাঁর মূলমন্ত্র। কেমন করিয়া আমাদের দেশের সর্বত্র জ্ঞান-বিস্তার হয়, সুদূর পল্লীর নিভৃত কুটীরের দীন কৃষক" শিক্ষালাভ করে, ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র সাধনা।" (দীনেশচন্দ্র সেন) তিনি বলেছেন- "আমি চাই শিক্ষা ছড়িয়ে পড়ুক, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় পাশ করেনি, বাংলাদেশে এমন কেউ যেন না থাকে। আমাদের দেশের ঘরে ঘরে, পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা বিস্তার করতে হবে।"

(আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন)

"শিক্ষা বিস্তার করতে হবে,—এই চিন্তা বড় সহজ চিন্তা নয়, তিনি স্বপ্নবিলাসী হতে পারেন, কল্পনাবিলাসী হতে পারেন, কিন্তু তিনি অলস কল্পনাবিলাসী ছিলেন না। অল্প সংখ্যক লোকই ধারণা করতে পারেন আশুতোষের অন্তরের অন্তঃস্থলে কি বিস্তর কল্পনা লুক্কায়িত ছিল। অবশ্যই তাঁহার গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনা এবং তাঁহার আইনসম্পর্কীয় কাজকর্ম তাঁহাকে জীবনের স্থূল সত্যেরই সম্মুখীন করিয়াছে, অধিকন্তু উহা তাঁহাকে অলস কল্পনা পোষণ করিতে বড় একটা উৎসাহিত করে নাই।"[৮]

পিতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ বলেছেন—

"তাঁহার ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য দুই ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে—একদিকে তিনি ছিলেন কর্মবীর, অপরদিকে ভাবপ্রবণ ও কল্পনাশীল। যাঁহারা স্থূলদর্শী তাঁহাদের নিকট আশুতোষ প্রচণ্ড ও অফুরন্ত কর্মশক্তির একটি আবাস স্বরূপ, কিন্তু অতি অল্প লোকেই জানিতেন যে তিনি স্বপ্ন-রাজ্যের লোক এবং এক সুমহান স্বপ্নদ্রষ্টা। ···কিন্তু আশুতোষ বাস্তব রাজ্যের সম্পর্ক বিরহিত বৃথা কল্পনাশীলতার পরিচয় দিতেন না। রবীন্দ্রনাথ আশুতোষ সম্পর্কে বলিয়াছেন—তিনি যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংস্কারক্ষেত্রে যুঝিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন—তাঁহার স্বক্ষমতার উপর—এতটা প্রত্যয় ছিল যে, তিনি বিজয়ী হইবেন, ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন,—তাঁহার সঙ্কল্পগুলি কৃতকার্যতার পথস্বরূপ ছিল।"[৯]

শ্যামাপ্রসাদ আরো লিখেছেন—"তাঁহার ধারণায় মানুষই কর্তা,—সে অবস্থার দাস নহে।" যাঁহারা তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়াছেন, তাঁহারাই বুঝিয়াছেন, তিনি গঠনকারী একটি বিরাট প্রতিভা, তিনি ভাগ্যের স্রষ্টা, এবং জাতি ও সমাজের ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। —যে লোক একান্ত ভাব-দরিদ্র, আক্ষেপশীল ও সর্বদা নতশির; নিজের দুর্বলতা ঢাকিবার জন্য যাহারা অদৃষ্টবাদ অথবা দার্শনিক উপেক্ষার ভান করে, সেই সকল লোককে আশুতোষ অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি তাঁহার মৃতকল্প দেশবাসীর অসার দেহ মৃতসঞ্জীবনী অমৃতদ্বারা উজ্জীবিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন।"[১০]

---

৮. বিপিনচন্দ্র পাল (Character Sketches থেকে অনূদিত)

৯. ১০. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ('Representative Indians' থেকে অনূদিত)

এই সঞ্জীবনী অমৃত আর কিছু নয়—শিক্ষা। "আশুতোষ শিক্ষা বিষয়ে বাস্তবিকই ছিলেন যাকে ইংরেজীতে বলে—"A Century ahead of his time" তিনি জানিতেন যে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু প্রয়োজনবাদ নয়—সর্বাঙ্গীন মনুষ্যত্ব। মনুষ্যত্বলাভ না হলে মনুষ্যত্বের প্রয়োজনীয়তা কিছুতেই উপলব্ধি করা যায় না। আশুতোষ একজন খাঁটি ও সত্যকার মানুষ ছিলেন, তাই তিনি মনুষ্যত্ব ও উচ্চ শিক্ষার মূল্য বুঝতেন।"[১১]

শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি

সুতরাং আশুতোষের মতে মনুষ্যত্ব অর্জনই শিক্ষার উদ্দেশ্য। পরীক্ষা পাশই শিক্ষার উদ্দেশ্য নয়। যে শিক্ষায় মানুষের আত্মবিকাশ লাভ করে, হৃদয়ের মার্জনা করে, অমানুষকে মানুষ করে তাই প্রকৃত শিক্ষা। ঘরে ঘরে সেই মানুষ তৈরীর স্বপ্নই দেখতেন আশুতোষ। শিক্ষার উদ্দেশ্য ও ফলশ্রুতি ব্যক্ত করে তিনি বলেছেন—

"কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থগত শিক্ষাই শিক্ষা নহে, একটি সম্পূর্ণ মানুষ হইতে হইলে অনেক অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, অনেক অগ্নিপরীক্ষার প্রয়োজন। কেবল অর্থোপার্জনের জন্যও শিক্ষা নহে, শিক্ষার উদ্দেশ্য—আত্মবিকাশ লাভকরা, হৃদয়ের মার্জনা করা, দর্পণের ন্যায় বিশ্বের প্রতিবিম্ব গ্রহণে হৃদয়কে সমর্থন করা। এইভাবে যদি একবার মানুষ তৈরী হইয়া উঠে, ক্রমে একটা জাতি তৈরী হইয়া উঠে, তবে সেই জাতিকে আর পয়সার জন্য লালায়িত বা গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহের জন্য ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। ঐ প্রকারের গঠিত জাতির কোন স্পৃহাই অপরিপূর্ণ থাকে না। অর্থ তো কোন্ ছার! সুতরাং সর্বাগ্রে চাই সমাজের প্রাণে আকাঙ্ক্ষার উদ্রেক করা। যা কিছু কষ্ট বা পরিশ্রম, ঐ প্রথমাবস্থাতেই, পরে একবার আকাঙ্ক্ষা জন্মিলে ঐ জাতি আপনিই আপনার লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হয়।"[১২]

আর শিক্ষার ফলশ্রুতি বলতে তিনি বুঝতেন মনুষ্য জীবনে চরিত্রে কতকগুলি মহৎ গুণের সমাবেশ। কেবলমাত্র পরীক্ষা পাস ও অর্থোপার্জনই যে শিক্ষার ফলশ্রুতি নয়, তাও তিনি পরিষ্কারভাবে বলেছেন—

---

১১. দিলীপকুমার রায় (বঙ্গবাণী, আষাঢ়. ১৩৩১)

১২. বঙ্গ সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জাতীয় সাহিত্য)

"দয়া, সমবেদনা, পরদুঃখকাতরতা, সত্যপ্রিয়তা, বিনীতভাব প্রভৃতি স্বর্গীয় সম্পদে হৃদয়কে সম্পন্ন করিতে পারিলেই প্রকৃতপক্ষে শিক্ষার ফল ফলিয়াছে বলা যাইতে পারে। অন্যথা কেবল পরীক্ষায় কৃতকার্যতাকেই শিক্ষার চরম ফলশ্রুতি বলিতে পারি না।"[১৩]

আশুতোষের এই সব বক্তব্য ও বক্তৃতার মূল সুর হল গভীর স্বদেশপ্রীতি। তিনি যে কত বড় স্বদেশভক্ত জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাঁর পরিচয় এসব ভাষণের ছত্রে ছত্রে ফুটে উঠেছে। অশনবসনে, আলাপ আচরণে, তাঁর স্বাজাত্যবোধ এতই প্রবল ছিল যে, ১৯০৭ সালে প্রথম সমাবর্তন ভাষণেই তিনি নবদীক্ষিত স্নাতকদের আহ্বান করে বলেছিলেন—তোমরা ইংরেজ সমাজ ও ইংরাজি শিক্ষার গুণগুলি অকৃপণভাবে আহরণ কর, তাতে দোষের কিছু নেই ; কিন্তু "..never denationalise yourselves"—নিজেদের কখনো বিজাতীয় ভাবাপন্ন করো না। সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি নিয়ে গৌরব বোধ করো।

আশুতোষের আশা

আশুতোষ কথিত এই সকল গুণে যাঁরা গুণান্বিত তাঁরাই কেবল দেশের হিতে আত্মোৎসর্গ করতে পারেন। দেশকে বিদেশী শাসন মুক্ত করতে, ষড়ৈশ্বর্যে বিভূষিত করতে তেমন ছেলে তৈরী করতে হবে, যারা—

"কথায় না বড় হয়ে, কাজে বড় হবে।"

বাক্‌সর্বস্ব বাঙালী জাতিকে আশুতোষ ছাড়া কে এত বড় কথা বলতে পারে ? তিনি দেশ ও জাতির প্রতি কর্তব্য পালন করতে ছাত্র ও যুবশ্রেণীকে বার বার আহ্বান করেছেন। সবাই সেই জাতীয় কর্তব্য পালন করলে তবেই—

"ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"

সমাবর্তন উৎসবে তিনি গভীর আস্থা ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন—

"আমার অন্তরে এই দৃঢ় নিশ্চয়তা রহিয়াছে যে বর্তমান যুগের মানসিকতার বিবর্তনে যে সকল দেশ যথার্থই নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছে, তাহার পুরোভাগে আবার ভারতবর্ষ তাহার মহত্তর প্রতিভাদীপ্ত ধারা লইয়া এবং অতীত যুগের

১৩. জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি—আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (জাতীয় সাহিত্য)

জ্ঞান ও শিক্ষার একটি সুনির্দিষ্ট কেন্দ্রের অধিকারী হিসাবে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে ; ইহা শুধু আশা নয়, ইহা অবশ্যই হইবে।"[১৪]

বিচারপতির উচ্চ আসনে বসে তিনি দেশমাতৃকার সেবাসুখে বঞ্চিত ছিলেন ঠিক ; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়কেই তিনি দেশমাতৃকার প্রতিভূ মনে করতেন ; এবং বিশ্ববিদ্যালয়কে সেবার মাধ্যমে দেশসেবার আনন্দ তৃপ্তি ও গৌরব অনুভব করতেন। তিনি তাঁর হৃদয়ের সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা প্রীতিভক্তি ভালবাসা অনুরাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাদমূলে অঞ্জলি দান করেছিলেন ; সেই মহাপূজায় তাঁর সঙ্গে সামিল হতে সমস্ত বঙ্গবাসীকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন—

"People of Bengal, you have at your doors, the foundations already laid of a great University, a University devoted to the advancement of Literature, Science and Art, to the promotion of Letters as the record of the achievements of the human spirit, to the promotion of Science as the revealer of the laws and the conqueror of the forces of Nature, to the promotion of Art as the sunshine and gilding of life, but more than all this, to the investigation of the glorious past of India and the fundamental unity, amidst apparent diversity, of the varied aspects of Indian civilisation which is so deeply calculated to rouse and purify true national instinct and national pride. You have at your doors a society of scholars in whose company your children, your children's children and their children may spend formative years of their aspiring youth under the captivating influences of human Letters and Pure and Applied Science, pursuing culture with forward-looking minds and far-seeing spirit. It is for you, People of Bengal, to determine whether you will make this University a national asset. We invite every citizen, conscious of his duty and responsibility, unmoved by ignorant and prejudiced criticism, to come forward to be united with us in feeling, in purpose, for the realisation of our vision of duty and of service. It has ever been our ambition to bring the University in

১৪. সমাবর্তন ভাষণ, ১৯১৩ (অনূদিত)

intimate touch with the Nation, because of the supreme part that it must play in the national consciousness, pointing out by its attitude towards the things of life, through the whole wide range of human intelligence, the true direction of national safety and national progress. The University should thus be alive and progressive, not a passive and inactive force in the life of the community of which it is not only a part but a participant. The University would be dead to the nation, if it were made to stand on a height of its own, isolated from the community. On the other hand, if the activities of the University were more and more assimilated with the life of the Nation, it might then be even more determinate as a teacher, and more dominant as a leader than it has ever been before."[১৪]

এই আহ্বান পেশাদারী রাজনীতিজ্ঞের (Politician) নয়; এ আহ্বান ভবিষ্যৎ বংশধরদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভবিষ্যৎদ্রষ্টা রাজনীতিবিদের (Statesman)। জাতীয় জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থান সম্পর্কে এমন অমোঘ উক্তি এযাবত কারও মুখে শোনা যায়নি।

আশুতোষের সমগ্র চিন্তা ও কর্মের বীজ নিহিত ছিল প্রগাঢ় দেশপ্রেমে, দেশাত্মবোধে এবং দেশহিতৈষণায়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের ভাষায়—"His heart was with the nation"—তাঁর হৃদয় জুড়ে ছিল জাতির মঙ্গলচিন্তা। তাঁর জীবনীকারদের কারও মতে আশুতোষ ছিলেন পরম মাতৃভক্ত; কেউ মনে করেন তিনি ভীষণ অঙ্কের ভক্ত; অন্য কেউ সাক্ষ্য দেন তিনি সাংঘাতিক সন্দেশ ভক্ত; নিন্দুকেরা বলেন তিনি ব্রিটিশ ভক্ত। তাঁর মাতৃভক্তি, অঙ্কানুরক্তি এবং সন্দেশাসক্তি সুবিদিত, সন্দেহাতীত এবং প্রশ্নাতীত; কিন্তু তাঁকে রাজভক্ত বলে অভিযুক্ত করা নিতান্তই অনৃত ভাষণ। তাঁর মতো এমন নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী, স্বদেশ ভক্ত এদেশে কয়জন মেলে? আত্মসম্মানবোধ, স্বদেশানুরাগ এবং জাতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতিপ্রীতি তাঁর ধমনীতে নিত্য প্রবাহিত হতো বলেই মুখোশধারী জাতীয় নেতাদের লক্ষ্য করে তিনি সদম্ভে বলতে পেরেছিলেন—

"It is your national leaders, the Swadeshiwalas of today who dare not appear in public in the streets of Simla or Darjeeling or even in Calcutta with their dhoti and slippers on for fear lest they should be observed by their foreign

১৪. C. U. Convocation Address, 1913

acquaintances, but I the son of a Brahmin have not in my life, felt ashamed to expose my sacred thread to the gaze of the foreigners. Cowards at heart as these leaders are, how can they command respect from foreigners or emancipate the mind of Young Bengal or inculcate in young minds the spirit of independence and equality with the ruling race ?"

বিদ্যাসাগরের ধুতি-চটির দম্ভের সঙ্গেই আশুতোষের ধুতি-পৈতের এই গর্ব তুলনীয়।

অধ্যাপক ই. এফ. ওটেন (বাংলার ডি. পি. আই এবং প্রেসিডেন্সী কলেজে 'সুভাষ-ওটেন' ঘটনার নায়ক) আশুতোষ সম্পর্কে বলেছেন—"Sir Asutosh Mookerjee, the Vice-Chancellor walking like a Colossus among petty men." এই পুরুষসিংহের বিশাল বক্ষ জুড়ে ছিল দেশপ্রেমের ফল্গুধারা। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে তা রূপ পরিগ্রহ করে। রাজনীতিকেই তিনি দেশপ্রেমের একমাত্র মাপকাঠি মনে করেন নি। তাই অসহযোগ আন্দোলনের সময় যে সব ছাত্র জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ার অত্যুৎসাহে বিশ্ববিদ্যালয়কে 'গোলামখানা' আখ্যা দিয়ে ত্যাগ করতে উদ্যত হয়েছিল, তাদের তিনি ঐতিহাসিক সিনেট হলের দরজায় দাঁড়িয়ে বলেছিলেন—

"You want a Swadeshi University. Is not Calcutta University your University ? The Senate and the Syndicate are in the hands of the Bengalees. It is fostered by the donations of the sons of Bengal, Everyone is in national dress. There is no foreign influence here. Should you insult this noble patriotism, this generous self-sacrifice" (তোমরা চাও স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কি তোমাদের বিশ্ববিদ্যালয় নয় ? এর সিনেট-সিণ্ডিকেট বাঙ্গালীর হাতে। বাংলার সন্তানদের আর্থিক দানে এরা পুষ্ট। প্রত্যেকেই এখানে নিজেদের জাতীয় পোষাক পরে। কোনো বিদেশী প্রভাব তো এখানে নেই। এই মহান দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গকে তোমরা অপমান করবে ?)

আশুতোষের আহরিত বন্ধুদের অন্যতম অধ্যাপক শিশিরকুমার মৈত্র লিখেছেন—"স্যার আশুতোষ কথা প্রসঙ্গে আমাকে বলেছিলেন—'My religion is my country'—আমার দেশই আমার ধর্ম।" সত্যিই আশুতোষের জীবনে ও কর্মে মাতৃভক্তি, মাতৃভূমিভক্তি এবং 'Alma Mater' -ভক্তি সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তাঁর জীবনে জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি—এই ত্রিগুণের নির্যাস হল—**"বন্দে মাতরম্"**।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা

শিক্ষার মাধ্যম খণ্ড

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাপ্রসারে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

প্রাক্-বিদ্যাসাগর পর্ব

শাসকের ভাষা : শাসিতের ভাষা—রাজা বদল : রাজভাষা ইংরেজি—ইংরেজি শেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য—বেন্টিঙ্ক-মেকলে যোগসাজসে ইংরেজি শিক্ষার পাকা ব্যবস্থা—দেশীয় ভাষার জন্য সান্ত্বনা বাক্য : বাংলা ভাষার জন্য আশাবাণী—ইংরেজি শিক্ষায় লাভবান কারা—বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিরূপতা : সংবাদ প্রভাকরের ক্ষোভ—মাতৃভাষা জননীর স্তনদুগ্ধ : রাজনারায়ণ বসু—সেকালের বাংলা সাহিত্য—পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃ ভাষার স্বীকৃতির প্রশ্নে বিভিন্নস্তরে আলোচনা।

* * * *

এ পর্যন্ত গেল আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা এবং সেই চিন্তাকে বাস্তবায়িত করতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের কেন্দ্র থেকে বিশ্ববিদ্যার অধ্যাপনা ও গবেষণার কেন্দ্ররূপে রূপান্তরের সংক্ষিপ্ত কাহিনী। এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে আশুতোষের দ্বিতীয় চিরস্থায়ী কীর্তি—মাতৃভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষা ব্যবস্থা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রসারে আমৃত্যু সংগ্রাম—যা তাঁর শিক্ষাচিন্তার অন্যতম লক্ষণ ও লক্ষ্য এবং সে লক্ষ্য পূরণে তাঁর নেতৃত্বাধীন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবময় ভূমিকার কথা। তবে মূল বক্তব্যে প্রবেশের আগে, এতদঞ্চলে শিক্ষাঙ্গনে পাঠ্যবিষয় হিসেবে মাতৃভাষার কুণ্ঠিত পদক্ষেপ, এবং শিক্ষার বাহন হিসেবে মাতৃভাষার স্বীকৃতি আদায়ে মাতৃভাষানুরাগীদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ইতিহাস অবশ্যই স্মর্তব্য।

বাঙালী ও অন্যান্য ভাষাভাষী পড়ুয়াদের বাংলাদেশের স্নায়ুকেন্দ্রে অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম যার যার মাতৃভাষা হওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু প্রথমাবধি সে সহজ স্বাভাবিক ব্যাপারটি ঘটে নি বলেই এ প্রশ্নের অবতারণা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে তো বটেই, এদেশে ইংরেজ-শাসনের পত্তনের ফলশ্রুতি হিসেবে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের সূচনা থেকেই শিক্ষার বাহন কি হবে, এ প্রশ্ন শাসক ও শাসিত উভয় শ্রেণীর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলেছিল। এবং বিষয়টি যেহেতু জটিল, জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ও স্পর্শকাতর, সে কারণে আজো তা মানুষকে ভাবায়, আলোড়িত উত্তেজিত করে।

হস্তলিখিত পুঁথির ভাষাও লিপিকরণের সম্ভাব্য কালের নিরিখে বাংলা সাহিত্যের প্রামাণ্য বয়স প্রায় হাজার বছর হতে চলেছে। এর মধ্যে কত রাজা-রাজত্ব, কত নবাব-নবাবী, কত লাট-লাটশাহী এলো গেলো, কিন্তু বাংলা ভাষার কপালে কখনো রাজটীকা জোটে নি। বঙ্গভূমির বুকে হিন্দু যুগে সংস্কৃতের আধিপত্য, মুসলমানী আমলে ফার্সীর দৌরাত্ম্য এবং ইংরেজ শাসনে ইংরেজির প্রভুত্ব চলেছে। কিন্তু বাঙালীর মুখের ভাষা কখনো সরকারী স্বীকৃতি পায় নি। অথচ রাজানুকূল্য সত্ত্বেও উপরোক্ত কোন রাজভাষাই সাধারণের মাঝে ব্যাপক প্রসার লাভ করে নি। বরং বহিরাগত রাজকীয় ভাষা আয়ত্ব করা সাধারণের পক্ষে কেমন দুরুহ, তার সাক্ষ্য রয়েছে বহুল প্রচারিত লোকবুলিতে—

মোগল পাঠান হদ্দ হ'ল
ফার্সী পড়ে তাঁতী।

শাসকের ভাষা ঃ শাসিতের ভাষা

এদেশে ইংরেজ শাসনের পূর্বে সরকারী কাজকর্মের সঙ্গে সাধারণ মানুষের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল খুবই ক্ষীণ। রাজ-দরবার বা রাজকার্যের সঙ্গে সরাসরি জড়িত ব্যক্তিরা ছাড়া আপামর জনসাধারণের মধ্যে রাষ্ট্রভাষা শেখার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ যেমন ছিল না, তেমন কোন সর্বজনীন ব্যবস্থাও ছিল না। সরকারী স্বীকৃতি সত্ত্বেও সংস্কৃত যেমন জনগণের ভাষা হয়ে ওঠে নি, ফার্সীও তেমনি আমজনতার বাতচিতের মাধ্যমে পরিণত হয় নি ; যেমন পরবর্তীকালে ইংরেজি হয় নি।

সংস্কৃতের প্রাধান্যের যুগে পালি, ফার্সীর প্রতাপের কালে হিন্দী এবং হিন্দুস্থানী তথা উর্দু ছিল উত্তর ভারতের ভাষা। আর বাংলাদেশে ছিল আঞ্চলিক বাংলাভাষার একাধিপত্য। সংস্কৃত শিখে মুষ্টিমেয় ব্রাহ্মণ হয়েছে পণ্ডিত-আচার্য, আরবি-ফার্সীতে এলেমদার হয়ে স্বল্প সংখ্যক মুসলমান হয়েছে মুন্সী-মৌলবী, আর ইংরেজি শিখে গোণাগুণতি কিছু বাঙালী হল মাষ্টার ও মিস্টার। কিন্তু ওসব যারা না শিখেছে তারা শুধু বাঙালী হয়েই রইল। আদিকাল থেকে এদেশে হুজুরের আর মজুরের ভাষা কখনো এক ছিল না। দরবারি আর কারবারী ভাষার ব্যবধান চিরকালই বর্তমান ছিল।

রাজা বদল: রাজভাষা ইংরেজি

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরিণতি স্বরূপ বাংলাদেশের রাজনৈতিক শাসন ক্ষমতা মুসলমানদের হস্তচ্যুত এবং ইংরেজদের হস্তগত হয়।

"বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল পোহালে শর্বরী
রাজদণ্ডরূপে ॥"

ইংরেজি শেখার প্রাথমিক উদ্দেশ্য

ফলে, ১৮৩৮ সালে যখন আইন আদালতের ভাষা হিসেবে ফার্সীর স্থলে ইংরেজি বহাল হল, এবং সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজি আপন অধিকারে অধিষ্ঠিত হল, তখন দেশবাসীর মধ্যেও সেই ভাষা শেখার আগ্রহ প্রবল হয়ে ওঠে। কারণ, ইতিমধ্যে সামান্য 'yes, no, very good,' শিখেও বহুলোক অত্যল্প কালের মধ্যে টাকার কুমীর বনেছে এমন নজীর তো খুব কম নয়!

ইংরেজ শাসককুল প্রথমাবধিই ভারতবাসীর শিক্ষা ব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব গ্রহণে অসম্মত ছিল। কারণ, তাদের নিজের দেশেই তখনো সর্বজনীন শিক্ষা বলে কোনও বস্তু ছিল না। শাসন কার্যের সুবিধার্থেই তারা মুষ্টিমেয় ভারতবাসীকে সামান্য অর্থব্যয়ে কিঞ্চিৎ শিক্ষাদানে উদ্যোগী হয়। এদেশবাসীর শিক্ষাব্যবস্থার পুরো দায়িত্ব নেবার যেমন, তেমনি শিক্ষার বাহন কি হবে, তা নিয়েও সরকারী ও বে-সরকারী ইংরেজ মহল দ্বিধাবিভক্ত ছিল। স্বল্পসংখ্যক ভারতহিতৈষী শ্বেতাঙ্গপুরুষ দেশীয়

ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষপাতী হলেও, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের অভিমতই জয়লাভ করে।

বেন্টিঙ্ক-মেকলে যোগসাজসে ইংরেজি শিক্ষার পাকা ব্যবস্থা

১৮৩৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শিক্ষা কমিটির সভাপতি মিঃ টি. বি. মেকলে তাঁর সুবিখ্যাত শিক্ষাসংক্রান্ত 'মিনিটে' ইংরেজি ভাষাই যে এদেশীয় প্রজাদের পক্ষে সবচেয়ে হিতকরী সে সম্পর্কে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন —

"We shall see the strongest reason to think that of all foreign tongues, the English tongue is that which would be the most useful to our native subjects".

বেন্টিঙ্কও কাল বিলম্ব না করে মেকলের মন্তব্য লুফে নিয়ে লিখলেন —

"I give my entire concurrence to the sentiments expressed in this Minute."

এবং ভাষা প্রশ্নে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য বিতর্কের ওপর যবনিকা টেনে দিলেন। ১৮৩৩ সালে কোম্পানীর সনদে শিক্ষা খাতে বার্ষিক ব্যয় যে ১০ লক্ষ টাকা ধার্য হয়েছিল তা ইংরেজি স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্যই যে ব্যয় হবে, সে সম্পর্কে পরিষ্কার সরকারী নির্দেশ জারী হল।

১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ লর্ড বেন্টিঙ্ক তাঁর বিখ্যাত 'মিনিটে' লেখেন —

"His Lordship in Council directs that all the funds which these reforms will leave at the disposal of the Committee be henceforth employed in imparting to the native population a knowledge of English literature and Science through the medium of the English language ; and His Lordship in Council requests the Committee to submit to Government, with all expedition, a plan for the accomplishment of this purpose."[১]

অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের মধ্যে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রসারার্থে শিক্ষা বাবদ বরাদ্দ সমস্ত অর্থ এখন থেকে কেবলমাত্র ইংরেজি

১. Hundred years of the University of Calcutta, Vol. I. P. 32

শিক্ষার জন্যই ব্যয়িত হবে। বস্তুত তখন থেকেই ইংরেজির মাধ্যমে শিক্ষার নীতি সুনির্দিষ্ট রূপ নেয়। ঐ বছরেই শিক্ষা পরিষদে (Council of Education) শিক্ষা নিয়ে যে আলোচনা হয়, তাতে অর্ধেক সভা ইংরেজির পক্ষে এবং বাকি অর্ধেক সংস্কৃত ও আরবির পক্ষে মত দেন। কিন্তু কর্তার ইচ্ছায় কর্ম অনুসারে বড়লাটের মতই প্রাধান্য পায় এবং যেহেতু সংস্কৃত এবং আরবি কারো মাতৃভাষা নয়, তাই ইংরেজিই শিক্ষার বাহন হবে বলে স্থির হয়।

দেশীয় ভাষার জন্য সান্ত্বনা বাক্য ঃ বাংলা ভাষার জন্য আশাবাণী

অবশ্য এই একদেশদর্শী সিদ্ধান্তকে শিক্ষাকমিটি এক বছরের মধ্যেই পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য হন এবং মাতৃভাষা-শিক্ষার গুরুত্বকে কুণ্ঠিত স্বীকৃতি জানিয়ে বার্ষিক প্রতিবেদনে লেখেন—

> "We are deeply sensible of the importance of encouraging the cultivation of the Vernacular languages. We do not conceive that the order of the 7th March precludes us from doing this, and we have constantly acted on this construction........ We conceive the formation of a Vernacular literature to be the ultimate object to which all our efforts must be directed."[২]

এদেশের বেশীর ভাগ লোকের মনোভাবকে আমল না দিয়ে, প্রাচীন ও সমৃদ্ধ ভাষাগুলিকে আসনচ্যুত করে এবং দেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে খুঁটির জোরে বিদেশী ভাষা দেশবাসীর ওপর চাপানোর দরুণ, দেশবাসীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া অনুধাবন করে ৪ বছর পরে ১৮৩৯ সালে গভর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যাণ্ড শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রতিপাদক পত্রে ব্যক্ত করেন যে—

"যদবধি বাঙ্গলা ভাষাতে বালকদিগের শিক্ষোপযোগী উত্তম উত্তম পুস্তক সকল প্রস্তুত না হইবেক তদবধি কেবল ইংরাজি ভাষাতে শিক্ষাকর্ম সম্পাদিত হইতে থাকিবেক। যখন ঐ সকল পুস্তক প্রস্তুত হইবেক, তখন

---

২. History of Education in India, S. Nurullah and J. P. Naik.

জেলা স্কুলে আর ইংরাজিতে শিক্ষা না দিয়া বাঙ্গলাতে শিক্ষা দেওয়া যাইবেক।"৩

ইংরেজি শিক্ষায় লাভবান কারা

ইংরেজি শিক্ষাকে প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য দেওয়া এবং দেশীয় ভাষা-গুলিকে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যথাযোগ্য স্থান না দেবার বিরুদ্ধে প্রথমাবধিই পাশ্চাত্যবাদী ও প্রাচ্যবাদীদের মধ্যে পক্ষে বিপক্ষে নানা যুক্তি তর্কের অবতারণা ঘটে। চিন্তাশীল বাঙালীদের চেয়ে এদেশের হিতাকাঙ্ক্ষী অনেক সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজ পুরুষ একমাত্র ইংরেজির প্রতি অত্যধিক জোর দেবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে আসছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় বিখ্যাত পণ্ডিত উইলসন-এর বক্তব্য। তিনি বলেছেন—

"কলকাতা শহরের সম্রান্ত শ্রেণীর মধ্যে খুব বড় একটা অংশের ইংরেজদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। তাঁরা অনেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রচুর সুযোগ পেয়েছেন এবং তার পুরস্কার হিসেবে ভাল ভাল চাকরিও পেয়েছেন। কলকাতার বাইরে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ ও প্রেরণা বিশেষ কিছু ছিল না বললে চলে। ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপক কোন পরিকল্পনা এই জন্যই করা সম্ভব হয়নি, এবং করলেও তা সফল হতো কিনা বলা যায় না। আরও একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা মনে রাখা উচিত, জাতীয় সাহিত্য কেবল জাতীয় ভাষার ভিত্তির উপরেই গড়ে উঠতে পারে। জ্ঞান বিস্তার চর্চা যদি কেবল বিদেশী ভাষার গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়, তা হলে সেটা সমাজের একদল মুষ্টিমেয় লোক, যাঁদের অর্থ ও অবসর দুইই আছে, তাঁদের বিলাসের বিষয় হয়ে ওঠে। একথাও পরিষ্কার বোঝা যায় যে প্রত্যেক ভারতীয় ভাষার সঙ্গে ইংরেজি ভাষার মৌলিক পার্থক্য এত বেশী যে ইংরেজি কখনই এদেশের শিক্ষার বাহন হতে পারে না। ইংরেজির চর্চা বিশেষভাবে করা হলেও তা কেবল এদেশে সঙ্কীর্ণ শ্রেণীগত সাহিত্যের বিকাশে সাহায্য করবে, কোনদিনই জনসাহিত্যের ভিত গড়ে তুলবে না।"

উইলসনের এ বক্তব্যকে এক কথায় বলা যায় "prophetic"—দৈববাণী।

৩. সূত্র : বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ।

বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিরূপতা ঃ সংবাদ প্রভাকরের ক্ষোভ

সেকালের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ ইংরেজি শিক্ষার নামে উর্দ্ধবাহু মুক্তকচ্ছ হয়েছেন বটে, কিন্তু অনেকেই যে এই গোলে হরিবোলে যোগ দিতে পারেন নি তার প্রমাণও যথেষ্ট। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে এবং শিক্ষাকে সাধারণের আয়ত্তাধীন করতে হলে মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা করা সম্ভব। কিন্তু এক্ষেত্রে তৎকালীন নব্য শিক্ষিত বাঙালীর ভূমিকা মোটেই প্রশংসনীয় নয়। ভারতীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ-প্রভাকর'-এ কবি-সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত বেদনার সঙ্গে এই বিজাতীয় মনোভাবের সমালোচনা করে লিখেছিলেন—

> "যাঁহারা ইংরাজী বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ তাঁহাদিগের মধ্যে অত্যল্প ব্যক্তি ব্যতীত তাবতেই বঙ্গভাষার প্রতি সমাদর করেন না, ইয়ং বেঙ্গল যুবক-দলেরা স্বদেশের কল্যাণকারী বলিয়া সর্বদাই অভিমান করেন, কিন্তু সে কল্যাণ কিসে হয়? তাঁহারদিগের ভাষার শিক্ষাগুরু মহাশয়ের নিকট পরম কল্যাণীয় পর্য্যন্ত হইয়াছে কি না? তাহা সন্দেহের বিষয়, অতএব যাঁহারা স্বদেশের বিদ্যা এবং ভাষার প্রতি অনুরাগশূন্য তাঁহারদিগের মঙ্গল চেষ্টার আদিসূত্রেই দোষ পড়িতেছে।"[৪]

ইংরেজি শিক্ষার প্রতি অন্ধ মোহ মাতৃভাষার বিকাশের পথ রুদ্ধ করেছে। এই ইংরেজি শিক্ষার জন্য অকাতরে অর্থ ব্যয় করা যে বৃথা, সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদকীয় স্তম্ভে ঈশ্বর গুপ্ত ১৮৬৮ সালে তাঁর দৃঢ় অভিমত ব্যক্ত করে গেছেন—

> "এই বিস্তৃত বঙ্গরাজ্যের স্থানে স্থানে যে সকল ভিন্নভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে তত্তাবৎ উচ্ছেদ করিয়া ইংরাজী ভাষা প্রচলিত করণাভিপ্রায়ে কতিপয় বিলাতীয় ব্যক্তি বাহুল্যরূপে ইংরাজী ভাষা প্রচার নিমিত্ত রাজভাণ্ডার হইতে বিপুল বিত্ত ব্যয় করিতেছেন, কিন্তু তাঁহারদিগের ঐ দুরাশা কখনই সিদ্ধ হইবেক না, এক জাতির ভাষা পরিবর্তন করা সামান্য কার্য নহে, যুগ যুগান্তর মন্বন্তরযোগে ঐশ্বরিক কোন ঘটনার দ্বারা এই জগতের সমুদয় শোভার বিশেষ ভাবান্তর ভিন্ন ঐ কার্য নির্বাহ হয় না, কতিপয় শ্বেতকান্তি এই রাজ্যের রাজ কার্যের ভার গ্রহণ পূর্বক ঐ অসাধ্য

৪. সূত্র : বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড) ২২৪-২২২

কার্য সাধনে তৎপর হইয়া পিপিলিকার সিন্ধু সন্তরণের ন্যায় বৃথা পরিশ্রম করিতেছেন ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট একাল পর্যন্ত স্বজাতীয় ভাষার বিস্তার জন্য টাকা ব্যয় করিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষোপকার কি হইয়াছে তাহা আমরা বলিতে পারি না, ঐ টাকা যত্তপি এতদ্দেশীয় ভাষানুশীলনার্থে ব্যয় করিতেন তবে এত দিনে এই দেশের ভাষার লাবণ্য বিকীর্ণ হইত, দেশীয় ভাষার পুস্তকাদির কিছুমাত্র অভাব থাকিত না, শিক্ষকও অনেক প্রাপ্ত হওয়া যাইত,…বর্তমান অধিকারী ব্রিটিশ জাতি যত্তপি বঙ্গভাষানুশীলনের প্রতি উচিত মত যত্নানুরাগ ও অর্থ ব্যয় করিতেন তবে আমারদিগের বিশেষ উপকার হইত, দেশমধ্যে বিদ্যার আলোক বিস্তীর্ন হইয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধকাররাশি বিনাশ করিত…।"[৫]

গুপ্ত কবি শুধু গদ্যে নয়, তাঁর স্বভাবসিদ্ধ পদ্য ছড়াতেও একাধিকবার মাতৃভাষার গুণগান করেছেন ; মাতৃভাষার প্রতি দেশবাসীর বিদ্বেষ এবং তার প্রতিকারার্থে সংবাদ প্রভাকরের অসহায়তায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—

(ক) যে ভাষায় হয়ে প্রীত পরমেশ গুণ-গীত,
বৃদ্ধকালে গান কর মুখে।
মাতৃসম মাতৃভাষা পুরাবে তোমার আশা,
তুমি তার সেবা কর সুখে ॥[৬]

(খ) হায় হায় পরিতাপে পরিপূর্ণ দেশ।
দেশের ভাষার প্রতি সকলের দ্বেষ ॥
অগাধ দুঃখের জলে সদা ভাসে ভাষা।
কোন মতে নাহি তার জীবনের আশা ॥
অপমান অনাদর প্রতি ঘরে ঘরে।
কোন মতে কেহ নাহি সমাদর করে ॥

* * *

লোকের ভাষার প্রতি ভাব দেখে বাঁকা।
সমাচার পত্রে লিখে কত যাবে রাখা ॥[৭]

---

৫. সূত্র : বিনয় ঘোষ। সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র (১ম খণ্ড) ২২৪-২২৫

৬-৭. ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহ।

পরবর্তীকালে এই মনোভাবের প্রতিধ্বনি শুনতে পাই মাইকেল ও অতুল প্রসাদ সেনের গান ও কবিতায়। তার আগে নিধু বাবুর টপ পায়—

নানান দেশের নানান ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা!

মাতৃভাষা জননীর স্তন-দুগ্ধ : রাজনারায়ণ বসু

ঈশ্বর গুপ্তের মতো স্বল্প শিক্ষিত স্বভাবকবি ও সাংবাদিক শুধু নন, রাজনরায়ণ বসুর মতো বিদগ্ধ মনীষীও সেকালের আত্যন্তিক ইংরেজিয়ানার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে বলেন —

"এ দেশে পঞ্চবিংশতি বৎসরাবধি ইংরেজি ভাষার অনুশীলনী যত্নের সহিত আরম্ভ হইয়াছে, ইহাতে কি ফল লব্ধ হইল? এমত কি আশাই বা সঞ্চার হইয়াছে যে ভবিষ্যতে এদেশীয় লোক কেবল ইংলণ্ডীয় ভাষা দ্বারা জ্ঞানোপার্জনে সমর্থ হইবে?…জননীর স্তন দুগ্ধ যদ্রূপ অন্য সকল দুগ্ধ অপেক্ষা বল বৃদ্ধি করে, তদ্রূপ জন্মভূমির ভাষা অন্যসকল ভাষা অপেক্ষা মনের বীর্য প্রকাশ করে।… পরভাষার আলোচনায় মনের শক্তি স্ফূর্তি হয় না, এবং আত্মভাষার অনুশীলন বিনা কোন দেশে প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার উদয় হয় নাই।"[৮]

শুধুমাত্র কলিকাতার বিদগ্ধ সমাজ নয়, এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়—"অসংখ্য মোল্লা মৌলবী অধ্যুষিত নোয়াখালি জিলার সন্দীপ নামক সাধুরাম পল্লী নিবাসী সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি আবদুল হাকিমের ক্ষমাহীন উক্তি।" উনবিংশ শতাব্দীর ইংরেজি-বাংলা দ্বন্দ্বের মতো সপ্তদশ শতাব্দীতে ইসলাম ধর্মে নব-দীক্ষিত বাঙ্গালী মুসলমানের সামনে আরবি না বাংলা—এই ভাষা সমস্যার উদ্ভব হয়েছিল। "ক্ষোভে দুঃখে তিনি লিখেছিলেন—

যে সবে বঙ্গেতে জন্মে হিংসে বঙ্গবাণী।
সে সবার কিবা রীতি নির্ণয় না জানি॥
মাতা-পিতামহ ক্রমে বঙ্গেতে বসতি।
দেশী ভাষা উপদেশ মনে হিত অতি॥
দেশী ভাষা বিদ্যা যার মনে না যুড়ায়।
নিজ দেশ তেয়াগি কেন বিদেশে না যায়॥[৯]

---

৮. সাহিত্য সাধক চরিতমালা : রাজনারায়ণ বসু—যোগেশচন্দ্র বাগল
৯. সাহিত্য ও সংস্কৃতি (আমাদের ভাষা ও সাহিত্য) ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই

সেকালের বাংলা সাহিত্য

এই প্রসঙ্গে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অবস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে এটুকু বলা যায় যে তখনো মাইকেল মধুসূদন দত্তের মেঘনাদবধ কাব্য, দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটক এবং বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাস নিয়ে সাহিত্য ক্ষেত্রে আগমন ঘটে নি। মাইকেল ১৮৪৯ সালে মাদ্রাজে বসে 'Captive Ladie' লিখে কলম বন্ধ রেখেছেন এবং ইংরেজি না বাংলা কোন্ পথ অবলম্বনে সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হবেন সে সন্দেহ দোলায় দুলছেন। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাঠ্যপুস্তক রচনা ও অনুবাদ সাহিত্যের মাধ্যমে বাংলা ভাষার দুর্গম পথ কিছুটা সুগম করে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু ভাষায় বিদ্যাসাগরী-রীতি কি আলালী-রীতি কোন্‌টা অবলম্বিত হবে তা যেমন স্থির হয় নি, সাহিত্যে তেমনি কোনও মৌলিক সৃষ্টির লক্ষণও দেখা যায় নি। বাংলা সাহিত্যের সেকালের অবস্থা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "তৎপূর্বে (অর্থাৎ বঙ্কিমের পূর্বে) বাংলাকে কেহ শ্রদ্ধাসহকারে দেখিত না। সংস্কৃত পণ্ডিতেরা তাহাকে গ্রাম্য এবং ইংরেজী পণ্ডিতেরা তাহাকে বর্বর জ্ঞান করিতেন। বাংলা ভাষায় যে কীর্তি-অর্জন করা যাইতে পারে, সেকথা তাঁহাদের স্বপ্নের অগোচর ছিল। এই জন্যে কেবল স্ত্রীলোক ও বালকদের জন্য অনুগ্রহপূর্বক দেশীয় ভাষায় তাঁহারা সরল পাঠ্যপুস্তক রচনা করিতেন।··· ···অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত।"[১০]

বঙ্কিমের পূর্বে তো বটেই, তাঁর সময়েও বাংলা ভাষা সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষিত দেশবাসীর মনোভাব কি রকম ছিল তার পরিচয় স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রের লেখাতেই পাওয়া যায়—

> "'মাতৃসম মাতৃভাষা', সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকে বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া এ কথা বলে ? 'বাংলা বুঝিতে পারি', এ কথা স্বীকার করিতে অনেকের লজ্জা হইত। আজিও না কি কলিকাতায় এমন অনেক কৃতবিদ্য নরাধম আছে, যাহারা মাতৃভাষাকে ঘৃণা করে, যে তাহার অনুশীলন করে তাহাকেও ঘৃণা করে। এবং আপনাকে মাতৃভাষার অনুশীলনে পরাঙ্মুখ ইংরেজি

---

১০. বঙ্কিমচন্দ্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবীশ বলিয়া পরিচয় দিয়া আপনার গৌরব বৃদ্ধির চেষ্টা করে। যখন এই মহাত্মারা সমাজে আদৃত, তখন এ সমাজ ঈশ্বর গুপ্তের সমকক্ষ হইবার অনেক বিলম্ব আছে।"[১১]

পাঠ্য বিষয় ও শিক্ষার বাহন হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির আন্দোলন

আলোচনা অধিক দূর অগ্রসর হওয়ার আগে মনে রাখা দরকার যে, উচ্চশিক্ষা প্রসারের মাধ্যমরূপে স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গে আবশ্যিক পাঠ্য বিষয় হিসেবে উচ্চতর পরীক্ষায় বাংলা ভাষার পাঠ্য-তালিকাভুক্তির প্রশ্নটিও বিবেচ্য। যার পাঠ্যবিষয় হিসেবে স্বীকৃতি নেই, তার শিক্ষার মাধ্যম হবার দাবী ধোপে টেকে না। আবার, বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষাস্তরে অন্তর্ভুক্তির প্রশ্ন বিবেচনাকালে বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন মান ও মর্যাদার প্রশ্নটিও এসে পড়ে। কারণ যার জন্যে দাবী করা হচ্ছে, সেই দাবী পূরণে তার যোগ্যতা কতখানি তা অবশ্যই বিচার্য। একথা ভুললে চলবে না যে, অনুন্নত অবস্থার অজুহাতেই বাংলা ভাষার সঙ্গত দাবী সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দরবারে বার বার উপেক্ষিত হয়েছে। সেকারণেই শিক্ষার বাহন রূপে বাংলা ভাষার স্বীকৃতির সঙ্গে, অবশ্য পাঠ্য বিষয়রূপে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি—এই দু'টি প্রশ্ন পরস্পর সংশ্লিষ্ট তো বটেই, বরং শেষের প্রশ্নটিই আগে বিবেচ্য। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে পাঠ্য বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষার স্বীকৃতি অস্বীকৃতি, আধা স্বীকৃতি ও পূর্ণ স্বীকৃতির ইতিহাস যেমন দীর্ঘ, তেমনিই চমকপ্রদ। সুতরাং দু'টি বিষয়ে আলোচনাও যৌথ ভাবেই এগোবে।

১১. ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যাসাগর পর্ব ঃ স্বদেশী ভাষার পক্ষে বিদেশীগণ

বিদেশীদের বাংলা ভাষা প্রীতি—বেথুন ঃ বাংলা সাহিত্যের পরম বন্ধু—বেথুন-মধুসূদন প্রসঙ্গ—হ্যালিডে-বিদ্যাসাগর যোগাযোগ—বিদ্যাসাগরের পঞ্চশীল—মানুষ গড়ার কারিগর তৈরী—জনশিক্ষার অগ্রদূত বিদ্যাসাগর—বিদ্যাসাগর 'নোট' ও হ্যালিডে 'মিনিট'—বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা—পরীক্ষার মাধ্যম ইংরেজি।

* * * *

টোমাসন পরিকল্পনা ঃ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষায় সাফল্য

আগেই বলা হয়েছে যে ১৮৩৫ সালে লর্ড বেণ্টিঙ্ক পাদ্রী উইলিয়ম অ্যাডামকে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে মতামত দেওয়ার জন্য নিযুক্ত করেন। কিন্তু তিনি তাঁর সুচিন্তিত সুপারিশ দানের আগেই লর্ড মেকলের পরামর্শে ইংরেজিই একমাত্র শিক্ষার বাহন বলে সরকারী নীতি স্থির হয়ে যায়। অ্যাডাম যে পাঠশালাগুলির সংস্কার সাধন করে তারই উপর জাতীয় শিক্ষার সৌধ গড়ে তোলার প্রস্তাব দেন তা শিকেয় তোলা থাকে। হার্ডিঞ্জ চাকুরীর প্রলোভন দেখিয়ে ছাত্রদের ইংরেজি শিক্ষায় আকৃষ্ট করেছেন সত্য, তবু ১৮৪৪ সালে তিনি ১০১টি আদর্শ পাঠশালা স্থাপন করেন।

১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট জেমস্ টোমাসন এক সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা মারফত ঐ অঞ্চলে হিন্দি ও উর্দুকে শিক্ষার বাহন রূপে ব্যবহার করে যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করেন তা অপ্রত্যাশিত সাফল্য অর্জন করে; এবং শিক্ষাব্রতীদের মধ্যে কৌতূহলের সৃষ্টি করে। বাংলা দেশের শিক্ষা সংসদের তৎকালীন সেক্রেটারী সরকারী নির্দেশে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে টোমাসনের পরিকল্পনা সম্পর্কে সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য প্রেরিত হন এবং সে অঞ্চলে

ঘুরে এসে তাঁর রিপোর্ট পেশ করেন। বড়লাট ডালহৌসি টোমাসন পরিকল্পনার অনুরূপ কোন পরিকল্পনা বাংলাদেশেও প্রবর্তন করা উচিত বলে কোর্ট অফ ডিরেক্টরদের জানান।

বিদেশীদের বাংলা ভাষা প্রীতি

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কয়েক বছর আগেই বাংলা শিক্ষা ও বাংলা শিক্ষক তৈরীর প্রশ্ন যে মনীষীর চিন্তা জগতে সাড়া জাগিয়েছিল, এবং বাস্তব ও সুসংবদ্ধ পরিকল্পনা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন যে দূরদর্শী মহাপুরুষ, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিগত শতাব্দীর চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে যখন বিদ্যাসাগর এদেশের অন্যতম শিক্ষা-নায়করূপে সুপরিচিত, তখন এদেশের শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে উৎসাহী, এবং দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারে অনুরাগী কয়েকজন বিদেশীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা ও ঐক্যমত ঘটে। এদের মধ্যে বেথুন, হ্যালিডে, সীটনকার, বিডন প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁরা এ সম্পর্কে যে আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়েছেন, তা উল্লেখ না করলে শুধু অকৃতজ্ঞতা নয়, আলোচনাও অসম্পূর্ণ থাকবে।

বেথুন ঃ বাংলা সাহিত্যের পরমবন্ধু

প্রথমে বেথুন সাহেবের কথা। জন এলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ছিলেন "উদারচেতা ভারতহিতৈষী, স্কুল কলেজের প্রতিষ্ঠাতারূপে সমধিক প্রসিদ্ধ। শিক্ষা সমাজের (Council of Education) সভাপতিরূপে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারে বিশেষতঃ বাংলা শিক্ষার উন্নতি প্রচেষ্টায় তাঁহার কৃতিত্ব ও আমাদের স্মরণীয়। তিনি হিন্দু কলেজ, কৃষ্ণনগর কলেজ এবং ঢাকা কলেজের বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণী সভায় বক্তৃতাকালে ছাত্রদের বাংলা সাহিত্য অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ জোরের সঙ্গেই বলতেন, তাঁহারাও ইহার দ্বারা কম উদ্বুদ্ধ হইতেন না। বেথুন স্বয়ং উৎকৃষ্ট বাংলা রচনার জন্য শিক্ষা-সমাজের মারফৎ নিজ অর্থে একটি স্বুবর্ণ পদক দানেরও ব্যবস্থা করেছিলেন (১৮৪৮-৪৯)। ১৮৩৯ সালে কৃষ্ণনগর কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ সভায় বলেন"—

> কলিকাতার যে সকল যুবা ব্যক্তি ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য রচনা করিয়া শ্লাঘাপূর্বক আমার নিকট আনয়ন করেন, আমি তাহাদিগকে

করেও পরিমার্জিত দেশীয় বাংলা ভাষায় কোন ভাবই প্রকাশ করতে পারবেন না।

৫। তাহলে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের যদি ইংরেজি সাহিত্য ভালভাবে শিক্ষা দেওয়া যায়, তা হলে তারাই একমাত্র সুসমৃদ্ধ বাংলা সাহিত্যের সুদক্ষ ও শক্তিশালী রচয়িতা হতে পারবে।"[৪]

এই পরিকল্পনাটি শিক্ষা সমাজের সদস্য ফ্রেডারিক জে, হ্যালিডে নিজের মন্তব্যসহ শিক্ষা-সমাজে পাঠিয়েছিলেন। এবং সরকারী অনুমোদন প্রাপ্তির পর তার অনেকটাই বিদ্যাসাগর কাজে রূপায়িত করেন।

মানুষ গড়ার কারিগর তৈরী

সংস্কৃত কলেজের পাশেই হিন্দু কলেজ—কালা সাহেব তৈরীর কারখানা। সরকারী কলেজের অধ্যক্ষ হিসেবে বিদ্যাসাগরের কর্তব্য ছিল সাহেবদের ইচ্ছানুসারে সংস্কৃত কলেজকে বড় টোলে পরিণত করা এবং তার থেকে বছর বছর টুলো পণ্ডিত বের করা। তিনি তা না করে কলেজকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার সমন্বয়-কেন্দ্র রূপে গড়ে তুলতে প্রয়াসী হলেন। সংস্কৃত কলেজ থেকে বাংলা ভাষায় পরিপূর্ণ দক্ষতা সম্পন্ন ছেলেরা বেরিয়ে আসবে এই তাঁর মনোগত অভিপ্রায়—

"That the students of Sanskrit College will be perfect masters of the Bengali language is beyond any possible doubt."[৫]

অশিক্ষা অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন পরাধীন দেশে যারা শিক্ষার আলো পেয়েছে, তারা সে আলো অজ্ঞানান্ধ কুসংস্কারাচ্ছন্ন দেশবাসীর মধ্যে বিকিরণে সহায়তা করবে, তাই তো শিক্ষাবিদ দেশপ্রেমিক ও সমাজ-দরদীর আশা এবং প্রকৃত শিক্ষিতের কর্তব্য। সংস্কৃত কলেজ থেকে যারা শিক্ষা সমাপনান্তে বেরিয়ে আসছে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও বৃত্তি কি হওয়া উচিত তা নির্দেশ করে বিদ্যাসাগর বলেন—

"Let us establish a number of Vernacular Schools, let us prepare a series of Vernacular class-books on useful and

৪. ৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ

instructive subject, let us raise up a band of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished."[৬]

বাংলা স্কুল প্রতিষ্ঠা, বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা এবং বাংলা পড়াবার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তোলাই যেন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের মূল কাজ। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস বাংলা ভাষায় সম্পূর্ণ অধিকারী এক দল সংস্কার মুক্ত মানুষই এই মহৎ কাজে ব্রতী হবার উপযুক্ত। সেই সব শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ধারণ করে তিনি বলেছেন—

"The qualification of these teachers should be of this nature. They should be perfect masters of their own language, possess a considerable amount of useful information and be free from the prejudices of their country."[৭]

জনশিক্ষার অগ্রদূত বিদ্যাসাগর

শিক্ষা নিয়ে বিদ্যাসাগরের এত পরিকল্পনা ও ভাবনা চিন্তার পেছনে রয়েছে বৃহত্তর সমাজের শিক্ষা সমস্যা। তিনি খোলাখুলি বলেছেন—

" ha we require is to extend the benefit of education to the mass of the people."[৮]

মাতৃভাষার মাধ্যমে "mass education" অর্থাৎ গণশিক্ষার চিন্তা এদেশবাসীর মধ্যে বোধ হয় বিদ্যাসাগরের মনেই প্রথম উঁকি দেয়।

বিদ্যাসাগর 'নোট' ও হ্যালিডে 'মিনিট'

বিদ্যাসাগর কর্তৃক বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দান পরিকল্পনা পেশের দুই বছর পরে ১৮৫৪ সালে বাংলাদেশে ছোট লাট পদের সৃষ্টি। প্রথম ছোটলাট নিযুক্ত হলেন ফ্রেডারিক জে. হ্যালিডে। তিনি চিরদিনই বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন। ছোটলাটের পদে যোগদানের দুই মাস পূর্বে বাংলা শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর অভিমত এক 'মিনিটে' ব্যক্ত করেন। তিনি তাঁর মন্তব্য রচনা করেন ১৮৫৪ সালের ১৬ই নভেম্বর। এদিকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে পরামর্শক্রমে বাংলা শিক্ষা সম্বন্ধে ১৯ অনুচ্ছেদ ব্যাপী তাঁর মতামত ১৮৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রস্তুত করেন। প্রকৃতপক্ষে হ্যালিডের

৬, ৭, ৮. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ

বিখ্যাত 'মিনিটে'র ভিত্তি ছিল বিদ্যাসাগরেরই প্রস্তুত অনুচ্ছেদ। উক্ত পরিকল্পনার ১ ও ২ নং ধারা শিক্ষা-গুরু বিদ্যাসাগরের শিক্ষা সম্পর্কে সামগ্রিক চিন্তাধারার অমূল্য ফসল—

১। বাংলা শিক্ষার বিস্তার ও সুব্যবস্থা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে দেশের জনসাধারণের কল্যাণ হবে না।

২। কেবল লিখন পঠন ও গণনা বা সরল অঙ্ক কষার মধ্যে বাংলা শিক্ষা সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। যতদূর সম্ভব বাংলা ভাষাতেই সম্পূর্ণ শিক্ষা দিতে হবে, এবং তার জন্যে ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাটিগণিত, জ্যামিতি, পদার্থবিদ্যা, নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট্র-বিজ্ঞান ও শরীর বিজ্ঞানও বাংলায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

সংস্কৃত কলেজের সংস্কার সাধনের প্রসঙ্গ ছাড়াও মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন পাঠনের যৌক্তিকতা নিয়ে এদেশে প্রকৃতপক্ষে বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করেন।

এই পটভূমিতে ১৮৫৭ খ্রী: ২৪শে জানুয়ারী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্যই ইউরোপীয় ধাঁচের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হয়। আর, প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত পরীক্ষার মাধ্যম যে ইংরেজিই হবে তা বলাই বাহুল্য।

বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষা—পরীক্ষার মাধ্যম : ইংরেজি

এদেশে শিক্ষার মাধ্যম যে শুধুমাত্র ইংরেজি হবে তা তো আগেই পাকাপাকি ভাবে স্থির হয়ে আছে। এখন পরীক্ষা ক্ষেত্রে তার কার্যকরী প্রয়োগের ব্যবস্থা। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সম্পর্কীয় বিধির ১৩ নং ধারায় (অবশ্যই 'Unlucky Thirteen' অর্থাৎ দুর্ভাগ্যসূচক ১৩ বলা যায়) পরিষ্কার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে—

"13. English shall be the medium of examination in all subjects except where otherwise specifically indicated."

তৃতীয় অধ্যায়

নব-প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

শিক্ষাক্রমে বাংলা সাহিত্য : প্রথম বাংলা প্রশ্ন পত্র—প্রথম সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষার উপর গুরুত্বদান—বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মোহভঙ্গের সূচনা।

*　　　*　　　*　　　*

১৮৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম এণ্ট্রান্স ও ১৮৫৮ সালে প্রথম বি. এ. পরীক্ষায় হিন্দী, উর্দু, উড়িয়া সহ বাংলা 'Vernacular Subject' (দেশীয় ভাষা বা মাতৃভাষা) হিসেবে 'Second Language' বা দ্বিতীয় অবশ্য পাঠ্য ভাষার মর্যাদা পেল। ১৮৬২ সালে First Arts পরীক্ষা প্রচলিত হলে তাতেও বাংলা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পাঠক্রমে স্থান পেল। কিন্তু পাঠ্য বিষয়ের স্বীকৃতি পেলে কি হবে, উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তক কোথায় ? ১৮৫৬ সালের এণ্ট্রান্স এবং ১৮৫৮ সালের বি. এ. পরীক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তক তালিকা থেকে বাংলা সাহিত্যের দৈন্যদশা প্রকট হবে। ১৮৫৭/৫৮ সালে এণ্ট্রান্সস্তরে পাঠ্য ছিল—

১। কৃত্তিবাসী রামায়ণ।

২। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিতম্।

আর ১৮৫৮ সালে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট এবং পরবর্তী কালের সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যেবার বি. এ. পরীক্ষা দেন, সে বছর বি. এ. পরীক্ষায় বাংলায় পাঠ্য ছিল—

১। মহাভারত (প্রথম তিন পর্ব)

২। বত্রিশ সিংহাসন

৩। পুরুষ পরীক্ষা

বাংলা প্রশ্নপত্রের নমুনা

দ্বিতীয় এণ্ট্রান্স ও প্রথম বি. এ. পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট উপরোক্ত বাংলা পুস্তকগুলি থেকে প্রশ্নপত্র রচনা এবং উত্তরপত্র পরীক্ষা করেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। কৌতূহলী পাঠকের জ্ঞাতার্থে বিদ্যাসাগর-কৃত প্রশ্নপত্র দুটি হুবহু উদ্ধৃত হল :

ENTRANCE EXAMINATION

1858

TUESDAY, *March 2nd—Morning*, 10 *to* 1½

BENGALI

Examiner—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

1. রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।
শিরে হাত দিয়া কান্দে সভে নিজবাসে॥
মাঝে সীতা আগে পাছে দুই মহাবীর।
তিনজন হইলেন পুরীর বাহির॥
স্ত্রী পুরুষ কান্দে যত অযোধ্যা নগরী।
জানকীর পাছে ধায় অযোধ্যার নারী॥
যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ।
হেন সীতা বনে যান দেখ সর্ব্বজন॥
যেই রাম ভ্রমেন সোণার চতুর্দ্দোলে।
হেন প্রভু রাম পথ বহেন ভূতলে॥
কোথাও না দেখি হেন কোথাও না শুনি।
হাহাকার করে বৃদ্ধ বালক রমণী॥
জগতের নাথ রাম যান তপোবনে।
বিদায় হইতে যান পিতার চরণে॥
বুদ্ধি নাহি ভূপতির হরিয়াছে জ্ঞান।
রাম বনে গেলে তাঁর কিসে রবে প্রাণ॥
রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।
রাম হেন পুত্র যার হৈল বনবাসী॥
মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ।
বিপরীত বুদ্ধি হয় এই সে কারণ॥
জানকী সহিত রাম যান তপোবন।
রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ॥

Answer the following questions :—

a. রাজ্যখণ্ড ছাড়ি রাম যান বনবাসে।—রাম কি জন্যে রাজ্যখণ্ড ছাড়িয়া বনবাসে চলিলেন তাহার সবিশেষ লিখ।

b. যে সীতা না দেখিলেন সূর্য্যের কিরণ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য্য কি?

c. রাম পথ বহেন ভূতলে।—ইহার অর্থ কি?

d. বন ও তপোবন এই উভয়ের বিশেষ কি বল?

e. বু ; জ্ঞান।—এস্থলে হরিয়াছে ক্রিয়ার কর্তা কে?

f. রাজারে পাগল কৈল কৈকেয়ী রাক্ষসী।—কৈকেয়ী কে, তাহাকে রাক্ষসী বলিল কেন; সেই বা রাজাকে কিরূপে পাগল করিল; এস্থলে পাগল শব্দের অর্থ কি? আর পাগল শব্দের প্রকৃত অর্থের সহিত ঐ অর্থের ভেদ কি?

g. মনে বুঝি রাজার যে নিকট মরণ। বিপরীত শয় এই সে কারণ॥—ইহার অর্থ কি?

h. রাজ্য সুখভোগ ছাড়ি চলিল লক্ষ্মণ।—লক্ষ্মণ কি জন্যে রাজ্য সুখভোগ ছাড়িয়া চলিলেন এবং কোথাই বা চলিলেন বল?

2. Turn the following lines into prose :—

পিতৃশোক ভ্রাতৃশোক মায়ের অযশ।
ভরত করেন দেখ রজনী দিবস॥

আমা হেতু পিতা মরে ভ্রাতা বনবাসী।
এতেক জানিলে কেন দেশে আমি আসি॥

বশিষ্ঠ বলেন তুমি ভরত পণ্ডিত।
তোমারে বুঝাব কত এ নহে উচিত॥

সত্য পালি ভূপতি গেলেন স্বর্গবাস।
তাহার কারণে কান্দ হয় পুণ্য নাশ॥

রাম হেন পুত্র যার গুণের নিধান।
কে বলে মরিল রাজা আছে বিদ্যমান॥

এই রূপে বুঝান বশিষ্ঠ মহামুনি।
ভরত না শুনে কিছু কহে খেদ বাণী॥

কিমতে ধরিব প্রাণ পিতার মরণে।
কিমতে ধরিব প্রাণ রামের বিহনে॥

কিরূপে হইব স্থির কাহারে নিরখি।
দুই শোকে প্রাণ রহে কোথাও না দেখি॥

শশধর যেমন হইলে মেঘাচ্ছন্ন।
বিবর্ণ ভরত অতি তেমনি বিষণ্ণ॥

3. পরে রজনীতে আত্মীয়বর্গের সহিত নির্জনস্থানে বসিয়া পাত্রকে আহ্বানপূর্বক সকলকে পত্রার্থ জ্ঞাত করাইয়া কহিলেন তোমারা বিবেচনা কর ইহার কি কর্তব্য।

প্রধান প্রধান সকল মন্ত্রিরা নবাবের অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া আমাকে আজ্ঞা লিপি লিখিয়াছেন।

ক্ষণেক পরে পাত্র নিবেদন করিলেন মহারাজ! দেশাধিকারীর বিষয়ে অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবেক।

ইহা স্থির হইলে কিঞ্চিৎকালের পর পাত্র প্রেরিত হইলেন।

হঠাৎ মহারাজের যাওয়া পরামর্শ সিদ্ধ হয় না।

Answer the following questions :—

1. নির্জন, পত্রার্থ, আজ্ঞালিপি, পরামর্শ সিদ্ধ—ইহার মধ্যে কোন পদে কোন সমাস হইয়াছে বল।

2. অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া—এস্থলে অত্যাচারে কোন কারক?

3. অতি সাবধানপূর্বক বিবেচনা করিতে হইবে—এস্থলে হইবে ক্রিয়ার কর্তা কে? আর সাবধানপূর্বক এই প্রয়োগ শুদ্ধ কি অশুদ্ধ; যদি অশুদ্ধ বোধ কর তাহার কারণ বল।

4. পাত্র প্রেরিত হইলেন—ইহা কোন বাচ্যের প্রয়োগ; এই বাচ্যের কর্তা কর্ম ক্রিয়া দেখাইয়া দাও।

TUESDAY, *March 2nd—Afternoon*, 2 *to* $5\frac{1}{2}$.

BENGALI

Examiner,—Pundit Eshwar Chunder Bidyasagur.

1. Translate the following lines into English—

রাজা বাসায় আসিয়া মহারাজ মহেন্দ্র, রাজা রাজনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ ও জগৎশেঠ এবং মীরজাফর আলি খাঁ, ইঁহাদিগের সহিত সাক্ষাতের বাসনায় লোক প্রেরণ করিলেন। তাহাতে সকলেই অনুমতি করিলেন রাত্রে আসিতে কহিও। ক্রমে ক্রমে রাজা সকলের নিকট রাত্রে গমন করিয়া আত্মনিবেদন করিলেন। জগৎশেঠ কহিলেন, এ দেশে অত্যন্ত উপদ্রব হইয়াছে, দেশাধিকারী অতি দুরন্ত, কাহারো বাক্য শুনে না, দিন দিন অত্যাচার বৃদ্ধি হইতেছে; অতএব সকলে ঐক্যমত অবলম্বনপূর্বক উপায় চিন্তা না করিলে, কাহারো নিষ্কৃতি নাই, দেশ অচিরাৎ উচ্ছন্ন দশায় নিপতিত হইবেক। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় এতাবদ্বৃত্তান্ত আকর্ণন করিয়া কহিলেন, আপনারা রাজদ্বারের কর্তা, আমি আপনাদিগের মতাবলম্বী; যেরূপ কহিবেন সেইরূপ কার্য করিব। ইহা শুনিয়া জগৎশেঠ কহিলেন, আপনি বাসায় যাউন; আমি মহারাজ মহেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া নিভৃত স্থানে বসিয়া আপনাকে ডাকাইব। ইহা স্থির হইলে, রাজা বিদায় হইয়া বাসায় গেলেন।

2. Translate the following sentences in Bengali :—

1. The air is really a heavy substance, although it seems to be so light.
2. Every day the sun rises in the sky until noon, and then descends again until evening, when it sets entirely out of sight.
3. At night, after the sun has set, the surface of the earth sends back into the air a great deal of the heat it had received during the day, and consequently then becomes much colder than the air.
4. When solid substances are made intensely hot, they are changed into liquids. If they are subjected to still higher degrees of heat, the liquid becomes vapour.
5. Man has within his throat a little instrument or organ, by means of which he can produce sound whenever he pleases. This is called the organ of voice.

Examination Papers. 1858. Bachelor of Arts

TUESDAY, *April 6th—Morning* 10 *to* $1\frac{1}{2}$.

BENGALI

Examiner,—Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

MOHABHARAT

মুনি বলে মহাশয়, শুন শ্রীজনমেজয়, হেন মতে নিবসে পাণ্ডব।
একদিন আচম্বিত, শ্রীনারদ উপনীত, সর্বত্র গমন মনোজব॥
জ্ঞেয় জ্ঞান যোগ যুজ্য অমর অসুর পূজ্য, চতুর্বেদ জিহ্বাগ্রেতে বৈসে।
ব্রহ্মার অঙ্গেতে জন্ম, বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম, ব্রহ্মাণ্ড সৃজেন অনায়াসে॥
পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞেয় বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত।
শিরেতে পিঙ্গল জটা, ললাটে পিঙ্গল ফোঁটা, শ্রবণে কুণ্ডল উল্লাসিত॥
মুখে হরি নাম স্রবে, ভুজস্থ বীণার রবে, গতি মন্দ যেমন মাতঙ্গ।
বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ॥
শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়।
পরিধান কৃষ্ণাজিন, সঙ্গে মুনি কত জন, উপনীত পাণ্ডব সভায়॥
দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে।
আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণ যুত, প্রণাম করেন সে চরণে॥
সুগন্ধ উদক দিয়া, পদযুগ পাখালিয়া, বসিতে দিলেন সিংহাসন।
যথা শিষ্ট ব্যবহার, পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর, ভক্তিভাবে করেন পূজন॥
তবে মুনি স্নেহবশে, জিজ্ঞাসেন মৃদুভাষে, কহ রাজা ভদ্র আপনার।
কুলের কৌলিক কর্ম, ধন উপার্জন ধর্ম, নির্বিঘ্নেতে হয় কি তোমার॥
সাধু বিজ্ঞ যত জন, অনুরক্ত মন্ত্রিগণ, এসবার রাখ কি বচন।
একক অনেক সহ, বিচার কি না করহ, কার্য্যে না কি রাখ মুখ্যগণ॥
ভক্ষ্য দ্রব্য যথাযথ, ন্যায় মূলে কিন কত, না রাখত দ্বিজের দক্ষিণা।
তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত, দুঃখত না পায় কোন জনা॥
বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক।
অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক॥
রাজ্যের যতেক রাজা, পায় যথোচিত পূজা, সবে অনুগতত তোমার।
ধান্য ধন বহুমত, উদক আয়ুধ যত, পূর্ণ করিয়াছত ভাণ্ডার॥
প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ, বৈকালেতে ক্রীড়ারস, আলস্য ইন্দ্রিয় নিবারণ।
ধর্ম কর্মে ধন ব্যয়, কর নিত্য উপচয়, পুত্রবৎ পাল প্রজাগণ॥

Answer the following questions—

1. "সর্বত্র গমন মনোজব,"—এ স্থলে মনোজব পদের অর্থ কি? এই পদে সমাস আছে কি না? যদি থাকে সে সমাসের নাম কি? যে দুই শব্দে সমাস হইয়াছে উহাদিগের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।

2. "বিজ্ঞ যত ব্রহ্মকর্ম,"—ইহার অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।

3. "পরমার্থ অনুবন্ধি, বিজ্ঞের বিগ্রহ সন্ধি, কলহ গায়নে বড় প্রীত,"—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি?

4. "বারিজ নয়ন যুগে, বহে বারি যেন মেঘে, পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ,"—বারিজ নয়ন যুগে এই স্থলে বারিজ শব্দের অর্থ কি? এই শব্দে ঐ অর্থ বুঝায় কেন? আর এই শব্দের সহিত নয়ন শব্দের কিরূপে অন্বয় হইবেক? নারদের নয়ন যুগে কি কারণে বারি বহিতেছে? পুলকে কদম্ব পুষ্প অঙ্গ—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি?

5. "শরদিন্দু মুখাম্বুজ, আজানুলম্বিত ভুজ, প্রজ্বল অনল দীপ্তকায়,"—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ লিখ, কোন স্থলে কি সমাস আছে বল? এবং যে কয়েকটী শব্দ আছে পৃথক পৃথক লিখিয়া প্রত্যেকের অর্থ লিখ।

6. "পরিধান কৃষ্ণাজিন,"—কৃষ্ণাজিন পদের অর্থ কি? এক শব্দ কি দুই শব্দ? যদি দুই শব্দ হয় তবে পৃথক করিয়া লিখ, আর এই দুই শব্দে কি সমাস আছে, এবং সমাস হইয়া দুই শব্দের কি অবয়ব পরিবর্ত্ত হইয়াছে বল?

7. "দেখিয়া নারদ ঋষি, যে ছিল সভায় বসি, সম্ভ্রমে উঠিল ততক্ষণে",—এই স্থলে ঋষি পদে কোন কারক আছে বল? উঠিল ক্রিয়ার কর্তা কে? ততক্ষণে এই পদের অর্থ কি?

8. "আস্তে ব্যস্তে ধর্মসুত, সহোদরগণযুত"—ধর্মসুত শব্দে কোন ব্যক্তিকে বুঝাইতেছে? এই শব্দে ঐ ব্যক্তিকে বুঝায় কেন?

9. "সুগন্ধি উদক দিয়া",—এ স্থলে "দিয়া" ক্রিয়াপদ কি না?

10. "যথা শিষ্ট ব্যবহার,"—এই অংশের অর্থ কি?

11. "কার্যে না কি রাথ মুখাগণ",—ইহার অর্থ লিখ।

12. "তব অনুরক্ত যত, ভয়ে কি শরণাগত",—ইহার অর্থ কি ? আর শরণাগত পদে কি সমাস হইয়াছে বল ? এবং এই দুই শব্দের পৃথক পৃথক অর্থ লিখ।

13. "বিজ্ঞ যোগ্য পুরোহিত, দৈবজ্ঞ জ্যোতিষবিত, আছে কি বন্দক বিনোদক",—দৈবজ্ঞ, বন্দক ও বিনোদক শব্দের অর্থ স্পষ্ট করিয়া লিখ।

14. "অনাথ অতিথি লোকে, আগুন ব্রাহ্মণ মুখে, সদা দেহ ঘৃত অন্নোদক",—এই শ্লোকার্দ্ধের অর্থ কি ?

15. "প্রাতঃকালে নিদ্রাবেশ",—ইত্যাদি এই শ্লোকের অর্থ লিখ।

POOROOSH PARIKHYA

গোদাবরী নদী তীরে বিশালা নামে এক নগরী তাহাতে সমুদ্রসেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার পুত্র চন্দ্রসেন নামা তিনি অত্যন্ত সরল হৃদয়। তাঁহাকে দেখিয়া সেই নগরবাসী কোন বঞ্চক বণিক্ রাজপুত্রের ধনাপহরণে চিন্তা করিল। তাহা পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেমত মৃগ সকল ব্যাঘ্রের ভক্ষণীয় হয়, এবং সর্পেরা গরুড়ের ভক্ষ্য হয়, এবং অন্য পক্ষিগণ সাঁচান পক্ষির ভক্ষ্য হয় ; সেই প্রকার সাধু লোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়। অতএব বণিক্ বিবেচনা করিল যে এই রাজকুমার অতি সুপ্রকৃতি ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে, সেই কারণ ইহার উপাসনা করি। পরে বণিক্ সেই রাজপুত্রের সেবা করিতে লাগিল। তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়। বণিক্ সেই প্রকৃতি দ্বারা সেবা করত নানোপসনাতে রাজকুমারকে বশীভূত করিল।

Answer the following questions—

1. সাধুলোক কুলোকের ভক্ষণীয় হয়,—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য কি ?

2. ইহার ধন আমার সুখগ্রাহ্য হইবে,—এ স্থলে সুখগ্রাহ্য শব্দের অর্থ কি বল ?

3. তিন্তিড়ী ফলের ন্যায় দুর্জনের প্রকৃতি প্রথম সুরসা পরিণামে বিরসা হয়,—ইহার অর্থ ও তাৎপর্য লিখ।

TUESDAY, *April 6th – Afternoon, 2 to 5½.*

BENGALI

Examiner,– Pundit Eshwar Chandra Bidyasagar.

Translate the following passage into English :–

এক দিবস মাধব্য, প্রভাতে গাত্রোত্থান করিয়া, যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইয়া মনে মনে কহিতে লাগিলেন, এই মৃগয়াশীল রাজার সহচর হইয়া আমার প্রাণ গেল। প্রতিদিন প্রাতঃকালে মৃগয়ায় যাইতে হয়, এবং এই মৃগ, ঐ বরাহ, এই শার্দ্দূল, এই করিয়া মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত বনে বনে ভ্রমণ করিতে হয়। গ্রীষ্মকালে পল্বল ও নদ নদী সকল শুষ্ক প্রায় হইয়া আইসে; যে অল্প প্রমাণ জল থাকে, তাহাও বৃক্ষের গলিত পত্র সকল অনবরত পতিত হওয়াতে অত্যন্ত কটু ও কষায় হইয়া উঠে। পিপাসা পাইলে সেই বিরস বারি পান করিতে হয়। আহারের সময় নিয়মিত নাই; প্রতিদিন অনিয়ত সময়েই আহার করিতে হয়। আহার সামগ্রীর মধ্যে শূল্য মাংসই অধিকাংশ, তাহাও প্রত্যহ সুচারুরূপ পাক করা হয় না। আর প্রাতঃকাল অবধি মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত অশ্ব পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করিয়া সর্ব শরীর বেদনায় এরূপ অভিভূত হইয়া থাকে, যে রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা যাইতে পারি না। রাত্রি শেষে নিদ্রার আবেশ হয়; কিন্তু ব্যাধগণের বন গমন কোলাহলে অতি প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইয়া যায়; ত্বরায় যে এই সকল ক্লেশের অবসান হইবেক তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না। সে দিবস আমরা পশ্চাৎ পড়িলে, একাকী এক মৃগের অনুসরণক্রমে তপোবনে প্রবিষ্ট হইয়া, আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে শকুন্তলা নাম্নী এক তাপস কন্যা নিরীক্ষণ করিয়াছেন। তাহাকে দেখিয়া অবধি আর নগর গমনের কথাও মুখে আনেন না। এই ভাবিতে ভাবিতেই রাত্রি প্রভাত হইয়া গেল, একবারও চক্ষু মুদি নাই।

Translate the following passage into Bengali .–

"Having resided at Agra till there was no more to be learned, I travelled into Persia, where I saw many remains of ancient, magnificence, and observed many new accommodations of life. The Persians are a nation eminently social, and their assemblies afforded me daily opportunities of remarking characters and manners, and of tracing human nature through all its variations. From Persia, I travelled through Syria, and for three

years resided in Palestine, where I conversed with great numbers of the Northern and Western nations of Europe ; the nations which are now in possession of all power and all knowledge whose armies are irresistible, and whose fleets command the remotest parts of the globe. When I compared these men with the natives of our own kingdom, and those that surround us, they appeared almost another order of beings. In their countries it is difficult to wish for any thing that may not be obtained ; a thousand arts, of which we never heard, are continually labouring for their convenience and pleasure ; and whatever their own climate has denied them, is supplied by their commerce."

বিদ্যাসাগর ঐ প্রথম এবং ঐ শেষবারের মতো বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র রচনা করেন। ১৮৫৯ সালের প্রশ্নপত্র রচনা করতে অস্বীকার করেন তিনি—কলিকাতায় নির্দিষ্ট সময়ে অনুপস্থিতির অজুহাতে। তবে ১৮৫৯ সালের নবেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষপদ থেকে পদত্যাগের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও প্রায় ছিন্ন হয়ে পড়ে। যা হোক, বিদ্যাসাগর-কৃত প্রশ্নপত্রে অন্যতম পরীক্ষার্থী ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বি. এ. পরীক্ষায় কোনও এক বিষয়ে ফেল করেন ; এবং গ্রেস মার্ক পেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট হন। কারো কারো অনুমান তিনি নাকি বাংলায় ফেল করেন ; এবং সেকারণেই তিনি বিদ্যাসাগর সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। কিন্তু বি. এ. পাসের সাত বছর পর যিনি 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনা করেন (১৮৬৫), তিনি পূর্বোদ্ধৃত বাংলা প্রশ্নপত্রে প্রয়োজনীয় পাস-মার্ক পাবেন না—তা বিশ্বাস হয় কি ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম সমাবর্তন : কোলভিলের ভাষণ

১৮৫৮ সালের ১১ ডিসেম্বর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের প্রথম 'Convocation' বা সমাবর্তন সভা। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম Vice-Chancellor বা উপাচার্য জে. ডব্লিউ. কোলভিল সিনেটের প্রথম সমাবর্তন ভাষণ দেন। সভায় উপস্থিত ছিলেন অন্যান্যদের মধ্যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সে সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ডিপ্লোমা

নিতে উপস্থিত ছিলেন। সিনেটের কার্য বিবরণী থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটদের ডিগ্রী গ্রহণের বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করছি :—

11. The following Candidate Bachelors were presented by the Principal of the Presidency College and admitted to the Degree of Bachelor of Arts :—

Bunkim Chunder Chatterjee,........Presidency College
Juddoonoth Bose, ... Do

ডিগ্রী বিতরণের আগে সমাবর্তন ভাষণে উপাচার্য মি: কোলভিল বলেন—

"We all know, that those who first undertook the task of transferring the treasures of Western Learning, and Western science into the Oriental mind, found before them a choice of difficulties. They had to choose, between conveying instruction through the medium of the English language or through the medium of Vernaculars. The first is a key which unlocks the whole treasure house but it is one, which only the few can acquire and it leaves a foreign mark upon all to which it opens the door. The last is a key that opens a wider portal ; but it admits the multitude into a far narrower chamber. We know that our predecessors preferred the system under which the few might learn much to that under which more might learn something and perhaps better assimilate what they learned. I think that they were right when they so desided ; but I also think and I believe that all men are coming round to that opinion, that we must not neglect the other method but, on the contrary, use it more and more as occasion offers, if we wish the education which we give to strike deep root or to extend over a wide surface".[১]

অর্থাৎ এদেশে প্রথম যুগে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা ও জ্ঞানবিজ্ঞান প্রচারের ভার যাঁরা নিয়েছিলেন তাঁদের সামনে দু'টি পথ ছিল : (এক) ইংরেজির মাধ্যমে স্বল্প সংখ্যক লোকের সামনে বৃহৎ জ্ঞান ভাণ্ডারের দুয়ার খুলে দেওয়া, অথবা (দুই) দেশীয় ভাষার মাধ্যমে বৃহৎ সংখ্যক লোকের মাঝে যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান বিস্তারের ব্যবস্থা করা। আদি শিক্ষানীতি নিয়ামকগণ প্রথম পথটি যে সময় বেছে

১. First Convocation Address, 11. 12 1858.

নিয়েছিলেন, তখন তা ঠিকই করেছিলেন ; তবে এখন বেশীর ভাগ লোকই বিশ্বাস করতে শুরু করেছেন যে, দ্বিতীয় পন্থা অর্থাৎ দেশীয় ভাষার মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দানের নীতি গৃহীত হলে বৃহত্তর জনসমাজে সে শিক্ষা গভীরভাবে পরিব্যাপ্ত হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কে মোহভঙ্গের সূচনা

যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তখন ঈশ্বরচন্দ্র (বিদ্যাসাগর) নিশ্চয়ই ভেবেছিলেন যে তাঁর বহুদিনের লালিত বাসনা—বাংলা ভাষার মাধ্যমে জনশিক্ষার স্বপ্ন এবার সফল হবে। কারণ কোন দেশেই বিদেশী ভাষার মাধ্যমে 'Advancement of Learning' সফল হয় নি। কিন্তু তাঁর সে স্বপ্ন ভঙ্গ হতে বিলম্ব হয় নি। এদিকে আর এক ঈশ্বরচন্দ্র (গুপ্ত) 'মাতৃসম মাতৃভাষা' নিয়ে কবিতা রচনা করেছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনেক আগে। তাঁর স্বদেশপ্রীতি, স্বজাতিপ্রেম, স্বভাষানুরাগ সন্দেহাতীত। তার নিদর্শন—

ভ্রাতৃভাব ভাবি মনে, দেখ দেশবাসিগণে
প্রেমপূর্ণ নয়ন মেলিয়া।
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি,
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া॥

ঈশ্বর গুপ্ত ভারতবর্ষে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত প্রথম দৈনিক সংবাদপত্র 'সংবাদ প্রভাকর'-এর প্রতিষ্ঠাতা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার দুই বছরের মধ্যে তিনি লোকান্তর গমন করেন। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত পত্রিকায় তাঁর আদর্শের রেশ তখনো লুপ্ত হয় নি। ১৮৬০ সালের বার্ষিক সেনেট সভায় ভাইস চ্যান্সেলার বা উপাচার্য মিঃ সি· জে· এরস্কাইনের সমাবর্তন ভাষণের উপর সংবাদ প্রভাকর যে মন্তব্য করে, তাতে বাংলাদেশ ও বাংলা ভাষার হিতাকাঙ্ক্ষীদের মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে—

"···বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পূর্বে আমরা যে সকল আশা ভরসা করিয়াছিলাম এক্ষণে দেখিতেছি, সে সকল কোন কার্য্যেরই হইল না। আমরা মনে করিয়াছিলাম রাজধানীতে ইংলণ্ডীয় রীতিমতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হইলে আমাদের দেশীয় ভাষার শ্রীবৃদ্ধি সহকারে তাহার আদর ও গৌরব বৃদ্ধি হইবে, সকলেই পূর্ববৎ ঘৃণা পরিত্যাগ করিয়া আদরপূর্বক দেশীয় ভাষার অনুশীলন আরম্ভ করিবে, এবং অবিলম্বেই দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা সুসংস্কৃত

ও সুসম্পন্ন হইয়া উঠিবে। কৈ এক্ষণে তাহার কিছুই দেখিতে পাইনা। বরং দিন দিন দেশীয় ভাষার শ্রী হ্রাস সহকারে তাহার সঞ্চিত গৌরবের হানি হইতেছে ইহা সাধারণ দুঃখের বিষয় নহে।···

দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধন করা গভর্ণমেণ্টের ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রে কর্তব্য। ইঙ্গরেজী ভাষা ও আমাদের সংস্কৃত ভাষার যেরূপ উপাধি পরীক্ষা ও উপাধি গ্রহণের রীতি আছে, আমাদের মতে বাঙ্গালা ভাষাতেও সেইরূপ রীতি প্রচারিত করা অতি আবশ্যক। বাঙ্গালা ভাষার স্বতন্ত্র রূপে উপাধি পরীক্ষার রীতি প্রচারিত হলে বড় এক দেশের মঙ্গল সাধনের উপায় হয়। বোধ হয় তাহা হইলে আমাদের দেশীয় দশ বার বৎসরের বালকেরা অনায়াসে প্রথম উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। সেই সকল মাতৃভাষা নিপুণ বালকেরা যদি পরে ইঙ্গরেজী ভাষায় নিপুণ হইয়া ইঙ্গরেজী উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয় তাহা হইলে কি এক পরমাহ্লাদেরই বিষয় হইবে। অতএব আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা যদি বিবেচনাপূর্বক বাঙ্গালা ভাষার উপাধি পরীক্ষার নিয়ম প্রচার করেন তাহা হইলে অতি শীঘ্রই বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি হইয়া উঠিবে।···[২] (সংবাদ প্রভাকর, ফেব্রুয়ারী, ১৮৬০)

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তিন বছরের মধ্যে তার সম্পর্কে নৈরাশ্য ও হতাশা প্রকাশ পেয়েছে সংবাদ প্রভাকরের পাতায়। প্রায় কুড়ি বছর পরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পর্কে সেই একই হতাশার সুর ধ্বনিত হয়েছে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার পাতায়—

> "আমরা শুক পক্ষীর ন্যায় পরের ভাষা বলিতে শিখি, যাত্রার সঙের ন্যায় পরের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে শিখি, এবং বালকদিগের ন্যায় পরের লিপিতে দাগা বুলাইতে শিখি। ···বিদ্যা শিক্ষার ফল কি এই! বিদ্যা উপার্জনের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশের মুখ কোথায় উজ্জ্বল হইবে না তাহা ক্রমশই দীন হীন এবং শ্রীভ্রষ্ট হইয়া যাইতেছে"।[৩]
>
> (অগ্রহায়ণ সংখ্যা, ১৭৯৮ শক—'অধুনা আমাদের দেশে বিদ্যা ফলবতী হয় না কেন?' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধ।)

---

২. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ চিত্র—বিনয় ঘোষ

৩. তত্ত্ববোধিনী, অগ্রহায়ণ ১৭৯৮ শক

চতুর্থ অধ্যায়

উচ্চশিক্ষা পাঠক্রম থেকে মাতৃভাষার বিদায়

উপাচার্য এরস্কাইনের উল্টো স্বর—উচ্চশিক্ষা পাঠক্রম থেকে মাতৃভাষা বাতিল—বাংলা ভাষা চর্চায় উপাচার্য সেটন-কার এর আহ্বান—মাতৃভাষা মাধ্যমের সুবিধা সুফল সম্পর্কে উপাচার্য বেইলির ভাষণ—কথা ও কাজে কারাক—ক্রমোন্নতির পথে বাংলা সাহিত্য।

* * * *

উপাচার্য এরস্কাইনের উল্টো স্বর

যে কোন ব্যাপারে শুভ ইচ্ছা সব সময়ই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু সে ইচ্ছাকে কাজে উপস্থাপিত করার ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে তা আকাশকুসুম হয়েই থাকে। প্রথম উপাচার্য কোলভিলের ইচ্ছানুসারে শিক্ষার ক্রমবিকাশে মাতৃভাষা ব্যবহার ক্রমান্বয়ে চালু করার কোন বাস্তব ব্যবস্থা তো গ্রহণ করা হলই না, উল্টে দেখা গেল কলেজ পাঠক্রম থেকে মাতৃভাষা হঠাও'র তোড়জোড় চলছ। ১৮৬৩ সালের ১৬ মার্চ সিনেটে সমাবর্তন সভায় তদানীন্তন উপাচার্য মিঃ সি. জে. এরস্কাইনের ভাষণে তার আভাষ মেলে—

"It is thought by many that students who, in the lower courses have professed one of the Vernacular Languages of India as their second language, should not on coming forward for the degree of Bachelor of Arts be examined in that language. but in the elements of the Indian classical language with which it has affinity. Judging from the results of an enquiry made some months ago, it would seem that a change in this direction would be approved by many of those who are practically engaged in education in these Provinces, and who believe that candidates approved after trial by such a modified test would be more accomplished scholars in their own Languages, while they would also be better

prepared to go forward for Honours in the Classical Languages of India."[১]

মর্মার্থ: যারা নিম্ন শিক্ষাস্তরে অর্থাৎ এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় দেশীয় ভাষা দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে পড়বে তারা বি.এ. তে সেই বিষয় না পড়ে তার সঙ্গে যে প্রাচীন ভারতীয় ভাষার ঐক্য আছে তাই পড়বে। সাদা বাংলায়—যারা বাংলা হিন্দী উড়িয়া নিয়ে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে তারা এফ.এ. এবং বি.এ. তে সংস্কৃত নিয়ে পড়বে। তেমনি উর্দু নিয়ে যারা পাস করবে তারা আরবি নেবে। এভাবে এফ.এ. এবং বি.এ. দুই পাঠক্রম থেকেই বাংলা বাতিল করার চিন্তা ভাবনা শুরু হল। এই নতুন ব্যবস্থার ফলে নাকি উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা নিজ নিজ মাতৃভাষায় অধিকতর অধিকার অর্জন করে মাতৃভাষার দারিদ্র্য দূর করবে।

বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রম থেকে বাংলা খেদা

উপাচার্যের সমাবর্তন বক্তৃতার পর মাস পাঁচেক গত হল। উপাচার্য এফ.এ. ও বি.এ. পাঠক্রমে ভাষা বিষয়ে যে পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেন তাকে আইনানুগ রূপদানের জন্য ফ্যাকালটি অফ আর্টস্ এক সাব-কমিটি গঠন করে। তারা যে সংশোধিত পাঠক্রম তৈরী করে তা ফ্যাকালটি অফ আর্টস্-এর ৪ আগষ্ট ১৮৬৩ তারিখের সভায় উপস্থাপিত হয়। ঐ সভায় বাঙালী তথা ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—

১। রেভাঃ কে. এম. ব্যানার্জী
২। বাবু রমানাথ টেগোর
৩। বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
৪। মৌলবী আবদুল লতিফ খান বাহাদুর
৫। কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ

সেদিন আলোচনা অসমাপ্ত থাকে। সাতদিন পরে অর্থাৎ ১১.৮.১৮৬৩ তারিখে পুনরায় সংশোধিত পাঠক্রম নিয়ে আলোচনা শুরু হয় এবং কিছু ছোটখাট পরিবর্তন করে সে নিয়মবিধি অনুমোদনের জন্য সিণ্ডিকেটে প্রেরণের সুপারিশ করে—

---

১. Convocation Address 16.3.1863

Resolved :— Report of the Sub-Committee with certain alterations recommended by the Faculty, be agreed to. The report in its amended form was referred to the Syndicate."[২]

ফ্যাকালটির সভায় এই দিন একমাত্র ভারতীয় সদস্য উপস্থিত ছিলেন—কুমার হরেন্দ্র কৃষ্ণ। আশ্চর্যের বিষয় কোন ভারতীয় সদস্যই মাতৃভাষা বাতিলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন নি সে সময়।

সিণ্ডিকেট কালবিলম্ব না করে ৪ দিন পরে ১৫.৮.১৮৬৩ তারিখের সভাতেই আর্টস ফ্যাকালটি কর্তৃক প্রেরিত সুপারিশ বিবেচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়—

"Report of the Sub-Committee to revise the Regulations as amended by several Faculties was considered.

The Syndicate recommended some changes and resolved that the Report thus amended, be printed and forwarded to the Senate, which was appointed to meet on Monday, the 31 August, 1863."[৩]

ঐ দিনের সিণ্ডিকেটে উপস্থিত পাঁচজন সদস্যই বিদেশী, কারণ তখনো বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটে কোন ভারতীয় সদস্য ছিলেন না।

৩১ আগষ্ট ১৮৬৩ তারিখের নির্দিষ্ট সিনেট সভায় নতুন পরীক্ষাবিধি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়। সিনেট সভায় উপস্থিত পঁচিশজন ফেলোর মধ্যে দেশীয় সদস্য ছিলেন পাঁচজন। সংশোধিত পরীক্ষাবিধি তৎকালীন রীতি অনুসারে মহামান্য সপারিষদ বড়লাট বাহাদুরের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হল, এবং তা পেতে বিলম্ব হল না। অবশেষে এ বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রচারিত হল—

"Revised Regulations in Arts approved by the Senate on 31.8.1863 received the sanction of His Excellency the Govornor General of India in Council and are to take effect from 1.5.1864.

Under the Revised Regulations the examination in the Vernacular languages of India at the First Examination in Arts and the B.A. examination has been discontinued and all candidates will be required to take up one of the following classical languages :—

২. Calcutta University Minutes : Fac. of Arts—11.8.1863.

৩. C. U. Syndicate Minutes, 15.8.1863

Latin, Greek, Sanskrit, Hebrew or Arabic.

This changes is not to take effect before 1867 in the case of First Examination in Arts, nor before 1869 in the case of the B.A. Examination.[৪]

নথিপত্র থেকে দেখা যায় ১৮৬৮ সালের এফ. এ এবং ১৮৬৯-এর বি. এ. পরীক্ষা থেকে বাংলা বাতিল হয়ে যায়। সে স্থলে হিন্দু ছাত্রদের জন্য সংস্কৃত এবং মুসলমানদের জন্য আরবি পড়ার বিধি ব্যবস্থা করা হয়।

কিন্তু এতৎসত্বেও পরবর্তী উপাচার্যদের মধ্যে কেউ কেউ বার্ষিক সমাবর্তন সভায় মাতৃ ভাষা চর্চার মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিস্তারের জন্য ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন। যেমন ১৮৬৮ সালের সমাবর্তন উৎসবে উপাচার্য ডব্লিউ. এস. সেটন-কার বলেন—

"........I do think it advisable to impress upon you most earnestly the necessity of being familiar with the resources of your own Vernacular tongue, whether it be the dialect, so capable and so polished, which is spoken with such purity and delicacy at the Capitals of Lucknow and Delhi, or whether it be that Bengali language, which depends so closely on its great parent Sanskrit, but which unlike that great parent does not aim at turning a plain language into puzzles, or at making knowledge inaccessible to the masses."[৫]

ঠিক দুই বছর পরে ১৮৭০ সালে উপাচার্য ই. সি. বেইলি অনুরূপ ভাষাতেই সমবেত সুধীমণ্ডলীকে আহ্বান করে আরো স্পষ্ট ভাষায় বলেন—দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হলে কিভাবে সকল সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত বিরাট সংখ্যক দেশবাসীর সামনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বার খুলে যাবে। দেশীয় ভাষার উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প কতিপয় উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির নিষ্ঠা ও আন্তরিক প্রচেষ্টাতেই যে তা ফলপ্রসূ হতে পারে তা তিনি বিলাতের উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন। এবং ইতিমধ্যেই যে বাংলা ভাষায় তার স্ফুরণ দেখা যাচ্ছে তাও উল্লেখ করতে ভোলেন নি। মিঃ বেইলির ভাষণের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু অবশ্যই উল্লেখযোগ্য—

৪. C. U. Minutes, 1863

৫. Convocation Address, 1868

"But it is perhaps, in the direction of Vernacular literature that assistance is most required. It is difficult for those who have not the opportunity of watching the progress of education, to understand how this is limited and hindred by the want of a good vernacular literature ; how numerous the classes are to whom the bare existence of a good vernacular literature would throw upon the means of acquiring knowledge, the means of self-training and improvement. A vernacular literature is, I gladly admit, beginning to show itself. But without attempting any criticism on its general character, it is sufficient to say that even where it is largest and best it is utterly inadequate to the requirements of the case ; and it is in this direction that I would especially urge the efforts of the educated classes in India, because in England, even within my own recollection, enormous benefit has resulted from the efforts of a few zealous men towards the information and dissemination of a sound popular literature. I am not unaware that some gentlemen, specially in Bengal have made similar attempts already ; such men deserve all honour. But there is yet so much to be done in the way of making knowledge accessible, in placing it before the people in a shape which will command their attention and their sympathies, and in supersiding what is useless, cumbrous or worse, that I may say the field is everywhere still practically unoccupied."[৮]

কথা ও কাজে ফারাক

দেখা যাচ্ছে একদিকে একের পর এক উপাচার্য দেশীয় ভাষার, বিশেষ করে বাংলা দেশে বাংলা ভাষার উন্নতি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে তার কার্যকরী প্রয়োগ সম্পর্কে বিভিন্ন উপলক্ষে জোরাল বক্তব্য রাখছেন, অপরদিকে বাংলাকে শিক্ষার আঙিনা থেকে দূরে রাখার নানা ব্যবস্থা দেওয়া হচ্ছে। কথা ও কাজে ফারাকের এ এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। আরো দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এই যে বাংলা সাহিত্যের সার্বিক উন্নতির সম্ভাবনা যখন দিন দিন উজ্জ্বলতর হয়ে উঠল, তখন বাংলার মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা তো দূরের কথা, কলেজীয়

৮. Convocation Address, 1870.

পাঠ্যসূচীতে দুর্বোধ্য বাংলা পড়ানোর যেটুকু ব্যবস্থা ছিল, তাও রদ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। প্রকৃতপক্ষে উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থায় জাতীয় সাহিত্যের পদোন্নতি না হয়ে পদাবনতি ঘটল, তার মর্যাদা হরণ করা হল। উপরন্তু এফ. এ. এবং বি. এ. তে সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বলে নির্দেশিত হবার ফলে, এন্ট্রান্স পর্যায়ে সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে যে কোন একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেবার বিধান থাকায়, এন্ট্রান্স পর্যায়ের অধিকাংশ বাঙালী ছাত্র বাংলা ভাষার পরিবর্তে সংস্কৃতকেই দ্বিতীয় ভাষারূপে নির্বাচিত করে। ফলে উচ্চ কিংবা নিম্ন, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার সকল স্তরেই বাংলা সাহিত্যের হতমান নত শির অবস্থা।

ক্রমোন্নতির পথে বাংলা সাহিত্য

কিন্তু এই সময়ের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে নতুন সৃষ্টির জোয়ার নেমেছে যেন। তাতে অন্যতম অগ্রণীর ভূমিকায় দেখা গেল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দুই বছরের মধ্যে ১৮৫৯ সালে দীনবন্ধু মিত্র 'নীলদর্পণ' নাটক, চার বছর পরে ১৮৬১ সালে মাইকেল 'মেঘনাধবধ কাব্য' এবং আটবছর পরে ১৮৬৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাস নিয়ে সাহিত্যের আসরে আত্মপ্রকাশ করেন। (বেইলী তাঁর ভাষণে এঁদের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন) মেঘনাদবধ কাব্যের কিয়দংশ ১৮৬৪ সালে এফ. এ. পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়। আধুনিক সাহিত্যের উচ্চ শিক্ষা পাঠক্রমে স্থান লাভ সম্ভবত এই প্রথম। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্রকে ঘিরে এবং পরে 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় নিত্যনতুন সৃষ্টির বান ডাকে; যে সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

> "কোথায় গেল সেই অন্ধকার, সেই একাকার সেই সুপ্তি—কোথায় গেল সেই বিজয় বসন্ত, সেই গোপেব কাওয়ালি, সেই বালক-ভুলানো কথা—কোথা হইতে আসিল এত আলোক, এত আশা, এত সঙ্গীত, এত বৈচিত্র্য।…বঙ্গভাষা সহসা বাল্যকাল হইতে যৌবনে উপনীত হইল।"[৭]…

---

৭. বঙ্কিমচন্দ্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলা সাহিত্যের এমন-ভরা যৌবনের কালে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনে মাতৃভাষা সম্পর্কে অন্যায় আত্মহননকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করার মতো কেউ তখন ছিলেন না। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দী মাড়ানো বন্ধ করেছেন। শিক্ষাদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের কাছে তখন তিনি 'persona non-grata'। "কিছুদিন পূর্ব থেকেই বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে কেমন যেন উৎসাহ-হীন হয়ে পড়েছিলেন। তার প্রধান কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যে স্থান হওয়া উচিত ছিল তা তিনি পান নি। এমন কি সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার ব্যাপারে তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করে পাদ্রীদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়া হতো। আজ ভাবলে বিস্মিত হতে হয়, সে যুগের বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেট সভায় বিদ্যাসাগরের স্থান হয় নি।"[৮]

এই বক্তব্যে এতটুকু অতিরঞ্জন নেই। কার্যত রেভাঃ আলেকজাণ্ডার ডাফ, রেভাঃ উইলিয়ম কে, প্রমুখ পাদ্রীগণ ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ও বাংলা বিষয়ের হর্তাকর্তা। তাঁদের সব কথা ও কাজে সায় দিতেন দেশী পাদ্রী রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে অধিক সন্ন্যাসীতে যেমন গাজন নষ্ট, তেমনি অধিক পাদ্রীতে মাতৃভাষা নষ্ট। সুতরাং প্রতিবাদ করবে কে?

৮. শতবর্ষ স্মরণিকা : বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২—১৯৭২

পঞ্চম অধ্যায়

বিশ্ববিদ্যালয় ভার্নাকুলার পরীক্ষা ব্যবস্থা

স্যার উইলিয়ম মুরের 'মিনিট'—দেশীয় ভাষায় পড়াশোনার প্রস্তাব—মুরের 'মিনিট'-এর উপর বেইলীর প্রস্তাব : দেশীয় ভাষায় বিকল্প প্রবেশিকা পরীক্ষা—বিশ্ববিদ্যালয় ভার্নাকুলার পরীক্ষার ব্যবস্থা—পরীক্ষা গ্রহণ স্থগিত।

* * * *

মিঃ বেইলীর সমাবর্তন ভাষণের কিছুকাল পূর্ব থেকেই উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পাঞ্জাবে কিন্তু দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বেশ অস্থিরতা দেখা দেয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ হওয়া সত্ত্বেও দূরে অবস্থান হেতু শিক্ষার প্রসারে এবং তার সুফল ভোগে তারা অনেক পিছিয়ে পড়ে এবং বাংলাদেশের স্কুল-কলেজ থেকে পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তিরাই এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে চাকরি-বাকরির সিংহভাগ দখল করে বসে। শুধুমাত্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষার জন্য প্রেরিত ছাত্র সংখ্যা থেকেই এই বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে—

Provinces		Number of Candidates in					
	Year	1869	1870	1871	1873	1874	
*Bengal		1436	1566	1503	1717	2099	
N. W. Provinces		124	175	179	186	220	
Punjab		106	74	82	56	77	
Central Provinces		6	26	78	71	63	
Oudh		43	53	40	104	71	

* Bengal means undivided Bengal, Bihar, Orissa and Assam.

স্যার উইলিয়ম মুরের 'মিনিট'

সুতরাং একই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া সত্ত্বেও চাকরি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে একটি মাত্র অঞ্চলের লোকদের এই একাধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতে চাপা বিক্ষোভের সঞ্চার হয়। বাঙালীরা সর্বাগ্রে রাজভাষা ইংরেজি আয়ত্ত করে যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করছে এবং বিলম্বে ইংরেজি শিক্ষা শুরু করে যে বাঙালীদের সমকক্ষ হওয়া সম্ভব নয়, তা বুঝতে তাদের অসুবিধা হয় নি। সুতরাং শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় তথা মাতৃভাষাকে বাহন করলেই তারা অনতিবিলম্বে বাঙালীর সমপর্যায়ে আসতে পারবে এই তাদের আশা।

সেই অঞ্চলের জনসাধারণের এই মনোভাব অনুধাবন করে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ছোট লাট স্যার উইলিয়ম মুরের পক্ষে তার সেক্রেটারী ৯.১২.১৮৬৮ তারিখে ভারত সরকারের কাছে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন। ভারত সরকার সেই চিঠি ৩০.১২.১৮৬৯ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটে বিবেচনার জন্য পাঠান। ১৮৭০ সালের ৮ জানুয়ারী সিণ্ডিকেট সভায় সেই চিঠির মূল বক্তব্য বিষয় পেশ হয়। দীর্ঘ সেই চিঠিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের সম্পর্ক নিয়ে নানা কথার মধ্যে স্যার মুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিবেচনার জন্য প্রস্তাব করেন—

(*i*) Whether greater encouragement might be advantageously given to the study of Oriental literature : and

(*ii*) Whether any part of the examinations might not be conducted in the vernacular.[১]

তার এ ধরণের প্রস্তাবের মূল উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন—

(*i*) The vernacular languages would be enriched by the composition of scholars whose style would be formed upon best Oriental models, and modes of reasoning and expression would be in accord with native thought who would yet have access through the English language to the knowledge of history, art and science, and who, being, as we may hope, imbued with the love of true learning, would be at the same time in the best position to communicate the fruits of their own studies in a Native and attractive form to their fellow-countrymen.

১. C. U. Minutes, 8.1.1870

(*ii*) It is not pretended that as yet, we are ready for conducting University Examinations in any subject in the Vernacular; but His Honour believes that the time is not very distant when such a course will be possible and expedient, and when the interest of the native students will demand it.[২]

মুরের 'মিনিট' এর ওপর বেইলীর প্রস্তাব ঃ দেশীয় ভাষায় বিকল্প প্রবেশিকা পরীক্ষা

স্যার উইলিয়ম মুরের প্রস্তাবের ওপর উপাচার্য মিঃ ই. সি. বেইলী এক সুদীর্ঘ 'মিনিট' তৈরী করেন এবং একই সঙ্গে উক্ত সিণ্ডিকেটে পেশ করেন। বেইলী তাঁর 'মিনিটে' মুরের প্রস্তাবের ওপর আরো এক ধাপ এগিয়ে প্রস্তাব করেন—

"I would propose that the Entrance Examination be held optionally in the vernacular, and optionally also the language to be taken up should be English, one vernacular, and one Oriental classical language as at present, or one Vernacular and a higher standard of attainments in either Sanskrit or Arabic."[৩]

অর্থাৎ মাতৃভাষায় একটা অতিরিক্ত এণ্ট্রান্স পরীক্ষা নেওয়া হোক। তাতে ছাত্রদের বর্তমানের মতো ইংরেজি, মাতৃভাষা ও প্রাচীন সাহিত্য কিংবা তৎপরিবর্তে মাতৃভাষা ও উচ্চমানের সংস্কৃত বা আরবি এই দুই ধরণের ভাষা পত্রের মধ্যে একটি বাছাই করার সুযোগ থাকবে।

বেইলী তাঁর 'মিনিটে' সর্বশেষ প্রস্তাব করেন—

"It is certain that the sciences can be conveyed with far greater accuracy of thought to a native student in his own vernacular, than through the too often indistinctly apprehended text of an English treatise."

স্যার মুরের চিঠি বেইলীর মন্তব্য সহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃত্বাধীন এলাকার বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা-কর্মচারীদের নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত হল। যাঁদের কাছে মতামত চাওয়া হল তাঁরা হলেন—

২. C. U. Munites, 8.1.1870

৩. C. U. Minutes.

1. Mr. Colin Browning, Inspector General of Education Central Provinces.
2. Mr. W. Handford, Director of Public Instruction , Oudh.
3. Mr. M. Kempson , Director of Public Instruction , North-Western Provinces.
4. Mr. Deighton , Principal Agra College.
5. Mr. Sime , Professor, Agra College & Member , Senate C.U.
6. Mr. Reid , Board of Revenue , & Member, Senate C.U.
7. Hon'ble C. A. Turner, Officiating Chief Justice.
8. Mr. Hume, Commissioner, Inland Customs, & Member, Sanate, C. U.
9. Mr. Griffith, Principal, Benaras College, & Member, Senate, C. U.
10. Baboo Siva Prasad, Joint Inspector of Schools & Member, Senate, C. U.
11. Mr. M. S. Howell, Judge, Small Causes Court, Dehra, late officiating Inspector of Schools.
12. Mr. Templeton, Principal, Bareilly College.
13. Mr. Harrison, Professor, Bareilly College.
14. Mr. Jardine, Professor of Law & Member, Senate, C. U.
15. Rev. C. E. Vines, Principal, St. John's College, Agra.
16. Mr. C. A. Elliot, Officiating Secretary to the Government of North-Western Provinces.

বাংলা প্রেসিডেন্সীতে যাঁদের মতামত চাওয়া হয়েছিল :—

1. Mr. H. Woodrow, Inspector of Schools, Central Division.
2. Mr. C. B. Clarke.
3. Revd. Dr. Murray Mitchell, Superintendent of the Free Church College.
4. Babu Rajendralal Mitra.
5. Babu Bhudeb Mookerjee, Inspector of Schools.
6. Revd. J. Long.

ইউনিভার্সিটি ভার্নাকুলার একজামিনের ব্যবস্থা

যা হোক, স্যার মুরের নোট ও মিঃ বেইলীর মিনিটের ওপর যে সমস্ত জবাব পাওয়া গেল সেগুলির ওপর একাধিক সিণ্ডিকেট সভায় আলোচনার পর ১.৪.১৮৭১ সালের সিণ্ডিকেটে (Item no. 83) সিদ্ধান্ত হল—

"That for the better encouragement of Vernacular Education and Literature, an examination in Vernaculars be instituted by the University, on the plan of the middle class examinations conducted by British Universities, and that regulations for the conduct of this examination be laid before the Senate for approval and confirmation, after the details have been settled by the Syndicate in consultation with the Faculty of Arts and the Educational Authorities of the several Local Governments."[৪]

দেশীয় ভাষা তথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হল না, তবে ইংরেজিতে কাঁচা ছাত্রদের জন্য 'University Vernacular Examination' নামে এন্ট্রান্সের চেয়ে নিচু মানের এক নতুন পাঠক্রম ও পরীক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। যথাসময়ে এই সিদ্ধান্ত সিনেটে অনুমোদিত হয়। এবং পরীক্ষা বিধি তৈরী ও অনুমোদনের পর ১৮৭৩ সাল থেকে পরীক্ষা গ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

কিন্তু কার্যত ফল যা দাঁড়াল, তা পর্বতের মূষিক প্রসব তুল্য। ইংরেজি যথাস্থানে বহাল থাকল, প্রাচীন ভাষার গায়ে আঁচড় লাগল না, মাতৃভাষার মাধ্যমে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করতে বেইলীর প্রস্তাব নস্যাৎ হয়ে তার স্থলে বাংলার মাধ্যমে নিচু স্তরের এক পরীক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল।

সব যখন ঠিকঠাক, তখন শেষ মুহূর্তে বাংলাদেশের ছোট লাট University Vernacular Examination স্থানীয় সরকারী দপ্তরের এক্তিয়ার থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারে নেবার বিরুদ্ধে আপত্তি জানান এবং এই পরীক্ষার যৌক্তিকতা সম্পর্কেও আপত্তি তোলেন। এদিকে পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের Director of Public Iustruction-গণ জানান যে তাদের এলাকা থেকে ১৮৭০ সালে অনুষ্ঠিতব্য U. V. Examination-এর জন্য কোন প্রার্থী পাওয়া যাবে না।

সমগ্র কাগজপত্র ২৮ জুন ১৮৭৩ সালের সিন্ডিকেটে উত্থাপিত হল এবং তার ওপর সিদ্ধান্ত হয়—

"That the University Vernacular Examination proposed to be held in November, 1873, be deferred for another year."[৫]

---

৪. C. U. Minutes, 1.4.1871.

৫. C. U. Minutes, 28. 6. 1879.

ষষ্ঠ অধ্যায়

মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের জন্য পৃথক কলেজের প্রস্তাব

জর্জ স্মিথের চিঠি—প্রথম বেসরকারী কলেজ স্থাপন—বিদ্যাসাগরের হাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্পচূর্ণ—বেইলীর ভাষণে দেশীয় ভাষার অনগ্রসরতায় বেদনা প্রকাশ।

* * * *

স্যার মুর এবং মিঃ বেইলীর সমগ্র প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। বেইলীর আন্তরিকতায় সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ইংরেজি-প্রেমী ও প্রাচীন সাহিত্যানুরাগীদের চাপে তাঁর প্রস্তাব কার্যকর হয় নি; তথাপি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কোন পরিবর্তন ঘটে নি; কিংবা শিক্ষার মাধ্যম নিয়ে বাদানুবাদের পরিসমাপ্তি হয় নি। এই তর্ক বিতর্কে দেশীয় শিক্ষাবিদদের চেয়ে বরং বিদেশী শিক্ষাবিদগণই মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পক্ষে ওকালতি করে আসছিলেন। সিনেটের সদস্য মিঃ জর্জ স্মিথ নানা দৃষ্টিকোন থেকে এ প্রশ্নের বিচার করে এক সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়ে রেজিষ্ট্রারকে এক চিঠি লেখেন। ঐ চিঠি ২০।১২।৬৭ তারিখের সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হয়। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন—

> "That the University of Calcutta be empowered to affiliate colleges, in which true science, true history and true metaphysics are taught only through the Oriental languages, and in which such language and their literature are scientifically studied."[১]

মিঃ স্মিথের মূল বক্তব্য ছিল—দীর্ঘকাল ধরে সরকারী কলেজে ইউরোপীয় শিক্ষক দ্বারা ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখন শিক্ষা দীক্ষার আরো সম্প্রসারণ করতে হলে—যা বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক আদর্শ—এই বিলাতি ধরনে তা না করে দেশবাসীর ইচ্ছানুসারে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে করতে হবে। তাহলে সকল শ্রেণীর ভাষা ও সাহিত্যের স্বাভাবিক স্ফুরণ হবে, দেশীয় মেধা ও মনীষার সুস্থ সংমিশ্রণে বৃহত্তর জনসমাজে উন্নত জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রসার ঘটবে। এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য কেবলমাত্র সরকারী কলেজের উপর নির্ভর না করে,

১. C. U. Minutes, 20.12.1867

বিশ্ববিদ্যালয়কে এমন কলেজ অনুমোদনের ক্ষমতা দেওয়া হোক, যেখানে দেশীয় ভাষায় খাঁটি ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে।

মিঃ স্মিথের এই প্রস্তাবের ওপর মতামতের জন্য যথারীতি রেভাঃ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরিত হল। সরকারী কর্তৃপক্ষ এদেশবাসীর শিক্ষাসম্পর্কীয় কোন ব্যাপারে অপ্রীতিকর সিদ্ধান্ত নিতে হলে তাঁকে শিখণ্ডীরূপে ব্যবহার করতেন। তিনিও নানা রকম বাক্‌জাল বিস্তার করে সরকারী নীতিতে সায় দিতেন। মিঃ স্মিথের প্রস্তাবের ব্যাপারেও তাই হল। রেভাঃ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিকূল মন্তব্য শোনার পর সিণ্ডিকেট সিদ্ধান্ত নেয়—

Resolved—That in the opinion of the Syndicate the time has not yet arrived for the University to legislate about colleges, where true History and Science may be taught through the Oriental languages, because, as far as they are aware such colleges do not at present exist, and there does not appear to be any probability that they can be successfully established for many years to come.

অর্থাৎ প্রাচ্য ভাষায় খাঁটি ইতিহাস বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে পারে এমন কোন কলেজ না থাকায় এবং দূর ভবিষ্যতেও সে জাতীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই বলে মিঃ স্মিথের প্রস্তাব গ্রহণ করা যায় না। এমন কি দেশীয় পরিচালনায় যে কলেজীয় শিক্ষা দান সম্ভব, সে সম্পর্কেই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ঘোর সন্দেহ ছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্প চূর্ণ

এই ঘটনার মাত্র দুই বছর পূর্বে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বে পরিচালিত মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে এফ.এ. ও বি.এ. পড়াবার অনুমোদন চেয়েছিলেন। তখন দেশীয় লোকদের কলেজ চালাবার অক্ষমতা এবং দেশীয় শিক্ষকদের আধুনিক শিক্ষাদানে অযোগ্যতার অজুহাতে বিশ্ববিদ্যালয় সে আবেদন নাকচ করে দেয়। আবার ঠিক সাত বছর পরে যখন মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে কলেজীয় শিক্ষাদানের অনুমোদনের জন্য পুনরায় আবেদন করা হল, তখন বিদ্যাসাগর উপাচার্য মিঃ বেইলিকে এক ব্যক্তিগত

পত্র লেখেন। তাতে দেশীয় শিক্ষকগণ ইউরোপীয় শিক্ষকদের চেয়ে শিক্ষাদানে যে কোন অংশে ন্যূন নন্, তা যুক্তি-তর্ক-প্রমাণ দিয়ে বুঝিয়ে বলেন এবং অনুমোদন প্রাপ্তির ব্যাপারে তাঁর সাহায্য কামনা করেন। এদেশে বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার অগ্রদূত বিদ্যাসাগরের সেই চিঠির ঐতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। তার আংশিক উদ্ধৃতি অপ্রাসঙ্গিক হবেনা—

"If it should be urged at the Syndicate that the character of the instruction to be imparted in the Institution would be inferior inasmuch as the instructive staff would enlist exclusively of natives, I would take the liberty to remind you that the Sanskrit College, which teaches upto the B.A. standard, has an exclusively native staff, and that our Professors would be drawn from the same class of men. We feel confident, that native Professors, if selected with care and judgement would be found quite competent .... It will be our aim to combine efficiency with economy and as I have spent, I may say, my whole life in managing schools, I hope you will allow me to exercise my own discretion in selecting Professors and regulating their pay."[২]

অনেক গড়িমসির পর মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন এফ.এ. পর্যন্ত পড়াবার অনুমোদন পেয়েছিল। ১৮৭৪ সালের এফ.এ. পরীক্ষাতেই তার অপূর্ব সাফল্য। প্রথম পরীক্ষাতেই গুণানুসারে বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার। ইউরোপীয় অধ্যাপক ছাড়া দেশীয় অধ্যাপক দ্বারা কলেজীয় শিক্ষা চলতে পারে না—বিদেশী শিক্ষাবিদদের এই অহমিকা তিনি চূর্ণ করে ছাড়লেন। শ্বেতাঙ্গ প্রভুরাও স্বীকার করতে বাধ্য হলেন—Pandit has done wonders —'পণ্ডিত তাক লাগাইয়া দিয়াছে'। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষা-নায়ক বিদ্যাসাগরের আনন্দের সীমা রইল না। স্বয়ং বেইলীও আনন্দের অংশীদার হয়েছিলেন অনুমান করা চলে।

বেইলীর শেষ সমাবর্তন ভাষণ

দেশীয় ভাষায় উচ্চ শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করতে পারেন নি বলে তখনও তাঁর মনে বোধ হয় ক্ষোভ ছিল। তাই উপাচার্য হিসেবে প্রদত্ত শেষ

২. C.U. Minutes, 1872

সমাবর্তন ভাষণেও তিনি দেশীয় ভাষায় শিক্ষাদানে অনগ্রসরতা নিয়ে বেদনা প্রকাশ করেছেন—

"The power of doing this (communicating to the mass of their less fortunate fellow-countrymen some share of the intellectual advantage which they enjoy) depends so much on their individual circumstance, that I cannot profess to do more than to direct special attention to the three palpable needs which six years ago I indicated as those toward satisfying which every graduate of the University ought to lend some personal aid ; I mean the spread of vernacular education, the creation of a national literature, and of a national school of Science. Something, no doubt, is being gradually done towards the second object, but this can never find its full development while vernacular education is so backward as at present, and scientific literature at least must await the existence of a school of vernacular science. Still, there is in India so boundless a field for the exercise of literary ability and for scientific research of every class, that for very shame we should not allow it to remain unworked."*

*. Convocation Address 13.3.1875.

সপ্তম অধ্যায়

ইংরেজি শিক্ষা, না ছাত্রমেধ যজ্ঞ

বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মতুষ্টি—বিডন'এর উদ্বেগ

* * * *

অবহেলিত অপমানিত বাংলা ভাষার কথা এখন থাক। অন্যায়ভাবে সমগ্র রাজ্যপাট দখল করে অভিমানী দুর্যোধনের মতো ইংরেজি তো নিজের অধিকার সর্বত্র কায়েম করে বসেছে; কিন্তু অন্ধ ইংরেজিয়ানা ছাত্রসমাজে কি ভয়ঙ্কর বিপর্যয় ডেকে এনেছে তা অচিরে পরীক্ষার ফলাফলে ফুটে উঠল। বিভিন্ন পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভারতীয় ছাত্রদের কি শোচনীয় ব্যর্থতা। কাতারে কাতারে ছাত্র পরীক্ষায় অকৃতকার্য হতে থাকে। সে ছাত্রমেধ যজ্ঞ দেখে সাহেবরা পর্যন্ত শিউরে উঠলেন। শুধুমাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় কয় বছরের ফলাফল থেকেই এ সম্পর্কে প্রকৃত চিত্র পাওয়া যাবে :—*

Entrance Exam. of	No. of Candidates appeared	No. of Candidates passed	No. of Candidates failed in			
			English	2nd-Language	History and Geograpy	Mathematics
1869	1730	817	577	257	334	631
1870	1905	1099	543	302	237	421
1871	1902	767	736	377	667	669
1872	2144	938	865	321	722	534
1873	2544	848	1095	404	931	1232

উপরের চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে, ইংরেজিতে ছাত্র-সংহার বাৎসরিক অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়েছে। অথচ তার প্রতিকারে কোন ব্যবস্থা তো নেই-ই বরং পদে পদে বাধা দান অব্যাহত। এদিকে এফ, এ, এবং বি, এ, পরীক্ষায়

* C. U. Syndicate Minutes, 1869-1873.

সংস্কৃত অবশ্যপাঠ্য বিষয় বলে, এবং এন্ট্রান্স পরীক্ষায় সংস্কৃত ও বাংলার মধ্যে যে কোন একটি দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে নেবার ব্যবস্থা থাকার ফলে, বাংলা ভাষী ছাত্রগণ, বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দু ছাত্রদের মধ্যে বেশীর ভাগ ছাত্রই এন্ট্রান্সে সংস্কৃত ভাষা বেছে নিলেন। কারণ, যেহেতু উচ্চতর শিক্ষায় এই বিষয়টি বাধ্যতামূলক তাই গোড়া থেকেই তাতে পাকা-পোক্ত হয়ে অধিক নম্বর পাবার আশায় ছাত্রগণ সংস্কৃতকেই নির্বাচন করে। এই নিয়মগত হেরফেরের ফলে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলাভাষার ছাত্রসংখ্যা কেমন দ্রুতহারে হ্রাস পেয়ে সংস্কৃতের ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পেল, তার এক চমৎকার ছবি মেলে নিম্নোক্ত সংখ্যা-চিত্র থেকে—

Entrance Examination of	No. of Candidates from Bengal	No. of Candidates examined in	
		Bengali	Sanskrit
1868	1462	1095	249
1869	1436	574	770
1870	1566	338	1131
1871	1503	249	1160
1872	1717	478	1157

বিশ্ববিদ্যালয়ের আত্মতুষ্টি

বাংলা ভাষার এই অবহেলা ও অনাদর এবং ইংরেজিতে ছাত্রদের কচুকাটা অবস্থা দেখে চিন্তান্বিত হওয়া তো দূরের কথা, বরং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাদের অবলম্বিত নীতির সার্থকতা দেখে আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন—

"This statement shows that in the Lower Provinces Sanskrit has almost completely supplanted Bengali in the higher schools as a second lahguage. In 1868, there were 1095

candidates who took up Bengali, and only 249 who took up Sanskrit. The preceding statement shows that the study of Sanskrit has taken the place of Bengali in the leading schools of the Lower provinces, and that the scheme of the University, which requires all candidates at the higher examinations to take up a classic in lieu of vernacular, is likely to be successful."[১]

বীডন' এর উদ্বেগ

ভারত বন্ধু যে সব সরকারী ও বেসরকারী পদস্থ ইংরেজ শিক্ষা বা শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন তারা অনেকেই এই সর্বনাশা ইংরেজি-য়ানার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাদেশের ছোটলাট মিঃ সিসিল বিডন ১৬. ৫. ১৮৬৬ তারিখে প্রেরিত এক 'মিনিটে' বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষায় শোচনীয় ফলাফল দেখে তাঁর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন :—

"For the Entrance Examination there were 1500 candidates of whom only 510 or 34 percent passed. ......Out of 990 rejected candidates, ... no less than 733 failed in English and 633 in Mathematics. The failures in History and Geography and *in the native languages were much fewer.* For the F.A. Examination there were 446 candidates of whom 202 or say 45 percent passed ....

Of the 244 rejected candidates .... no less than 204 failed in English. *I observe that out of 26 candidates from Cathedral Mission College only 4 passed . That is the worst case. But even of the 108 Presidency College candidates, only 56 or about 52 were successful.*"[২]

ইংরেজি শিক্ষার পীঠস্থান এবং সম্পূর্ণ ইউরোপিয়ান শিক্ষকমণ্ডলী পরিচালিত ক্যাথিড্রাল মিশন কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজির মাধ্যমে পাঠরত দেশীয় ছাত্রদের ব্যর্থতা সম্পর্কে লাট সাহেবের বক্তব্যের ওপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।

---

১. C. U. Syndicate Minutes, 1, 4, 1871.

২. C. U. Syndicate Minutes, 1866

কিন্তু ডিপুটির চাকরি আর ওকালতি পেশায় প্রলুব্ধ বাঙালী শ্যামাপোকার মতো ইংরেজি-আলোর চারপাশে সোৎসাহে নাচানাচি করতে আর পাখা পুড়ে দলে দলে ভূপাতিত হতে থাকে। বাংলা ভাষার সামান্য চর্চা বা অনুশীলন হয় এমন ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাগুলিও বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। যেমন, ১৮৭১ সালে এন্ট্রান্স পরীক্ষায় দেশীয় ভাষা পত্রে যে কোন ইংরেজি গদ্যাংশ থেকে দেশীয় ভাষায় অনুবাদের বিধান করে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :—

"That, as a part of the Entrance Examination in Oriental languages, the Examiner shall set a paper containing passages in English, to be translated into one of the Vernaculars of India at the opinion of the candidate : passages being taken from a newspaper or other current literature of the day."[৩]

কিন্তু কয় বছর যেতে না যেতেই এই ব্যবস্থা রদ করার প্রস্তাব এল। প্রস্তাবক সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন। বাংলার এই সামান্য চর্চাও যেন তাঁর কাছে অসহ্য মনে হল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়কে যে চিঠি লেখেন তা সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হল—

"Read a letter from Pandit Maheschandra Nyayaratna praying that the present system of requiring candidates at the University Examinations to translate into their own Vernacular be discontinued."[৪]

অথচ বাংলা পরীক্ষায় বাংলা থেকে ইংরেজীতে অনুবাদের যে বিধান রয়েছে পণ্ডিতজী সে সম্বন্ধে নীরব।

৩. Syndicate Minutes, 1871

৪. Syndicate Minutes, 23. 2. 1878

অষ্টম অধ্যায়

ইংরেজী শিক্ষিতদের দুঃখময় জীবন ঃ বাংলা বই'র করুণ পরিণতি

* * * *

বেথুন, বিদ্যাসাগর, হ্যালিডে, মোয়াট, কাওয়েল, সেটন-কার, বিডন, বেইলী প্রভৃতি মাননীয় ব্যক্তিগণ একে একে কর্মজীবন থেকে অবসর নিলেন। কেউ সাগরপারে, কেউবা পরপারেও যাত্রা করেছেন। তাঁদের স্থলাভিষিক্তগণ ভাষা সাহিত্য ইত্যাদি ক্ষুদ্র ব্যাপারে মাথা ঘামান নিরর্থক মনে করে গতানুগতিক শাসনযন্ত্র পরিচালনায় নিয়োজিত হলেন। দেশীয় সদস্যগণও সরকারী নীতির প্রতি অবিচল নিষ্ঠা ও সমর্থন জানিয়ে নিজ নিজ আখের গোছাবার ফন্দি-ফিকিরে ব্যস্ত। তবে সবার আগে ইংরেজি শিখে, তার দৌলতে সমাজের বৃহদংশকে বঞ্চিত করে যারা চাকরি ক্ষেত্রে মৌরসী পাট্টার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাঁদের হাল হকিকৎ কেমন ছিল তা দেখা যাক। পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় ১৮৫৮ থেকে ১৮৮১ সাল পর্যন্ত ১৭১২ জন বি. এ. পাশ করে। তার মধ্যে সরকারী চাকরী পায় ৫২৮ জন এবং বেসরকারী চাকরিতে নিযুক্ত ছিল ১৮৭ জন। বেকার ছিল ৬৩৫ জন।[১] সুতরাং উচ্চ শিক্ষিত মাত্রই জীবিকার্জনের সুযোগ পেয়েছিল এই ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। এই শিক্ষিত বেকারদের জীবনের এক নিষ্করুণ চিত্র ফুটে উঠেছে সেকালের এক কবিয়ালের কণ্ঠে—

মাগো, একটি ছেলে মানুষ করতে,
স্কুল কলেজে দিলে পড়তে,
বহু অর্থ খরচ হয় তার ফলে;
একটি ব্রিটিশ মন্ত্রে দীক্ষিত হলে,—
উচ্চ শিক্ষিত বলে।
তবু চাকরি পাওয়া বিষম ঠেকা,
উমেদারি আর তেল মাখা,
বাড়ি থেকে গেলে টাকা—
বাবুর বাসা খরচ চলে।[২]

---

১. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ

২. কবিয়াল হরিচরণ আচার্য—নরসিংদী, ঢাকা

একটু কাব্য করে বলতে গেলে—

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধায়, ধাইলি, অবোধ হায়!
না দেখিলি না শুনিলি, এবে রে তোর পরাণ কাঁদে!

বাংলায় পাঠ্য পুস্তক রচনার প্রয়াস ঃ
বাংলায় রচিত মননশীল পুস্তকের করুণ পরিণতি

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এই দীর্ঘ বিশ বছর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার ব্যবহারে কোন কার্যকরী প্রচেষ্টা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে দেখা গেল না। উপযুক্ত শিক্ষক ও উপযুক্ত বাংলা পাঠ্য পুস্তকের অজুহাত তো হাতের কাছেই ছিল। শিক্ষকের অজুহাত বিদ্যাসাগর মিথ্যা প্রমাণ করে ছেড়েছেন। এদিকে বিভিন্ন বিষয়ে উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকও ক্রমান্বয়ে প্রণীত হতে থাকে। যথা—

"We have now in Bengal men able and willing to write excellent books in the Vernacular. We have lately had a good treatise on Astronomy published by Babu Nabin Chandra Datta, and a very good Algebra was brought out by Babu Prasanna Kumar Sarbadhikari, the Principal of the Sanskrit College. This later gentleman is a true patriot, and if readers could be obtained for sound books on science, he would I know, write and print them himself, rather than that they should be wanted. But the grief to him and to all lovers of their country is, that even the sound books already published cannot find readers. Most politicians care for nothing but abuse of English, the Zaminders are too lazy or too busy to read anything sound; students expect to read the subjects in English, the native public give some small encouragement to dramas and tales; but absolutely and literally no one reads sound vernacular books of a higher order than school books. The few works that have been published become the patrimony of white-ants."[৩]

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য :—"এই সময়ে ধীরে ধীরে বাঙ্গালীর মন বাংলা ভাষার দিকে আকৃষ্ট হইতেছিল। এখনকার বাংলা সাহিত্যের বনিয়াদ প্রস্তুত করা আরম্ভ হইল। প্রসন্নবাবু বাংলায় পাটীগণিত লিখিলেন। আমার দাদা রামকমল ভট্টাচার্য তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। নবদ্বীপে তারিণীচরণ

---

৩. C. U. Syndicate Minutes 25.2.1871

চট্টোপাধ্যায় বাংলায় ভূগোল লিখিলেন। সকলের অপেক্ষা অধিক লিখিলেন বিদ্যাসাগর।"[৪]

কিন্তু মাতৃভাষায় গুরুগম্ভীর বিষয় নিয়ে রচিত পুস্তকের পাঠক নেই। উপযুক্ত পাঠকের অভাবে এ জাতীয় পুস্তক কালক্রমে উইপোকার খাদ্যে পরিণত হয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ সম্পর্কিত মিঃ মুর / মিঃ বেইলির—প্রস্তাবের উপর সেকালের দুই বাঙালী মনীষী ডঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতামত চাওয়া হয়েছিল। তাঁরা বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিচার করে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত জানান। তাতে উভয়ের মতের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য না থাকলেও, বাংলা পুস্তক রচনায় সংস্কৃতে গভীর পাণ্ডিত্য যে অনাবশ্যক, সে বিষয়ে দু'জনই তথ্য প্রমাণ দিয়ে তাঁদের অভিমত জ্ঞাপন করেন। যেমন—

> "In Bengal the best novelist is an *eleve* of the Calcutta University, and an ex-student of Bishop's Colldge is the greatest pcet.....Again, more than five hundred books are now annually published in Bengal, and of them at least four hundred and fifty are the composition of men who can by no means be called "learned" in the classics of the Country". (Rajendralala Mitra) ; [৫] এবং

> "This assumption, however. is not supported by facts. In Bengal, there are many senior scholars of the Sanskrit College, who have passed the First Examination in Arts. I am doubtful, if even one of them has written a Bengali book." (Bhoodeb Mookerjee).[৬]

তাঁরা দু'জনই অবশ্য ইংরেজির পরিবর্তে সংস্কৃত / আরবি পাঠের বিরোধিতা করেছিলেন।

---

৪. পুরাতন প্রসঙ্গ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য)—বিহারীলাল সরকার

৫, ৬. C. U. Syndicate Minutes, 25.2.1871

নবম অধ্যায়

বাংলা ভাষার সপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র

'ফিলট্রেশন' পদ্ধতি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র কটাক্ষ—মাতৃভাষার অনাদরে ক্ষোভ—ইংরেজি শিক্ষার সুফলে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির ভোগদখল—জাতীয় অনৈক্য ও বিভেদের বীজ—বেইলীর সতর্কবাণী।

* * * *

মাতৃভাষা শিক্ষা এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা নিয়ে গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে বিদ্যাসাগর এবং ষাটের দশকে তাঁরই সমমতাবলম্বী বিদেশী শিক্ষাব্রতীগণ দেশে যে আলোড়ন তুলেছিলেন, সত্তরের দশকে তা ক্রমে থিতিয়ে যায়, এবং আশির দশকে প্রায় পুরোপুরি চাপা পড়ে গেল। অথচ এই কুড়ি বছরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য যে উন্নতির এক গৌরবোজ্জ্বল শিখরে আরোহণ করেছিল তা কে অস্বীকার করবে?

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার যথাযোগ্য প্রয়োগ ও মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে সাময়িক বিরতি ঘটলেও, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে কিন্তু এই প্রসঙ্গে আলোচনা ও দাবী অব্যাহত থাকে। 'বঙ্গদর্শন'কে কেন্দ্র করে স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৭২খ্রীঃ তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'পত্র সূচনা' শীর্ষক প্রথম রচনাতেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত সমাজের বিরূপ মনোভাবের কঠোর সমালোচনা করেন। তারপরেও স্বনামে বা ছদ্মনামে একাধিক প্রবন্ধ, রঙ্গ ও ব্যঙ্গ রচনায়, যুক্তিতর্কে, শ্লেষে উপহাসে তিনি বাঙ্গালীদের আত্যন্তিক ইংরেজী প্রীতি ও বাংলা-বিদ্বেষের বিরুদ্ধে তীব্রতম কষাঘাত করতে ছাড়েন নি। Filtration Theory—অর্থাৎ চুয়ানো নীতির দোহাই দিয়ে শিক্ষাকে মুষ্টিমেয় উচ্চ বংশজাত ব্যক্তিদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে, দেশব্যাপী বৃহৎ জনসঙ্ঘকে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখার দুর্বুদ্ধিতার বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র মন্তব্য উদ্ধৃতিযোগ্য :—

"এক্ষণে একটা কথা উঠিয়াছে, এডুকেশন্ 'ফিলটার্ ডৌন' করিবে। এ কথার তাৎপর্য এই যে, কেবল উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা সুশিক্ষিত হইলেই

হইল, অধঃশ্রেণীর লোকদিগকে পৃথক শিখাইবার প্রয়োজন নাই, তাহারা কাজে কাজেই বিদ্বান হইয়া উঠিবে। যেমন শোষক পদার্থের উপরিভাগে জলসেক করিলেই নিম্নস্তর পর্যন্ত সিক্ত হয়, তেমনি বিদ্যারূপ জল, বাঙালী জাতিরূপ শোষক-মৃত্তিকার উপরিস্তরে ঢালিলে, নিম্নস্তর অর্থাৎ ইতরলোক পর্যন্ত ভিজিয়া উঠিবে। জল থাকাতে কথাটা একটু সরস হইয়াছে বটে। ···বিদ্যা, জল বা দুগ্ধ নহে যে, উপরে ঢালিলে নীচে শোষিবে' " (পত্র-সূচনা—বঙ্গদর্শন)

বঙ্কিমচন্দ্র উপরোক্ত 'চোয়ানো-পদ্ধতির' ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। এই বিভেদাত্মক শিক্ষাপদ্ধতির অসারতা ও অসাফল্য নির্দেশ করে তিনি মোহান্ধ দেশবাসীকে বলেছেন—

(ক) "বাঙালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী ; যদি এই তিন কোটি বাঙালী হঠাৎ তিন কোটি ইংরাজ হইতে পারিত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার কোন সম্ভাবনা নাই ; আমরা যত ইংরাজি পড়ি, যত ইংরাজি কহি বা যত ইংরাজি লিখি না কেন ; ইংরাজি কেবল আমাদের মৃত সিংহের চর্মস্বরূপ হইবে মাত্র . ডাক ডাকিবার সময়ে ধরা পড়িব।"

(খ) "যদি কেহ এমত মনে করেন যে, সুশিক্ষিতদিগের উক্তি কেবল সুশিক্ষিতদিগেরই বুঝা প্রয়োজন, সকলের জন্য সকল কথা নয়, তবে তাহারা বিশেষ ভ্রান্ত। সমস্ত বাঙালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন মঙ্গল নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাজি বুঝে না, কস্মিন্‌কালে বুঝিবে, এমন প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উক্ত না হইবে, তাহা তিন কোটি বাঙালী কখন বুঝিবে না বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, ভবিষ্যতে কোন কালেও শুনিবে না। যে কথা দেশের সকল লোকে বুঝে না বা শুনে না, সে কথায় সামাজিক বিশেষ কোন উন্নতির সম্ভাবনা নাই।"

(গ) "কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চ'ষে। আমার ফাউলকারি সিদ্ধ হইলেই হইল।"

(লোকশিক্ষা—বিবিধপ্রবন্ধ)

বাংলাদেশে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কাছে বাঙালীর মাতৃভাষার অনাদরে ব্যথিত বঙ্কিম এই মনোবৃত্তির কুফলতার দিকে অঙ্গুলী নির্দেশ করে বলেছেন—

"সুশিক্ষিত বাঙালীদের অভিপ্রায়সকল সাধারণতঃ বাঙ্গালাভাষায় প্রচারিত না হইলে সাধারণ বাঙালী তাহাদিগের মর্ম বুঝিতে পারে না, তাহাদিগকে চিনিতে পারে না, তাহাদিগের সংস্রবে আসে না।…বাঙ্গালা ভাষার প্রতি বাঙ্গালীর অনাদরেই বাঙ্গালার অনাদর বাড়িতেছে। সুশিক্ষিত বাঙালীরা বাঙ্গালা পাঠে বিমুখ বলিয়া সুশিক্ষিত বাঙালীরা বাঙ্গালা রচনায় বিমুখ।"
(লোকশিক্ষা—বিবিধ প্রবন্ধ)

বাংলাভাষায় শুধু কলা বিদ্যা নয়, বিজ্ঞান শিক্ষারও প্রয়োজন আছে বলে বঙ্কিমচন্দ্র মনে করতেন। সেজন্য তিনি জোরের সঙ্গেই বলেছেন—

"বাঙ্গালীকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙ্গালীকে বাঙ্গালা ভাষায় বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।"

শিক্ষায় বাংলার ব্যবহার সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন রচনা থেকে অনেক উদ্ধৃতি দেওয়া যায়, কিন্তু বাহুল্য ভয়ে বিরত থাকা গেল।

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম স্নেহভাজন হরপ্রসাদ শাস্ত্রীও ১৮৮০ সালে বঙ্গদর্শন'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে "বাঙ্গালা দিয়া ইংরাজি শিখ না কেন"—এই তেজোদ্দীপ্ত উক্তি করে বাংলা ভাষাকে 'কলেজী শিক্ষা'র বাহন করতে দুঃসাহসিক প্রস্তাব দিয়েছিলেন।[1]

সমাজের উচ্চজাত উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায় ইংরেজি শিক্ষার সুফল একচেটিয়া ভোগদখলের দরুণ নিজেরা এক স্বতন্ত্র সম্প্রদায়ে পরিণত হয় এবং ঐ শিক্ষার জোরেই সমাজ ও জাতির মুখপাত্র হয়ে দাঁড়ায়। আর 'হাসিম সেখ রামা কৈবর্তের' দল নিয়ে যে বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তারা সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সাধারণের বোধগম্য ভাষায় সর্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা হল না। বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাক্ষেত্র কুক্ষিগত করে মুষ্টিমেয় সুবিধাবাদী সুবিধা-ভোগীর দল সামাজিক শৃঙ্খলা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলেই কুঠারাঘাত করে; অনৈক্য ও বিভেদের বীজ বপন করে। 'Haves' ও 'Have nots'—এর মতো 'Educated' ও 'Uneducated'— নামে দুটি নতুন শ্রেণীর সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে তাই শ্রেণী-সংঘর্ষে পরিণত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্টের বিষাদান্ত পরিণতির পরেও তার যবনিকাপাত হয়নি। স্বাধীন ভারতের

১. এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে—প্রবোধচন্দ্র সেন, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯.৬.৮১

দিকে দিকে যে ভেদবুদ্ধির মনোবৃত্তি নিত্যনতুন কুৎসিৎ রূপ নিয়ে মাথা চাড়া দিচ্ছে তা ইংরেজির দৌলতে মুষ্টিমেয় গোষ্ঠী-বিশেষের একচ্ছত্র ক্ষমতা সম্ভোগেরই পরিণতি। ইংরেজ শাসন ভারতে ভৌগোলিক অখণ্ডতা এনেছে নিঃসন্দেহ, কিন্তু ইংরেজি ভাষা ভারতকে খণ্ডীকরণে যে প্রধান ইন্ধন জুগিয়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই। কোন কোন ইংরেজ রাজপুরুষ বা শিক্ষাবিদ জনসংখ্যার বৃহদংশকে বঞ্চিত করে রাখা এই ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কুফল সম্পর্কে শতাধিক বছর পূর্বেই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তার সুর মিঃ ই. সি. বেইলীর বক্তব্যে স্পষ্ট শোনা যায়—

"........ a very large number of students are deterred by the enforced necessity of learning English from coming at all within the sphere of European teaching. They go on in the groove which is unimproved, and almost unimproveable. This is specially in the case in Upper India with the Mahomedan population, and I need hardly say that the result is an unmixed political evil."[২]

২. C. U. Syndicate—8.1.1870

দশম অধ্যায়

আশুতোষ পর্ব (ক)

গুরুদাসের সমাবর্তন ভাষণ ঃ আশুতোষের ভাষা আন্দোলনের সূচনা

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাবর্তন ভাষণ—শিক্ষা ব্যবস্থায় দেশীয় ভাষার গুরুত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট অভিমত—গুরুদাসের ভাষণে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনে সাড়া—বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে মাতৃভাষার দাবী জানিয়ে আশুতোষের ঐতিহাসিক চিঠি—ফ্যাকালটি অফ আর্টসের সভায় আশুতোষের প্রস্তাব অগ্রাহ্য—বাংলা ভাষার সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের লেখনী ধারণ—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ভূমিকা ও উদ্যম—বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যে মুষ্টিভিক্ষা।

* * * *

বিগত শতাব্দীর সপ্তম ও অষ্টম দশক বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর মাতৃভাষা পঠন-পাঠন সম্পর্কে প্রায় নিশ্চুপ থাকবার পর ১৮৯১ সালে বার্ষিক সমাবর্তন বক্তৃতায় প্রথম ভারতীয় উপাচার্য স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় উচ্চ শিক্ষায় দেশীয় ভাষার প্রশ্নটি আবার তুলে ধরেন। সমাবর্তন ভাষণে স্যার গুরুদাস বলেন—

> "I ...... also deem it not merely desirable , but necessary, that we should encourage the study of those Indian Vernaculars that have a literature, by making them compulsory subjects of our examinations in conjunction with their kindred classical languages. The Bengali language has now a rich literature that is well worthy of study, and Urdu and Hindi are also progressing fairly in the same direction. In laying stress upon the importance of the study of our Vernaculars, I am not led by any mere patriotic sentiment, excusable as such sentiment may be, but I am influenced by more substantial reasons. I firmly believe that we cannot have any thorough and extensive culture as a nation, unless knowledge is disseminated through our own Vernaculars. Consider

the lesson that the past teaches. The darkness of the Middle Ages of Europe was not completely dispelled until the light of knowledge shown through the medium of the numerous modern languages. So in India, notwithstanding the benign radiance of knowledge that has shown on the higher levels of our society through one of the clearest media that exist, the dark depths of ignorance all round will never be illumined until the light of knowledge reaches the masses through the medium of their own Vernaculars (Applause)"[১]

মর্মার্থ : যে সব দেশীয় ভাষায় নতুন সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে সেগুলি তাদের সগোত্র প্রাচীন ভাষার সঙ্গে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে অধ্যয়নে উৎসাহ দেওয়া শুধু বাঞ্ছনীয় নয়, একান্ত প্রয়োজনীয় মনে করি। বাংলা ভাষায় এমন উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছে যা অধ্যয়নের মর্যাদা দাবী রাখে। হিন্দী এবং উর্দ্দু ভাষাও তেমনি উন্নতির পথে এগোচ্ছে। আমি শুধুমাত্র দেশ-প্রেমজাত ভাবাবেগে তাড়িত হয়েই দেশীয় ভাষা পাঠের উপর জোর দিচ্ছি না। আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে জ্ঞানবিজ্ঞানের আলো বিকীর্ণ না হলে আমরা কখনই সার্বিক ও উন্নত সংস্কৃতির অধিকারী হতে পারব না। অতীত কি শিক্ষা দেয় তা ভেবে দেখুন। যতদিন জ্ঞানালোক আধুনিক ভাষাসমূহের মাধ্যমে বিতরিত না হয়েছে, ততদিন পর্যন্ত মধ্যযুগের ইউরোপের অন্ধকার পুরোপুরি দূরীভূত হয়নি। সুতরাং ভারতে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে উচ্চশ্রেণীর মধ্যে যে জ্ঞানরশ্মিচ্ছটা পড়েছে, তদ্দারা চারদিকের অজ্ঞানতার ঘনতমসা কখনই দূরীভূত হবে না—যতদিন পর্যন্ত সেই জ্ঞানালোকরাশি দেশীয় ভাষার মাধ্যমে আপামর জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে না পড়ে।

উক্ত সমাবর্তন সভায় যে সব বরেণ্য ও স্মরেণ্য মনীষী উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, গৌরদাস বসাক, উমেশচন্দ্র দত্ত, হেমচন্দ্র ব্যানার্জী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ঈশানচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এবং বাবু আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

১. Convocation Address, dated the 24th January, 1891.

গুরুদাসের আহ্বানে আশুতোষের মনে সাড়া

উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করে বঞ্চিত জনসাধারণের মাঝে জ্ঞানের আলো পৌঁছে দেবার যে উদাত্ত আহ্বান স্যার গুরুদাস জানান, তার সাড়া জেগেছিল সিনেটের কনিষ্ঠতম সদস্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মনে। গুরুদাসের এই সুচিন্তিত অভিমতের মাঝে আশুতোষ তাঁর অন্তরের প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। সমাবর্তন সভানুষ্ঠানের ছয় মাস পরে বাংলা ভাষার স্থপতি, বাংলা শিক্ষার আদি গুরু আদি প্রবক্তা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর লোকান্তরিত হন। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে স্যার গুরুদাসের বক্তব্যে তাঁর মনে কোন ভাবান্তর হয়েছিল কিনা সন্দেহ; কারণ এমন শুভেচ্ছাসূচক ভাষণ তিনি পূর্ববর্তী উপাচার্যদের অনেকের মুখে শুনেছেন; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে কার্যত কিছুই হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষার অন্যতম প্রথম প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র যে অপুষ্ট অনুন্নত বাংলা ভাষায় পরীক্ষা দেন, তার প্রশ্নকর্তা ও পরীক্ষক ছিলেন বিদ্যাসাগর। সেই বঙ্কিমের হাতে যখন বাংলা সাহিত্য ভূমিহীন বাস্তহীন প্রজা থেকে রাজাসনে অধিষ্টিত, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে তার নির্বাসন নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের মনে আঘাত দিয়েছিল।

যা হোক, স্যার গুরুদাসের বক্তব্যের সূত্র ধরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার যৎকিঞ্চিৎ স্থান দানের যে প্রস্তাব করেন, তা প্রকৃত পক্ষে মাতৃভাষার যাথাযোগ্য স্বীকৃতি দান ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আশুতোষের আমৃত্যু অক্লান্ত একক সংগ্রামের ইতিহাসের সূত্রপাত। সমাবর্তন ভাষণের পাঁচ সপ্তাহ পরে রেজিষ্ট্রারের কাছে লিখিত এক চিঠিতে এফ. এ., বি. এ. অনার্স. এবং এম. এ. পাঠক্রমের বিভিন্ন স্তরে দেশীয় ভাষার অন্তর্ভুক্তির কতগুলি সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব করে, সেগুলি নির্দিষ্ট আইন সংশোধনের জন্য সিণ্ডিকেটে উত্থাপনের অনুরোধ করেন। সেই চিঠির সারাংশ ১৪ই মার্চ ১৮৯১ তারিখের সিণ্ডিকেটে উত্থাপিত হয়েছিল। সেদিনের সিণ্ডিকেট কার্য-বিবরণীতে দেখা যায়:

MINUTES OF THE SYNDICATE

FOR THE YEAR 1890-1891.

No. 24.

THE 14TH MARCH.

Present :

THE HON'BLE MR. JUSTICE GOOROO DASS BANERJEE, D. L.,
Vice-Chancellor, in the Chair

The Hon'ble Sir Alfred Croft, K. C. I. E.
A. M. Bose, Esq.
Babu Dinabandhu Datta.
Sir John Edgar, K. C. I. E., C. S. I
Babu Srinath Das
Babu Asutosh Mukhopadhyay, F. R. A. S., F. R. S. E.

450. * * * *

451. * * * *

452. Read a letter from Babu Asutosh Mukhopadhyay requesting that the following propositions may be submitted to the Syndicate for consideration :—

I.— That in the Arts Examinations candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali, Hindi or Oriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II.— That the foregoing proposition be carried out in the manner following, that is to say :—

(A)— In the F. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above named classical languages, text-books be also prescribed in the above-mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B)— In the B. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the above named classical languages text-books be also prescribed in the above mentioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass papers, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the Honours papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing questions on the vernacular text-books and an original composition in the vernaculars.

(C)— In the M. A. examination, in addition to the English essay required by para. 5 of the M. A. Regulations, candidates be required to write an essay in one of the above-named vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language professed by them.

RESOLVED—

That the letter be referred to the Faculty of Arts.

সিণ্ডিকেটের নির্দেশানুসারে আশুতোষের প্রস্তাব সম্বলিত চিঠিখানা ১৮৯১ সালের ১১ জুলাই ফ্যাকাল্টি অফ্ আর্টসের সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। যেহেতু এই চিঠি বাংলা ভাষার জন্য আশুতোষের আমরণ সংগ্রামের প্রথম প্রামাণ্য দলিল, তাই সম্পূর্ণ চিঠিখানা, প্রস্তাবের পক্ষাবলম্বী ও বিরুদ্ধবাদীদের বক্তব্য এবং ফ্যাকাল্টিতে ভারতীয়দের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আশুতোষের প্রস্তাব কিভাবে ভোটে নাকচ হয়ে যায়, তাই অনুধাবনের সুবিধার্থে সেদিনের সভায় উক্ত প্রস্তাবের উপর আলোচনার পূর্ণ বয়ান দেওয়া গেল—

MINUTES

OF

THE FACULTY OF ARTS

FOR THE YEAR 1891-92.

No. 1

THE 11TH JULY 1891

Present :

The Hon'ble Sir Alfred Croft, K. C. I. E., *President, in the Chair.*

Nawab Bahadur Abdul Luteef, C.I.E.
Rai Kanailal De, Bahadur, F. C. S., C. I. E.
Col. H. S. Jarrett.
Babu Omes Chunder Dutt.
Mahamahopadhyay Mahesachandra Nyayaratna, C. I. E.
A. M. Bose, Esq.
A. M. Nash, Esq.
The Rev. Dr. K. S. Macdonald.
Babu Gaurisankar De.
Maulavi Suraj-Ul-Islam, Khan Bahadur.
Raja Piyarimohan Mukerjee, C. S. I.
Babu Bankimchandra Chatterjee
Babu Isanchandra Basu,
Babu Nilmani Mukherjee.
Maulavi Abdul Hai.
Babu Saradacharan Mitra.
Dr. C. J. H. Warden.
Babu Golapchandra Sarkar.
Babu Jogindrachandra Ghosh.
N. N. Ghose, Esq.
Babu Chandranath Basu.
Babu Haraprasad Sastri.
Shamsul Ulama Maulavi Ahmad.
Babu Umeschandra Datta.
Babu Rajaninath Ray.
Shamsul Ulama Shaik Mahmud Gilani.
J. C. Bose, Esq., B. Sc.
Babu Srinath Das.
Babu Asutosh Mukhopadhyay, F. R. A. S., F. R. S. E.
Maulavi Muhammad Abdur Rawuf.
Babu Syamacharan Ganguli.
Rai Gunabhiram Sarma Baruya, Bahadur.
Babu Mahendranath Ray.
Babu Jogindrachandra Ghosh.

71. Babu Asutosh Mukhopadhyay proposed that a committee be appointed to consider the propositions contained in the following letter and any cognate propositions that may be brought before it :—

To

The Registrar of the University of Calcutta.

Sir,

May I request the favour of your submitting this letter for the consideration of the Syndicate.

It will be in the recollection of all, that at the last Convocation for conferring the degrees, the Hon'ble the Vice-Chancellor drew attention to the necessity of encouraging the study of Indian Vernaculars. He is reported to have said, "I also deem .... classical language." Sharing the view thus set forth, and believing that the time has come when the University should take action in the matter, I beg to submit for the consideration of the Syndicate the following propositions :—

I.— That in the Arts Examinations candidates who take up Sanskrit should also be examined in either Bengali, Hindi or Uriya, and those that take up Persian or Arabic should be examined also in Urdu.

II.— That the foregoing proposition be carried out in the manner following, that is to say :—

(A)— In the F. A. Examination :—

(i) In addition to the text-books prescribed in the abovenamed classical languages, text books be also prescribed in the abovementioned corresponding vernacular languages.

(ii) The first paper be devoted to the classical language and the second paper to questions on the vernacular text-books prescribed, and to an original composition in the vernacular.

(B)— In the B. A. Examination : —

(i) In addition to the text-books prescribed in the abovenamed classical languages, text books be also prescribed, in the abovementioned corresponding vernacular languages.

(ii) For the pass paper, the same scheme be adopted as for the F. A. Examination.

(iii) For the Honours papers, in lieu of the third paper on prose and poetry, a paper be set containing

questions on the vernacular text books and an original composition in the vernaculars.

(C) In the M. A. Examination, in addition to the English Essay required by para 5 of the M. A. Regulations, candidates be required to write an essay in one of the abovenamed vernaculars on any subject connected with the History or Literature of the classical or vernacular language proposed by them.

Bhowanipur, 1st March, 1891.

I have, & C. & C,.
Asutosh Mukhopadhyay.

প্রস্তাব উত্থাপনের পর সদস্যগণ নিজেদের অভিমত জ্ঞাপন করে পক্ষে বিপক্ষে বক্তৃতা দিলেন। সেকালে সদস্যদের বক্তৃতা হুবহু লিপিবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল না বলে তাঁদের উক্তি ও যুক্তির সারবত্তা বিচারের সুযোগ নেই। তবু কে বা কারা সপক্ষে বা বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন তার উল্লেখ কার্য বিবরণী থেকে পাওয়া যায় :—

"Babu Umesh Chandra Datta seconded the motion.

Raja Piyarimohan Mukherjee proposed as an amendment that it is not desirable to modify the Arts Examinations Regulations in the way suggested in the motion.

Maulavi Suraj-ul-Islam seconded the amendment.

Col. H. S. Jarrett, Nowab Abdool Luteef, Babu Rajaninath Ray and Mahamohopadhyay Mahesh Chandra Nyayaratna opposed the motion.

Babu Bankim Chandra Chatterjee, Babu Chandranath Basu and Babu Mahendranath Ray spoke against the motion.

Babu Nilmani Mukherjee spoke against the motion.

The Rev. Dr. Macdonald, Mr. A. M. Bose and Babu Haraprasad Sastri supported the motion.

With the consent of the meeting the amendment was withdrawn, being taken as a direct negative of the original motion. The motion was then put to vote, and declared lost by a majority of 17—11."[১]

---

১. Calcutta University Minutes dated 11.7.1891.

সেদিন সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৫ জন সদস্য। ভোটে অংশ গ্রহণ করেন ২৮ জন। প্রস্তাবের পক্ষে ১১ জন, বিপক্ষে ১৭ জন। অন্যরা হাঁ বা না কোন পক্ষেই যোগ না দিয়ে দু'কূল রক্ষা করেছেন। ফ্যাকাল্টিতে দেশীয় সদস্যদের নিরঙ্কুশ সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় ভাষার সম্মানজনক স্থানলাভের প্রথম প্রয়াসে কারা প্রথম বাধা দিয়েছেন, তা ভোটের ফলাফলেই স্পষ্ট। এমনিই গভীর ছিল দেশবাসী শিক্ষিত সমাজের বৃহদংশের ইংরেজি-প্রীতি।

স্মরণ থাকতে পারে যে, চল্লিশ বছর পূর্বে বিদ্যাসাগরের বাংলা শিক্ষা বিস্তারের প্রস্তাব ও কর্মসূচী সমর্থন করার মতো স্বদেশহিতৈষী দেশে তেমন কেউ ছিলেন না। আর আশুতোষের প্রস্তাব সমর্থন করলেন স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র সমেত বেশ কয়েকজন মাতৃভাষানুরাগী মনীষী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর প্রস্তাব ১৭—১১ ভোটে অগ্রাহ্য হল। রাজা, নবাব, পাদ্রী, পণ্ডিত ও মৌলবীরা এক জোট হয়ে প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়ে আশুতোষের প্রথম প্রচেষ্টা বানচাল করে দেয়। এই পরাজয়ের গ্লানি আশুতোষ পরবর্তী জীবনেও ভুলতে পারেননি। বিশেষ করে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন ও পরবর্তী অধ্যক্ষ নীলমণি মুখোপাধ্যায়ের বাংলা ভাষা বিরোধিতার কথা। বাংলা শিক্ষার আদি গুরু বিদ্যাসাগরের হাতে রূপান্তরিত সংস্কৃত কলেজের পরবর্তী অধ্যক্ষগণ বাংলা ভাষার যথোপযুক্ত স্বীকৃতির বিরুদ্ধে কেমন পদে পদে বাধা দিয়েছিলেন, তা উল্লেখ করে পরবর্তীকালে আশুতোষ তীব্র ভাষায় তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

শিক্ষায় মাতৃভাষার সমর্থনে রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ

*　　*　　*　　*

বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে বাংলা ভাষার পক্ষে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে এলেও বাহিরে কিন্তু তার ঢেউ একেবারে স্তব্ধ হয়ে যায় নি। বরং তা ক্রমেই সরব হয়ে ওঠে। গত শতাব্দীর শেষ দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার অনুশীলন ও পরীক্ষার বাহনের দাবী সম্পর্কে বিভিন্ন দিক থেকে আবেদন উঠতে থাকে; বাংলার বিদ্বৎসমাজ মুখর হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারে মুখ্য প্রবক্তার ভূমিকায় ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মতামত প্রথম প্রকাশ পায় ১২৯০ সালের কার্তিক (অক্টোবর ১৮৮৩) সংখ্যা 'ভারতী' পত্রিকায় "ন্যাশনাল ফাণ্ড" প্রবন্ধে। সেই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেন—

"আমাদের বাল্যকালের শিক্ষায় আমরা ভাষার সহিত ভাব পাই না, আবার বয়স হইলে ঠিক তাহার বিপরীত ঘটে, যখন ভাব জুটিতে থাকে তখন ভাষা পাওয়া যায় না। ……ভাষা শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ভাব শিক্ষা একত্র অবিচ্ছেদ্য ভাবে বৃদ্ধি পায় না বলিয়াই য়ুরোপীয় ভাবের যথার্থ নিকট সংস্পর্শ আমরা লাভ করি না এবং সেই জন্যই আজকাল আমাদের অনেক শিক্ষিত লোক য়ুরোপীয় ভাব সকলের প্রতি অনাদর প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অন্যদিকেও তেমনি ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মাতৃভাষাকে দৃঢ়সংবদ্ধরূপে পায় নাই বলিয়া মাতৃভাষা হইতে তাঁহারা দূরে পড়িয়া গিয়াছেন এবং মাতৃভাষার প্রতি তাঁহাদের একটি অবজ্ঞা জন্মিয়া গিয়াছে। …যেদিক হইতে যেমন করিয়াই দেখা যায় আমাদের ভাব, ভাষা এবং জীবনের মধ্যকার সামঞ্জস্য দূর হইয়া গিয়াছে।"

এই সম্পর্কে তাঁর মতামত আরো স্বচ্ছ ও পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেন বেশ ক'বছর পর রাজসাহী এসোসিয়েশনে পঠিত প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধ 'শিক্ষার হের ফের' নামে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের পৌষ সংখ্যা 'সাধনায়' (ডিসেম্বর ১৮৯২) প্রকাশিত হয়, এবং অবিলম্বে সুধীজনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

প্রবন্ধ পড়ে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমোহন বসু চিঠি লিখে রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানান এবং তাঁর বক্তব্যের প্রতি নৈতিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। শিক্ষার ধারা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল বক্তব্য নিম্নরূপ—

"স্বদেশী ভাষার সাহায্য ব্যতীত কথনোই স্বদেশের স্থায়ী কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না। দেশের অধিকাংশ লোকের শিক্ষার ওপর যদি দেশের উন্নতি নির্ভর করে, এবং সেই শিক্ষার গভীরতা ও স্থায়িত্বের উপর যদি উন্নতির স্থায়িত্ব নির্ভর করে তবে মাতৃভাষা ছাড়া যে তার কোন গতি নাই, একথা কেহ না বুঝিলে হাল ছাড়িয়া দিতে হয়।...... জ্ঞান বিজ্ঞান যেখানকারই হউক ভাষা মাতার হওয়া চাই। শিক্ষাকে এমন আকারে পাওয়া চাই যাহাতে ইচ্ছা করিলে আমরা সকল ভ্রাতা ভগিনীই তাহার সমান অধিকারী হইতে পারি। যাহাতে সেই শিক্ষা সুস্থ শরীরের পরিণত রক্তের মত সহজে সমাজের আপামর সাধারণের মধ্যে সঞ্চারিত হইতে পারে। কেবল সঙ্কীর্ণ স্থানবিশেষে বদ্ধ হইয়া একটা অত্যন্ত রক্তবর্ণ প্রদাহ উপস্থিত না করে।"

উক্ত প্রবন্ধ পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথকে লেখেন—

"পৌষ মাসের সাধনায় প্রকাশিত শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটি আমি দুই বার পাঠ করিয়াছি। প্রতি ছত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতে ঐক্য আছে। এ বিষয় আমি অনেকবার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট উত্থাপিত করিয়াছিলাম এবং একদিন সিনেট হলে দাঁড়াইয়া কিছু বলিবার চেষ্টা করিয়াছিলাম"। বঙ্কিমচন্দ্রের সিনেট হলে কিছু বলার চেষ্টা আশুতোষ কর্তৃক আনীত প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতার প্রতিই ইঙ্গিত।

যাহোক, "মাতৃভাষার পক্ষে সমর্থনসূচক বঙ্কিমচন্দ্রের এই পত্রটি 'শিক্ষার হেরফের' রচয়িতা রবীন্দ্রনাথের হাতে যে শুভ মুহূর্তে এসে পৌছেছিল—তা এক হিসেবে অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক মুহূর্ত। কেননা 'বঙ্গদর্শনের' মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র মাতৃভাষার জন্য যে আপোষহীন সংগ্রাম শুরু করেছিলেন, মৃত্যুর দুই বৎসর পূর্বে (১৮৯৪, ৮ই এপ্রিল-মৃত্যু) সেই গুরু দায়িত্বভার বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা যোগ্যতম উত্তরাধিকারীর হস্তে ঐতিহাসিক পত্রযোগেই যেন তিনি অর্পণ করে গেলেন।"[১]

১. মাতৃভাষা ও বঙ্কিমচন্দ্র : তপোবিজয় ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গ, ১৯জুন, ১৯৮১।

শিক্ষার ভাষা, বাহন বা মাধ্যম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের অজস্র উক্তি উদ্ধৃত করা যায়। রচনা অত্যধিক 'কোটেশন-কণ্টকিত' না করে বলা চলে যে আমাদের দেশে শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক কাঠামো নিয়ে এমন গভীরভাবে থিয়োরেটিক্যাল ও প্রাকৃটিক্যাল গবেষণা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেন নি। তাঁর রচনা ও সাধনার সার সংক্ষেপ করলে বোঝা যায়—

"রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ধরে দেশের শিক্ষা সমস্যা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছেন, অজস্র লিখেছেন, বলেছেন। শিক্ষাতত্ত্ব, নীতিপদ্ধতি ও তার প্রয়োগবিধি নিয়েও অনেক নতুন কথা তিনি বলেছেন। শুধু তাই নয়, সারা জীবন তিনি শিলাইদহ পাতিসর প্রভৃতি তাঁর জমিদারী এলাকায়, পরে শান্তিনিকেতনে বিদ্যালয় পরিচালনা এবং নিজে শিক্ষকতা করে সে-সব তত্ত্ব ও নীতির প্রয়োগ এবং পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছেন।··· রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাচিন্তার প্রধান বৈশিষ্ট্য : সর্বজনীন শিক্ষা বা দেশের বৃহত্তর জনগণের শিক্ষা,—কেবলমাত্র উচ্চশ্রেণীর বা ওপরতলার মুষ্টিমেয় সুবিধাভোগী বুদ্ধিজীবিশ্রেণীর শিক্ষা নয়। দেশের শিক্ষা-সমস্যা বলতে কবি এই সর্বজনীন শিক্ষা সমস্যার কথাই বুঝতেন। ···আর মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া কখনই জনশিক্ষা বা সর্বজনীন শিক্ষানীতি সফল বা বাস্তবায়িত হবে না বলে, কবি সারাজীবন বোঝাতে চেয়েছেন। শুধু প্রাথমিক স্তর পর্যন্তই নয়,—প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত কবি মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের কথা বলে এসেছেন।

"দ্বিতীয়ত, এতো বড়ো একটা সমগ্র মহাজাতির চিন্তার কৌলিন্য এবং সৃজন শক্তি ও প্রতিভা কখনই মাতৃভাষার মাধ্যম ছাড়া মুক্ত বা বিকশিত হতে পারে না। দু'শো বছরের ইংরেজ শাসনে এবং ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ হলেও বিশ্বের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে ভারতের প্রায় কোন মৌলিক অবদানই নেই। চিন্তা এবং জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই বন্ধ্যাত্ব দশা ঘটেছে বলে, কবি বার বার এই প্রশ্নে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছেন।

"তৃতীয়ত, ইংরেজি বা বিদেশী ভাষার মাধ্যমে কখনোই বিদ্যা বা শিক্ষার যথার্থ স্বাঙ্গীকরণ হয় না, এবং এই বিদ্যার যাচাই করার মত নিজস্ব বিচার বুদ্ধিও জন্মায় না·········ফলে ছাত্ররা সব সময় তোতা পাখির মত মুখস্থ করে পরীক্ষা পাশ ও ডিগ্রী-লাভ করতে বাধ্য হয়।

এই পরীক্ষা পাশ ও ডিগ্রী-লাভকে কবি সরাসরি চুরি বা চৌর্যবৃত্তি বলে অভিহিত করেছেন এবং শান্তিনিকেতনের শিক্ষা ব্যবস্থায় এই পরীক্ষাবিধিকে একেবারে শুরু থেকেই বর্জন করতে চেয়েছিলেন। "চতুর্থত, ইংরেজি ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে কবি অস্বীকার করতেন না, কিন্তু শিশুর শিক্ষার একেবারে শুরু বা প্রাথমিক স্তর থেকেই ইংরেজি শিক্ষার তিনি ঘোরতর বিরুদ্ধে ছিলেন।"*

একথা বিনা দ্বিধায় বলা চলে, ১৮৯৪ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের অন্তর্ধানের পর বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সংগ্রামের নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন যে দুই মনীষী, তাঁরা হলেন—বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, এবং বাইরে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা

আশুতোষের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল। এই ঘটনার পাঁচ বছর পর অন্যসূত্রে প্রশ্নটি আবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মুখে উত্থাপিত হয়। ১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়। ব্যক্তিগত অভিলাষ, উদ্যম ও প্রস্তাবনার কথা বাদ দিলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে প্রতিষ্ঠানগতভাবে বাংলা ভাষার পক্ষে সক্রিয় প্রচেষ্টা ও প্রচারাভিযানে নামেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির পীঠস্থান এবং বাঙালী মনীষী ও বুদ্ধিজীবীদের মিলন মন্দির।

১৮৯৩ সালের ২৩ জুলাই (৮ শ্রাবণ, ১৩০০ বঙ্গাব্দ) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিষ্ঠা হয়—for the Improvement of Bengali Language and Literature। এ জাতীয় একটি পরিষদের প্রথম পরিকল্পনা করেন তার ২১ বছর পূর্বে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে জন্ বীমস্, (John Beams, I. C. S.) নামে জনৈক ইংরেজ সিভিলিয়ান। কলিকাতা হইতে প্রকাশিত একটি 'Pamphlet' বা ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন ও উন্নয়নের জন্য তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য সমাজ 'বঙ্গ একাডেমি' (Academy of Literature for Bengal) প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন। ....১৮৬১ হইতে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৩ বৎসর কাল বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সিতে বিভিন্ন বিভাগের কমিশনার এবং বোর্ড অব্ রেভিনিউয়ের সদস্য পদে নিযুক্ত থাকা

* রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা চিন্তা : নেপাল মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গ, ১৭ই এপ্রিল, ১৯৮১।

কালীন বীমস্ নব্য ভারতীয় আর্যভাষা সমূহের ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের তুলনামূলক আলোচনা করেন। *** জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় জন্ বীমস্‌কে 'the founder of modern Indo-Aryan Linguistics'—বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পরিষদের এই উদ্দেশ্য উদ্যোগ এবং যাঁরা সে বিষয়ে অনুপ্রেরণাদাতা ছিলেন সে সম্পর্কে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা অবশ্যই প্রাসঙ্গিক।

"বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের নথি হইতে দেখা যাইতেছে যে ১৩০১ বঙ্গাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাহিত্য ব্যতীত ভূগোল ইতিহাস গণিতাদি বিষয়ে বাঙ্গলা ভাষায় শিক্ষাদান ও পরীক্ষা গ্রহণ প্রবর্তন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায়—এফ. এ. ও বি. এ. পরীক্ষায়—সংস্কৃত ভাষা আলোচনার সহিত বাংলা ভাষা আলোচনার ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য আলোচনা ও আন্দোলন করেন।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের দ্বিতীয় বর্ষে ১৩০১ বঙ্গাব্দে রমেশচন্দ্র দত্ত সভাপতি এবং কবি নবীন সেন ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সহ-সভাপতি নির্বাচিত হওয়ার পর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সদস্যগণ নূতন উদ্দীপনা ও নবীন কর্মপ্রেরণা লইয়া কাজে অগ্রসর হন। দ্বিতীয় বর্ষের তৃতীয় অধিবেশনে ২৯ জুলাই ১৮৯৪ (১৪ই শ্রাবণ, ১৩০১) মাননীয় বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, সারদারঞ্জন রায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ, রবীন্দ্র সুহৃদ শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বৈজ্ঞানিক প্রমথ-নাথ বসু, নবীনচন্দ্র দাস, রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, রাজেন্দ্রনাথ শাস্ত্রী, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ, কৃষ্ণবিহারী সেন, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, নিত্যকৃষ্ণ বসু, বীরেশ্বর পাঁড়ে, অমৃতলাল রায়, শরৎচন্দ্র চৌধুরী, দীননাথ সেন, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ২৭ জন সাহিত্য শিক্ষা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তি সাহিত্য পরিষদের সভ্য রূপে যোগদান করেন।

এই সভাতেই নাট্যকার মনোমোহন বসু প্রস্তাব করেন যে, "বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সৃষ্টি হইয়াছে, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে এফ.এ. ও বি.এ. পরীক্ষায় যাহাতে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা আলোচনা হয়, তন্নিমিত্ত পরিষদের পক্ষ হইতে চেষ্টা করা উচিত।" বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর পরীক্ষায় বাঙ্গালা প্রবর্তনের চেষ্টায় ইহাই পরিষদের প্রথম আলোচনা ও পদক্ষেপ।

পরবর্তী অধিবেশনে অর্থাৎ চতুর্থ অধিবেশনে ১১ই ভাদ্র ১৩০১ (২৬ আগষ্ট, ১৮৯৪) স্যার রমেশচন্দ্র মিত্র, বিচারপতি চন্দ্রমাধব ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ গুপ্ত, বরদাচরণ মিত্র, কুঞ্জবিহারী বসু, জগদীশ চন্দ্র লাহিড়ী, মহেন্দ্রনাথ রায়, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, দাশরথি ঘোষ ও কুমিল্লার দীনেশ চরণ (চন্দ্র) সেন পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হন।

ঐ সভাতেই হীরেন্দ্রনাথ দত্তের এবং রজনীকান্ত গুপ্তের দুইখানি পত্রে উত্থাপিত প্রস্তাব আলোচিত হয়। হীরেন্দ্রনাথের প্রস্তাব ছিল যে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় গণিত ইতিহাস ভূগোলাদি বিষয় ইংরেজির স্থলে বাঙ্গালায় প্রশ্নোত্তর লেখা এবং এই বিষয়গুলি মাতৃভাষায় শিক্ষা প্রবর্তন করা এবং এ বিষয়ে পরিষদ হইতে আন্দোলন করা।

রজনীগুপ্তের প্রস্তাব ছিল যে বাঙ্গালা ভাষার ক্রমে উন্নতি হওয়ায় এবং অনেক ভাল গ্রন্থ বাংলায় রচিত হওয়ায় উচ্চ শ্রেণীর ইংরেজি স্কুল ও কলেজে বাঙ্গালার আলোচনা পূর্বাপেক্ষা অধিকতর করা। বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ.এ. পরীক্ষায় বাংলা রচনা ও অনুবাদের নিয়ম প্রবর্তন করা, বি.এ. পরীক্ষায় পাস্‌কোর্সে সংস্কৃতের সহিত বাঙ্গালা ভাষায় পাঠ্য পুস্তক নির্ধারণ করা এবং অনার্স কোর্সে বাংলা রচনার নিয়ম প্রবর্তন করা, এবং এ বিষয়ে পরিষদ হইতে আন্দোলন করা। বঙ্গদেশের শিক্ষা বিষয়ক ইতিহাসে পরিষদের এই প্রস্তাব উল্লেখযোগ্য।...[২]

যা হোক, যখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হল তখন পরিষদের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের নবীন প্রবীন সকল সাহিত্যিকই যুক্ত ছিলেন। পরিষদ কলেজীয় শিক্ষায় বাংলা পড়ায় উৎসাহ দান এবং পরীক্ষায় ছাত্রদের অকারণ অসাফল্য দূরীকরণার্থ কতগুলি প্রস্তাব দেন। এই বিষয়ে তদারক করবার জন্য নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে এক কমিটি গঠিত হয়:

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৩। নন্দকৃষ্ণ বসু
৪। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত
৫। রজনীকান্ত গুপ্ত

২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ—মদনমোহন কুমার

সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাবের পরিণতি : বাংলা সাহিত্যের ভাগ্যে মুষ্টিভিক্ষা

তৎকালীন বঙ্গীয় বিদ্বজন সমাজে এই যে আলোড়ন উঠে, তার ঢেউ এসে লাগে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে। সাহিত্য পরিষদের সুপারিশের ভিত্তিতে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (তখন আর উপাচার্য নন্) ফ্যাকালটি অফ্ আর্টস-এর সভায় বিবেচনার্থে এক প্রস্তাব করেন। ফ্যাকালটি অফ্ আর্টসের সে সভার কার্য-বিবরণীটুকু উদ্ধৃতিযোগ্য—

505. The Hon'ble Mr. Justice Gooroodass Banerjee moved that a Committee be appointed to consider and report on the following proposals made by the President of the Bangiya Sahitya Parishad :—

(1) "That at the F.A. Examination and the B.A. Examination in the A Course, where classical language is taken as the third subject, a paper be set containing :—

(i) passages in English for translation into one of the vernaculars of India recognised by the Senate, and

(ii) a subject of original composition in one of the said vernaculars, Text books being recommended as models of style.

(2) That the University be moved to adopt a regulation to the effect that in History, Geography and Mathematics at the Entrence Examination, the answer may be given in any of the living languages recognised by the Senate".

Babu Gopalchandra Sarkar seconded the motion.

প্রস্তাব উত্থাপিত হল, সমর্থিত হল। এবার আলোচনা শুরু :—

Babu Herambachandra Maitra, Rev. H. Whitehead and Mt. Prothero opposed the appointment of a Committee.

Mr. Abdur Rahaman, Rev. Father E. Lafont, Babu Jogindrachandra Ghosh and Babu Lalbihari Mitra spoke against the motion and Hon'ble A. M. Bose, Rai Jyotindranath Chaudhuri and Babu Umeshchandra Datta supported it.

Maulavi Abdul Kasim wished to support the first resolution of the Parishad.

The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee having replied, the President put the motion that a Committee of the Faculty of Arts be appointed to consider and report on the first resolution of the Parishad. This was carried, 22 voting for and 21 against it.

The motion that a Committee of the Faculty of Arts be appointed to consider and report on the second resolution of the Parishad was put to the meeting and lost.*
The Hon'ble Mr. Justice Gooroo Dass Banerjee then proposed that the undermentioned gentlemen be appointed member of a Committee to consider and report on the first resolution of the Parishad :—

বাংলা ভাষা বিরোধীরা কেমন সক্রিয় ও জোটবদ্ধ তা ভোটের ফলাফলেই সুস্পষ্ট। মাত্র এক ভোটে প্রস্তাবের অতি নিরীহ প্রথম অংশ পাস হল, কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ দ্বিতীয় প্রস্তাবটি ভোটে নাকচ হয়ে গেল। তবু যা হোক, প্রথম প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য স্যার গুরুদাস-এর প্রস্তাব মতো নিম্নলিখিত উপসমিতি গঠিত হয়—

১. ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার
২. বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য
৩. মহামহোপাধ্যায় মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন
৪. রেভাঃ ফাদার ই. লাফোঁ
৫. মাননীয় এ. এম্. বোস
৬. পি. কে. রায়
৭. ডঃ রাসবিহারী ঘোষ
৮. মাননীয় মৌলবী মুহম্মদ ইউসুফ, খানবাহাদুর
৯. এইচ. এম. পার্সিভাল
১০. রেভাঃ ডাঃ জে. হেকটর
১১. বাবু গোপালচন্দ্র সরকার
১২. এন. এন. ঘোষ
১৩. এ. এফ. এম. আবদুর রহমান
১৪. বাবু চন্দ্রনাথ বসু

---

*. Minutes of the Faculty of Arts, March 28, 1896.

১৫. বাবু হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

১৬. ডঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৭. স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সেই কমিটির রিপোর্ট ফ্যাকালটি অফ্ আর্টস্-এর সভায় ১২ ডিসেম্বর ১৮৯৬ পেশ হল—

> "An optional paper requiring an original composition in Bengali or Urdu shall be set at the F. A./B. A. Examination, proficiency in which shall entitle a candidate to a special certificate but which will not be counted towards a pass."[8]

এবং অবশেষে সিনেট সিণ্ডিকেট ছুঁয়ে আইনে পরিণত হয়ে যা দাঁড়াল, তা যেমনি পানসে তেমনি জলো। সাব-কমিটিতে যদিও বাংলা ভাষার সমর্থনকারীরা সংখ্যায় অধিক ছিলেন, কিন্তু বৈপ্লবিক কিছু করতে গেলে তা যে ফ্যাকালটিতে সরাসরি নাকচ হয়ে যাবে, তা আঁচ করে ভূরিভোজের আশা ছেড়ে বিদুরের খুদ কুড়োতেই সন্তুষ্ট হয়ে রইলেন।

এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দী সমাপ্ত হল। ব্যর্থ হল আশুতোষ ও গুরুদাস-এর বাংলা ভাষার বন্ধন মুক্তির ঐকান্তিক প্রয়াস। আশুতোষ কিন্তু এই ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানি কখনও ভুলতে পারেন নি। তিনি অপেক্ষায় থাকেন উপযুক্ত সময় ও সুযোগের।

---

৪. Minutes of the Faculty of Arts, 12. 12. 1896.

দ্বাদশ অধ্যায়

আশুতোষ পর্ব (খ)

বাংলা ভাষা সমেত মাতৃভাষায় এম. এ. পরীক্ষা

র‍্যালে কমিশনের সুপারিশে গুরুদাস-আশুতোষের চিন্তাধারার প্রতিফলন—বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষ—প্রথম সমাবর্তন ভাষণে মাতৃভাষার উন্নয়ন ও অনুশীলনে ছাত্রদের প্রতি আহ্বান—বিশ্ববিদ্যালয় পাঠক্রমে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্তি—বাংলা সাহিত্যে গবেষণা কার্যক্রমের সূচনা—বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের যোগাযোগ—'স্পেশাল রিডার' ও 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' হিসেবে দীনেশ সেনের অমূল্য অবদান—রবীন্দ্রনাথকে 'অনারারি' ডি.লিট. ডিগ্রী দান—মাতৃভাষার মর্যাদায় অভিভূত আশুতোষের স্মৃতিচারণ—বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক ভারতীয় ভাষায় সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের ব্যবস্থা—বাংলা ও অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এম.এ পরীক্ষা—শিক্ষিত সমাজের বাংলাভাষা বিদ্বেষ—সমাজ জীবনে ইংরেজির প্রভাব : লোক-কবিদের দৃষ্টিতে—মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে জাতীয় সংহতি—সভাসমাবেশে আশুতোষের সওয়াল—আপনি আচরি ধর্ম।

* * * *

র‍্যলে কমিশনের অনুকূল সুপারিশে গুরুদাস-আশুতোষের চিন্তাধারার ছাপ

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই আশুতোষ সে সময় ও সুযোগের সন্ধান পেলেন। আগেই বলা হয়েছে যে স্যার গুরুদাস ও আশুতোষ 'র‍্যলে' কমিশনের সদস্য ও স্থানীয় সদস্য ছিলেন। দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে কমিশনের রিপোর্টে যে অনুকূল সুপারিশ ছিল, তা তাঁদের চিন্তাভাবনারই ফসল—

> "In 1902 the Indian Universities Commission noted with regret that "the study of Vernacular languages has received insufficient attention and ...... many graduates have a very inadequate knowledge of their mother-tongue." Among the proposals made by the Commission for encouraging the study of vernacular languages were the following :—

"1. Vernacular Composition should be made compulsory in every stage of the B. A. course, but the subject need not be taught.

2. Vernacular languages should be introduced in combination with English as a subject for the M. A. Examination.

3. The establishment of Professorships in the Vernacular languages is an object to which University funds may properly be devoted.

4. Further encouragement should be given to the study of Vernacular languages by the offer of prizes for literary and scientific work."[১]

কমিশনের রিপোর্টে দেশীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আশুতোষেরই অভিমত ব্যক্ত হয়েছে বলে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ মন্তব্য করেন—

"The Commission headed by Sir Thomas Raleigh which presented its Report in 1901 accepted Asutosh's twelve-year old proposal that Indian languages be a part of University courses in arts for all examinations. Gooroodass Banerjee was a member of the Commission and obviously paragraphs 94 to 96 of the Report relating to the study of our vernaculars in our Universities embody his opinion on the subject. We can imagine how Gooroodass consulted Asutosh on this question and it is important to remember that the recommendations of the Raleigh Commission are in line with what Asutosh had proposed for the inclusion of vernaculars in University studies in his historic letter of 1 March, 1891 addressed to Calcutta University's Registrar. The Raleigh Commission Report recommended that 'the M. A. Examination in the Vernacular should be of such a character as to ensure a thorough and scholarly study of the subject. The encouragement of such study by graduates, the Report further said, 'who have completed their general course should be a great advantage for the cultivation and development of Vernacular language.''[২]

---

১. Hundred Years of the University of Calcutta, Vol. 1, 1957.

২. Sir Asutosh Mookerjee Annual Lecture—1980—R. K. Dasgupta

উপাচার্য পদে আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২৪ ফেব্রুয়ারী লর্ড কার্জনের অনুমোদন পেল, এবং ১ সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকরী হল। আর চার মাসের মধ্যে ১৯০৫ সালে একই বাংলা ভাষাভাষী বাংলাদেশ রাজনৈতিক কারণে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল। এই ক্রুর সিদ্ধান্ত ঘোষণার মাস ছয়েকের মধ্যে ১৯০৬ সালের ৩১ মার্চ বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী তুমুল আন্দোলনের মাঝে দ্বিতীয় ভারতীয় উপাচার্য হিসেবে আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরলেন। যে আইনের তিনিই ছিলেন অন্যতম কঠোর সমালোচক, সেই আইনই কার্যক্ষেত্রে রূপায়ণের ভার পড়ল তাঁর উপর।

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন ও জাতীয় শিক্ষা পরিষদ

একথা অবশ্যই অনস্বীকার্য যে, "সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও উচ্চ শিক্ষা সমাজের এক অংশকে স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তুলেছিল, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটছিল, ক্রমেই তাঁরা জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছিলেন তারই প্রাকাশ ঘটল ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনে। বঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল সমগ্র বাংলাদেশ। বিদেশী পণ্যসামগ্রী বর্জনের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণমুক্ত জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার আহ্বান জানালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল, আশুতোষ চৌধুরী, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ। গঠিত হল জাতীয় শিক্ষা পরিষদ (১১.৩.১৯০৬) এবং তাঁদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হল 'বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ অ্যাণ্ড স্কুল'। এই প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের নীতি গৃহীত হলেও ইংরেজি ভাষাকে আবশ্যিক রাখা হল।" (শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা প্রচারিত পুস্তিকা)

বিদেশী পণ্য শুধু নয়, বিদেশী শিক্ষাদীক্ষার প্রতি প্রচণ্ড ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ আবহাওয়ার মধ্যে 'গোলাম তৈরীর কারখানা' বলে অভিহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাণ্ডারীরূপে আশুতোষ অভিষিক্ত হলেন। এবং পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী বিতরণের প্রতিষ্ঠানকে জ্ঞানবিজ্ঞানের সকল বিভাগে পঠনপাঠন, চর্চা ও গবেষণার সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত করে বিশ্ববিদ্যালয় নামের সার্থকতা প্রমাণে ব্রতী হলেন।

আশুতোষের প্রথম সমাবর্তন ভাষণ : নব-দীক্ষিত স্নাতকদের প্রতি আহ্বান

উপাচার্য রূপে প্রদত্ত প্রথম সমাবর্তন ভাষণে আশুতোষ চিরাচরিত মন্ত্রোচ্চারণে স্নাতকদের অভিষিক্ত করলেন—

"By virtue of the authority vested in me as Vice-Chancellor of this University, I admit you to the degree of .... and charge you that ever in your life and conversation, you show youself worthy of the same."

এবং সে সঙ্গে মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধিসাধনে নবদীক্ষিত ছাত্রদের দায়িত্ব ও কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন :—

"Above all, sedulously cultivate your Vernacular, for it is through the medium of the Vernacular alone that you can hope to reach the masses of your countrymen."[৩]

মাতৃভাষা চর্চা এবং অনুশীলনের মাধ্যমে জনগণের কাছাকাছি পৌঁছবার এমন উদাত্ত আহ্বান বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র এবং আশুতোষের কণ্ঠে প্রায় সমস্বরে ধ্বনিত হয়েছিল—হোক না তাতে কমবেশী ৭৫ বছরের ব্যবধান।

ম্যাট্রিক, আই. এ. এবং বি. এ. পরীক্ষায় স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে বাংলা ভাষা

১৯০৪ খ্রীঃ নতুন আইনের ১৯ নং ধারায় বাংলা সমেত অন্যান্য দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য নিয়ে গবেষণা এবং তাদের শ্রীবৃদ্ধির জন্য সিণ্ডিকেটকে নিম্নরূপ ক্ষমতা দেওয়া হল—

"19. With a view to encourage research in Vernacular literatures and languages, and foster their growth, the Syndicate may with the sanction of the Senate, provide grants, prizes or scholarships for—

(a) Critical editions of early vernacular text ,
(b) Historical investigations of the origins of vernacuiar literatures and their early development;

৩. Covocation Address, March 2, 1907

(c) Philological investigations of Indian vernaculars and their dialects."[8]

এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল আশুতোষের হাতে। কিন্তু সবকিছুই তাঁর ইচ্ছানুসারে হবার নয়। সিনেট ও ফ্যাকাল্টিতে তাঁর প্রতিপক্ষ দারুণ শক্তিশালী, মাতৃভাষার বিরোধিতায় এককাট্টা। তারা যে ভাবে আদা জল খেয়ে মাতৃভাষা চর্চার বিরুদ্ধে লেগেছে, তাতে কোনও বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের আশা সুদূরপরাহত। বিগত পনের ষোল বছরে তিনি সদস্যদের নাড়ীনক্ষত্র চিনে ফেলেছেন ; এদের মতিগতি চিন্তাভাবনা সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েছেন। সুতরাং তড়িঘড়ি কোন সিদ্ধান্ত, বিশেষতঃ মাতৃভাষা পঠনপাঠন সম্পর্কীয়—কাে রূপদানের চেষ্টা না করে তিনি শনৈঃ শনৈঃ এগোনই যুক্তিযুক্ত মনে করলেন। জগদ্দল পাথরের গায়ে পূর্ণাঙ্গ মূর্তি খোদাইয়ে সময়ক্ষেপ না করে, তিনি তিল তিল করে তিলোত্তমা সৃষ্টিতে মন দিলেন। মাতৃভাষার উন্নয়নে শুধুমাত্র ছাত্রদের আহ্বান জানিয়েই কর্তব্যকর্ম ইতি করলেন না ; তৃণমূল স্তরে তার ক্ষেত্র প্রস্তুতে কোমর বেঁধে লাগলেন। ১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইনে মাতৃভাষা সম্পর্কে চর্চা ও গবেষণার জন্য যেটুকু কৃপণসুলভ বিধান রাখা হয়েছিল, তাকে অবলম্বন করেই তিনি তাঁর বহুদিন লালিত স্বপ্নকে বাস্তবে রূপদানের পথে পা দিলেন। ঐ আইনের ১৯ নং ধারা মোতাবেক আশুতোষ যে নব বিধান প্রণয়ন করেন, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাতে ম্যাট্রিকুলেশন থেকে বি. এ. স্তর পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য অধ্যয়ন ও পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে দীনেশচন্দ্র সেনের যোগাযোগ

উল্লিখিত বিধানমতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের ওপর ধারাবাহিক বক্তৃতা দেবার জন্য আশুতোষ ১৯০৯ সালে "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রন্থ প্রণেতা দীনেশচন্দ্র সেনকে "স্পেশাল রিডার" (Special Reader) নিযুক্ত করেন। "বিশ্ববিদ্যালয়-এর আঙিনায় আশুতোষ ও দীনেশচন্দ্রের মিলন এক কথায় মণি-কাঞ্চন যোগ। একজন এদেশে বিশ্ববিদ্যার বিধাতা, আর একজন 'সুহাসিনী সুমধুর ভাষিনী' মায়ের আত্মহারা সন্তান।" (ডঃ জনার্দন চক্রবর্তী—সুবর্ণলেখা)

8. Calcutta University Act. 1904.

১৯০৯ সালের ১৩ মার্চ প্রদত্ত সমাবর্তন ভাষণে পূর্বোক্ত বক্তৃতামালার কথা সগর্বে উল্লেখ করে আশুতোষ বলেন—

"......we have had a long series of luminous lectures from one of our graduates, Babu Dineschandra Sen, on the fascinating subject of the History of the Bengali Language and Literature. These lectures take a comprehensive view of the development of our vernacular, and their publication will unquestionably facilitate the historical investigation of the origin of the vernacular literature of this country, the study of which is avowedly one of the foremost objects of the new Regulations."[৫]

এই বক্তৃতাবলী "History of Bengali Language and Literature" নামে সুশোভিত চিত্রাদি সজ্জিত হয়ে ১৩৩০ পৃষ্ঠার এক সুবৃহৎ পুস্তকাকারে ১৯১১ সালে প্রকাশিত হলে, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস চর্চায় এক নব-দিগন্তের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা নিয়ে কোনও অবাঙালী বা বিদেশী ছাত্র এম. এ. পরীক্ষা দিতে চাইলে, তাদের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হবে বলেই আশুতোষ এই বক্তৃতা মালা ইংরেজিতে দেবার জন্য দীনেশচন্দ্র সেনকে উদ্বুদ্ধ করেন। এই একটিমাত্র পুস্তকের মাধ্যমে বিদেশীরা বাংলা ভাষা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠেন। প্রকৃতপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা সম্পর্কে গবেষণাধর্মী পুস্তক প্রকাশের এই সূত্রপাত, যদিও ইংরেজিতে। বিদেশীরা প্রশংসা না করলে দেশীয় লোকদের কোনও সৃষ্টি দেশবাসীর মনে ধরে না। বিদেশী পণ্ডিত মণ্ডলী এই পুস্তকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। প্রসিদ্ধ ফরাসী ভারত বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক সিলভাঁ লেভি এক পত্রে দীনেশচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখেন—

"I cannot give you praises enough ...... your work is a *Chintamani* ...... a *Ratnakar*. No book about India would I compare with yours .... Never did I find such a realistic sense of literature..... Pundit and Peasant, Yogi and Raja mix together in a Shakespearian way on the stage you have built up."

৫. Convocation Address, 13.3.1909.

১৯১২ সালে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে গবেষণামূলক রচনা ও বক্তৃতা প্রদানের জন্য "রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপ" প্রচলিত হয়। দীনেশচন্দ্র সেন ১৯১৩ সালে প্রথম 'রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো' নিযুক্ত হন। রিসার্চ ফেলোর কর্তব্য নির্ধারিত হল—

"1. To devote himself to the investigation of the History of Bengali Language and Literature from the earliest times.

2. To deliver annually a course of twelve public lectures embodying the results of his investigations; the lectures to be published by the University.

3. To submit to the Syndicate every six months a repor of the progress of work done by him during the preceding six months." (C. U. Calendar)

"রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলো" হিসেবে গবেষণা ও ভাষণদান উপলক্ষে দীনেশচন্দ্র যে সব গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলি হল-বঙ্গ সাহিত্য পরিচয় (Typical Selections from old Bengali Literature), চৈতন্য ও তাঁহার পার্ষদগ (Chaitauya and His Companions), বাংলা রামায়ণ (The Bengali Ramayanas), বাংলার লোক সাহিত্য (The Folk Literature of Bengal), Glimpses of Bengali Life ইত্যাদি।

জাতীয় ভাষা চর্চা ও গবেষণার ক্ষেত্রে একের পর এক পদক্ষেপ নিতে লাগলেন আশুতোষ। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেলেন।

রবীন্দ্রনাথকে "সম্মানসূচক ডি. লিট." ডিগ্রী দান

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ১৯১৩ সাল সগৌরবে উল্লেখযোগ্য বর্ষ। ঐ বছর রবীন্দ্রনাথ সাহিত্যে 'নোবেল পুরস্কার' (Nobel Prize) লাভ করেন। কিন্তু নোবেল পুরস্কার ঘোষণার আগেই আশুতোষের প্রেরণায় বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে D. Litt. (Honoris Causa) উপাধিতে ভূষিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। সে বছর সমাবর্তন ভাষণে কবিকে উপাধি প্রদান উপলক্ষে আশুতোষ নিজের ভাবাবেগ সম্বরণ করতে পারেন নি। মাতৃভাষার লজ্জা দূরীকরণে তাঁর দীর্ঘ সংগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বারংবার পরাস্ত হলেও, বিশ্বের বিদ্বজ্জনসভায় যে বাংলা

সাহিত্য যশের মুকুট লাভ করেছে, তাতে তাঁর আনন্দের সীমা ছিল না। তাঁর সেই পরাজয় এবং পঁচিশ বছরের সংগ্রামের স্মৃতিচারণ করে তিনি বলেন—

> "It is now twenty-three years ago that a young and inexperienced member of the Senate earnestly pleaded that a competent knowledge of the vernaculars should be a pre-requisite for admission to a Degree in the Faculty of Arts in this University. The Senators complimented the novice on his eloquence and admired his boldness, but doubted his wisdom, and by an overwhelming majority, rejected his proposal, on what now seems the truly astonishing ground that the Indian Vernaculars did not deserve seroius study by Indian students who had entered an Indian University. Fifteen years later, the young Senator then grown maturer, repeated his effort, with equally disastrous result. In the year following he was, however, more fortunate and persuaded the Government of Minto to hold that 'every student in this University should, while still an undergraduate, acquire a competent knowledge of his vernacular, and that his proficiency in this respect should be treated precisely in the same manner as in the case of any other branch of knowledge and should be treated as an essential factor of success in his academic career."[৬]

তারপর রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দিত করে তিনি বলেন—

> "........our national poet who to our pride and satisfaction is at the present moment not only the most important figure in the field of Bengali literature, but also occupies a place in the foremost rank amongst the living poets of the world."[৭]

(আমাদের জাতীয় কবি কেবলমাত্র বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব নন; বিশ্বের জীবিত কবিকুলের মাঝেও তিনি সর্বাগ্রে স্থান দখল করেছেন, তার জন্য আমরা গর্বিত ও আনন্দিত।)

স্মরণ রাখা উচিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই সর্বাগ্রে রবীন্দ্রনাথকে 'জাতীয় কবি' বা 'বিশ্বকবি' বলে অভিহিত করেন। আশুতোষের অনুরোধে কবি

৬, ৭. Convocation Address, December 26, 1913.

বিশ্ববিদ্যালয়ে 'সাহিত্য', 'তথ্য ও সত্য' এবং 'সৃষ্টি' নামে তিনটি বক্তৃতা দান করেন। আশুতোষ মনে করতেন, শিক্ষাক্রমে বাংলা সাহিত্যকে অন্তর্ভুক্ত করা শুধু নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে মৌলিক সাহিত্য সৃষ্টিকে স্বীকৃতি ও প্রেরণা দেওয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম কর্তব্য। তাঁর একান্ত ইচ্ছায় ১৯২১ সালে 'জগত্তারিণী স্বর্ণ-পদক' সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেওয়া হয়—

"(being) most eminent for original contribution to letters ..."[৮]

এভাবে দীর্ঘ পঁচিশ বছর সংগ্রামের পর বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষার বন্ধন দশা মুক্ত হল। কবিকে ডি. লিট. ডিগ্রী প্রদান উপলক্ষে আহূত সিনেট সভায় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে আশুতোষ বললেন—

"After a struggle of a quarter of a century, the elementary truth was thus recognised that if the Indian Universities are ever to be assimilated with our national life, they must ungrudgingly accord due recognition to the irresistible claims of the Indian Vernaculars."[৯]

যে সুদৃঢ় বিশ্বাস, আত্মপ্রত্যয়, অদম্য উদ্দীপনা এবং জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলাকাঙ্খা এসব ভাষণের উৎস, তা ইংরেজিতে প্রদত্ত হলেও যে কোনও সৎ এবং সংবেদনশীল পাঠকের মর্মমূলে অনুরণন তুলবে।

সমাজ জীবনে ইংরেজি শিক্ষার ছাপ : লোক কবিদের দৃষ্টিতে

বাহির বিশ্বে বিদ্বজ্জন সমাজে বাংলার কবি তো নন্দিত বন্দিত হলেন, কিন্তু কবির নিজ ঘরে বাংলা ভাষার প্রতি শিক্ষিত ও পণ্ডিত সমাজের বড়ই বিরূপ মনোভাব। তখনও দেশে 'read in English, write in English, think in English', এমন কি 'dream in English'—এর প্রবল হাওয়া বইছে। সেকালের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিগণ—

"বিলাতি ধরনে হাসি
ফরাসী ধরনে কাশি
পা ফাঁক করিয়া সিগারেট খেতে" বড্ডো ভাল বাসতেন।

৮. Regulations for Award of Jagattarini Gold Medal.

৯. Convocation Address, December 26, 1913.

ইংরেজি শিক্ষার প্রভাব সামাজিক আচার আচরণেও কেমন প্রতিফলিত হয়েছিল, তার পরিচয় মেলে তৎকালীন কবিয়ালদের গানে :—

১। এফ.এ. বি.এ. পাস করে,
সাময়িক ইংরেজি পড়ে,
হয়েছে ইংরেজের অফিসার ;
বলে মা মাসী পিসিরে 'লেডি'
বাবারে কয় "মাই ডিয়ার"।
ইষ্টদেব বাড়িতে এলে,
তুষ্টার্থে "গুড মর্ণিং" বলে,
ইষ্ট বাক্যে রুষ্ট হলে—
"রাস্‌কেল বয়" কয় রাগের বশে।
কলিতে অধর্ম প্রবল, স্বধর্ম বিনাশে।

(অর্জুন সরকার—ত্রিপুরা)

২। আগে মান্যবরে মান্য দিতে—
নত শিরে করতাম নমস্কার—,
এখন লোপ হয়েছে তার ;
আমরা এ. বি. সি. ডি. রিডিং করে—
ভুলেছি সব সাধুর ব্যবহার।
ভর্তি হয়ে হাই স্কুলে,
মাতৃভাষা গেলেম ভুলে,
মান্য ব্যক্তি কাছে এলে—
হাত তুলে কই "গুড মর্ণিং মিষ্টার"।

(অম্বিকা পাটনী—ঢাকা)

বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজের বিজাতীয় মনোভাব

এ রকম বিজাতীয় পরিবেশে বাংলাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যথাযোগ্য আসন দানে আশুতোষ যে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালান, তাকে এক কথায় বল

যায় ধর্মযুদ্ধ, জেহাদ, (crusade)। প্রতিবাদে প্রবল প্রতাপান্বিত প্রতিপক্ষের প্রচণ্ড প্রতিরোধ প্রতিহত করে তিনি তাঁর অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছেন। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে সেদিনের ইংরেজি শিক্ষিত ব্যক্তিদের অত্যন্ত বিরূপ ধারণা। "বাংলা স্নাতকোত্তর বিভাগ (অন্যান্য ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষা বিভাগ সমেত) যে এই দেশের প্রকৃত হিতার্থে সংগঠিত হয়েছে—সে কথাটা বোঝাতে সেদিন আশুতোষকে কম বেগ পেতে হয় নি।" একদিন ফ্যাকাল্টির সভায় প্রকাশ্যভাবে এক প্রবীণ পণ্ডিত বলিয়া উঠিলেন, "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে কি ছাই-ভস্ম আছে? এক রবীন্দ্রনাথের পুস্তক পড়িলেই বাংলা সাহিত্যের সার কবিত্ব পাওয়া যায় এবং তাহা তো আমাদের মেয়েরাও পড়িয়া বোঝে। বাংলায় মুদি দোকানের পাঠ্য কতকগুলি খাতাপত্র পড়াইবার জন্য আবার এম. এ. ক্লাস! তাহার আবার অধ্যাপক!" বাংলা ভাষা সাহিত্য সম্পর্কে ইহাই ছিল সেদিনকার মনোভাব।[১০]

এ ধরনের বিকৃত ও বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন লোকের সংখ্যা কম হলেও তারা ছিল সঙ্ঘবদ্ধ। তাই তড়িঘড়ি কোন কাজে হাত দিয়ে বেকুব বনতে আশুতোষ রাজি ছিলেন না। সব কাজেই তিনি আটঘাট বেঁধে নামতেন এবং সফল হতেন। বাংলা ভাষার ব্যাপারেও তার অন্যথা ছিল না।

বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা : আশুতোষের পরিকল্পনা ও রূপায়ণ

দীনেশচন্দ্রের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস রচনা এবং রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি তাঁর প্রচেষ্টাকে অর্ধেক সাফল্য এনে দিল। বাংলায় এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণের বিলম্বের জন্য দীনেশ সেন আশুতোষকে অনুযোগ করলে সুকৌশলী আশুতোষ বলেন—

"আপনি ত বাঙ্গালায় এম. এ. পরীক্ষার জন্য আমায় বহুদিন ধরে অনুরোধ করেছেন; আপনি ভেবেছিলেন, আমি একেবারে উদাসীন। তা নয় দীনেশ-বাবু, তোড়জোড় নেই, কি নিয়ে কাজ করব, শেষে একটা কাণ্ড করে বেকুব বনব? এই কয় বৎসর ধরে আমি আপনাকে দিয়া 'বঙ্গ সাহিত্য পরিচয়' সঙ্কলন করাইয়াছি—ইংরাজীতে বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস লিখাইয়াছি, বৈষ্ণব সাহিত্যের ইতিহাস, গ্রাম্য কথা সাহিত্যের ইতিহাস প্রভৃতি কত

১০. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন

কি বই লিখাইয়াছি। রামতনু লাহিড়ী রিসার্চ ফেলোশিপের সৃষ্টি করিয়াছি দাশগুপ্ত, বিজয়বাবু প্রভৃতি অধ্যাপকদের দ্বারা বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের সম্বন্ধে বই তৈরী করাইয়াছি—কোন একটা উদ্দেশ্য ছাড়া এই সকল করিয়াছি কি? এম. এ. পরীক্ষা হইবে, কি পড়াব? তার তো একটা ব্যবস্থা আগে করে ফেলে তবে তো কাজে হাত দেব? আপনারা চেঁচামেচি করেছেন, ততক্ষণে আমি জমি তৈরী করে নিয়েছি।"[১১]

ভারতীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের অনুকূল অভিমত

বাংলা ভাষার পক্ষে সংগ্রামে আশুতোষের হাতে আর একটি আয়ুধও সংযোজিত হল। সেটি স্যাডলার কমিশনের রিপোর্টে (আশুতোষ যার অন্যতম সদস্য ছিলেন) ভারতীয় ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে নিম্নোক্ত মন্তব্য—যা আশুতোষের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি মাত্র —

"We are emphatically of opinion that there is something unsound in a system of education which leaves a youngman at the conclusion of his course unable to speak or write his own mother tongue fluently and correctly. It is thus beyond controversy that a systematic effort must henceforth be made to promote the serious study of the Vernaculars in Secondary Schools, Intermediate Colleges and in the University."[১২]

১৯১৯ সালে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ে আশুতোষ বাংলা সহ চারটি ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা করে ফেলেছেন। রিপোর্ট প্রকাশের পর দেখা গেল তার সঙ্গে আশুতোষ-প্রণীত ছকের হুবহু মিল—যেন আশুতোষই স্বহস্তে রিপোর্টের ঐ অংশটুকু লিখেছেন—

"The elaborate scheme recently adopted by the University for the critical, historical and comparative study of the Indian Vernaculars for the M. A. examination is but the coping-stone of an edifice of which the base has yet to be placed on

১১. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন
১২. Report of the Sadler Commission.

a sound foundation, and it is only when such a structure has been completed that Bengali will have a literature worthy of the greatness and civilization of its people."[১৩]

সভা সমাবেশে আশুতোষের সওয়াল

বাংলা ভাষা সম্পর্কে যেমন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে, তেমনি বাইরে সভা সমিতিতে তাঁর নীতি ও মনের কথা উজাড় করে বলে গেছেন। হাওড়া, উত্তরবঙ্গ ও বাঁকিপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত প্রবন্ধ তিনটি—ভারতীয় সাহিত্যের ভবিষ্যৎ, জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি এবং বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ—শুধু বাংলায় নয়, পরন্তু সারা ভারতে মাতৃভাষাকে জনজীবনের প্রাতটি ক্ষেত্রে ব্যবহারের উৎস বলে পরিগণিত হবে। 'জাতীয় সাহিত্য গ্রন্থে' প্রকাশিত আশুতোষ প্রদত্ত সেসব ঐতিহাসিক ভাষণের প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি থেকে তাঁর সারা জীবন লালিত শিক্ষা পরিকল্পনার মূল আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাংলা ভাষার মাধ্যমেই হৃদয়ঙ্গম হবে—

(ক) প্রথম যৌবনে যখন কলেজে অধ্যয়ন করিতাম, তারপর যখন কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিলাম, আমার সতত ধ্যান ছিল যে, কি উপায়ে আমার জননী বঙ্গভূমির, বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারিব। মানুষের কত স্বপ্ন থাকে, আমার ঐ একই স্বপ্ন ছিল। একটা ধারণা আমার দৃঢ় ছিল যে, যে জাতির মাতৃভাষা যত সম্পন্ন, সে তত উন্নত ও অক্ষয়। আমার মাতৃসমা মাতৃভাষাকে যদি কোন মতে সম্পত্তিশালিনী করিতে পারি আমার জীবন ধন্য হইবে।

(খ) যে জাতির নিজের পরিচয়যোগ্য ভাষা নাই বা নিজের জাতীয় সাহিত্য নাই, সে জাতি বড়ই দুর্ভাগ্য।

(গ) ...যখন বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশে আর কোন শিক্ষার কেন্দ্র নাই বা থাকিলেও তাহা গণনার মধ্যেই নহে, তখন যদি দেশের শিক্ষার সম্বন্ধে কোনরূপ কিছু অদল বদল করিতে হয়, বা নূতন কিছু করা দরকার হয়, তবে তাহা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্য দিয়াই করিতে হইবে।

(ঘ) ...সুতরাং ভারতের সাহিত্যিক একতার সমাধান যদি করিতেই হয়, তবে তাহা যতদূর সম্ভব ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্যেই করিতে হইবে।

---

১৩ Hundred Years of the University of Calcutta, Vol. I, p. 338.

…আমরা চেষ্টা করিব, ভারতে যে কয়টি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাহাদের সাহায্যে একটা ভাবগত একতা স্থাপন করিতে পারি কিনা। আমি এ বিষয়ে খুব আশ্বস্ত। …এই আশায় বিমুগ্ধ হইয়া যৌবনের প্রারম্ভ হইতে এই অপরাহ্নকাল পর্যন্ত আমি কত কিনা ভাবিতেছি। আমি রাজনীতির কথা বলিতেছি না, কেননা, যাহাদের প্রকৃত শিক্ষা নাই, যাহাদের প্রকৃত একতা নাই, যাহাদের জাতীয় ভাব-গত ঐক্য নাই, যাহাদের চিন্তার ধারা একই খাতে প্রবাহিত নহে, তাহাদের পক্ষে রাজনীতি চর্চা আপাততঃ উত্তেজনাদায়ক হইলেও, পরিণতিতে চিত্তে অবসাদের সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমি বলিতেছি শিক্ষার কথা, দীক্ষার কথা, ভাবগত একতার কথা। স্ব স্ব ব্যক্তিত্ব বা বৈশিষ্ট্য না হারাইয়া, যাহার যাহা আছে তাহা বজায় রাখিয়া, কি করিয়া ভারতে একভাব একচিন্তা এক সাহিত্যের সৃষ্টি করা যাইতে পারে—কি করিয়া সমগ্র ভারতে এক জাতীয় সাহিত্যের নির্মাণ করা যাইতে পারে, তাহাই আমার বক্তব্য।

(৬) এই উদ্দেশ্যেই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত দিন পরে ভারতীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার সৃষ্টি হইয়াছে। এই এম. এ. পরীক্ষার্থীগণকে প্রধানতঃ এক মূল ভাষায় ও তাহার সহিত অন্ততঃ একটি ভিন্ন প্রদেশের ভাষায় পরীক্ষা দিতে হইবে, অর্থাৎ যিনি প্রধানতঃ বাংলা ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেই সঙ্গে হিন্দি বা মারাঠী বা তেলেগু বা গুজরাটী লইতে হইবে—এইরূপ যিনি মারাঠী ভাষা লইবেন তাঁহাকে সেইসঙ্গে আর একটি ভাষা লইতে হইবে।…এইরূপে যদি ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও দেশীয় ভাষায় এম. এ. পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়, তবে বাংলার সম্বন্ধেও যাহা যাহা বলিলাম, তাই সেই সেই দেশের পক্ষেও খাটিবে, ফলে সমগ্র ভারতবর্ষে একটা ভাবগত একতার সাড়া পড়িবে, পরস্পরের আদান প্রদানের সুবিধা হইবে।"

পূর্বোক্ত সাহিত্য সম্মেলনে পঠিত ভাষা সম্বন্ধীয় নিবন্ধগুলি সম্পর্কে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন বলেন—

"তাঁহার অপ্রমেয় বিশ্বাসপূর্ণ, শ্রদ্ধাপূর্ণ ও ভবিষ্যতের আশায় বলিষ্ঠ হৃদয়ের আবেগভরা উচ্ছ্বাসে এই নিবন্ধগুলি এমনই এক পবিত্র মাধুর্য ও গাম্ভীর্য্য মণ্ডিত হইয়া যাহার তুলনা বঙ্গ সাহিত্যে বিরল।…তাঁহার ওজস্বিনী বাণী বাঙ্গালীর সাহিত্য জীবনে এক নূতন উদ্দীপনা ও প্রেরণা আনয়ন করিয়াছিল।"

জাতীয় সংহতির অগ্রদূত আশুতোষ

ইদানীংকালে 'nationa integration' তথা জাতীয় সংহতির প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতাদের ঢক্কানিনাদে কান ঝালাপালা; কিন্তু ৭০ বছর পূর্বে আশুতোষ প্রতিবেশী প্রদেশের ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রাদেশিকতার সঙ্কীর্ণতা ছিন্ন করে প্রকৃত জাতীয় ঐক্য ও সংহতির যে সহজ পন্থা নির্দেশ করে গেছেন, তা জাতীয় ঐক্য ও সংহতির মূলে কুঠারাঘাত হানায় সিদ্ধহস্ত রাজনৈতিক নেতাদের চিন্তা ও কল্পনারও বাইরে। শুধুমাত্র সভা সমিতিতে নয়, সমাবর্তন ভাষণেও তিনি মাতৃভাষায় স্নাতকোত্তর শিক্ষাদান প্রকল্পের অন্যতম অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেছিলেন :—

"It is distinctly unfortunate that we should be blamed for the arrangements we have made for those very subjects which are indispensable for study and research in a truly national University. Let me turn for a moment to that great department of Indian Vernaculars which is a special feature of our University and which should constitute its chief glory in the eyes of all patriotic and public-spirited citizens. In 1919, the University, with the sanction of the Government of India, opened its department of Indian Vernaculars, For the first time in the history of Indian Universities. it thus became possible for a person to take the highest University degree on the basis of his knowledge of his mother tongue. The fundamental principle which lies at the root of the new Regulations, is that a student should posses a knowledge of two Vernaculars, namely, a thorough knowledge of his mother tongue and a less comprehensive knowledge of a second Vernacular. The student is also required to obtain a working acquaintance with two of the languages which have formed the foundation of the Indian Vernaculars, such as Pali, Prakrit, and Persian. The languages which have already been recognised as princple languages, are Bengali, Hindi, Guzrati and Oriya. The languages which have been recognised as subsidiary languages are Bengali, Assamese, Oriya, Hindi, Urdu, Maithily, Guzratti, Mahratti, Telugu. Tamil, Canarese, Malayalam. and Sinhalee. The Basic languages include Pali, Prakrit, and Persian. Besides these, the student has to acquire a comparative

knowledge of the Philology of his Vernacular. There is no other University in India where facilities are provided for the cultivation of the Indian Vernaculars on so extensive a scale. But let me ask whether this would have been possible, unless the University had a department of Pali which included learned Sinhalese monks, a department of Sanskrit which included a Prakritist professing the Jain religion, a department of Islamic studies which included Persian Scholars, a department of Comparative Philology which iucluded a Guzarati scholar, a department of History which included a Mahratta scholar, a department of Economics which included a Telugu scholar, and a department of Anthropology which included a Tamil and Malayalam scholar. It is because the University now comprises men of high intellectual attainments in so many branches of human knowledge, it is because the University has broken through the barriers of narrow provincialism, it is because of this combination of talents reeruited from all parts of India that it has become possible to open the new department of Indian Vernaculars."[১৪]

জাতীয় ঐক্য ও ভাবগত সংহতি সম্পর্কে আশুতোষ ও রবীন্দ্রনাথ

প্রত্যেকটি বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষার ব্যবস্থা করার পিছনে আশুতোষের মহৎ উদ্দেশ্য ও দূরপ্রসারী চিন্তাশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষা সাহিত্য ও ইতিহাস সম্পর্কিত চারটি বিভাগ তাঁর অন্যতম কীর্তি। তিনি বৃহৎ জাতীয় স্বার্থ, ঐক্য ও সংহতির কথা চিন্তা করেই দেশের সকল সম্প্রদায়কে নিজ নিজ অতীত ইতিহাস ও সংস্কৃতির সঙ্গে বর্তমান ভাষা সাহিত্যের যোগসাধন মানসে নিম্নোক্ত চারটি বিভাগের পত্তন করেন—

১. ভারতীয় ভাষা বিভাগ
২. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
৩. ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ
৪. পালি ভাষা বিভাগ

যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আশুতোষ এ সকল বিষয়ে এম. এ. পড়াবার ব্যবস্থা করেন তা রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—

১৪. Convocation Address, 1922.

"ভারতবর্ষের যে মন আজ হিন্দু বৌদ্ধ জৈন, শিখ, মুসলমান, খৃষ্টানের মধ্যে বিভক্ত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া আছে, সে মন আপনার করিয়া কিছু গ্রহণ করিতে বা আপনার করিয়া কিছু দান করিতে পারিতেছেনা। দশ আঙ্গুলকে যুক্ত করিয়া অঞ্জলি বাঁধিতে হয়—নেবার বেলায়ও তাহার প্রয়োজন, দেবার বেলাও। অতএব ভারতবর্ষে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্ত সম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে। এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইয়াছে তাহা জানিতে হইবে। এইরূপ উপায়েই ভারতবর্ষ আপনার নানা বিভাগের মধ্য দিয়া আপনার সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে পারিবে।"[১৫]

এখানে লক্ষ্যণীয়, রবীন্দ্রনাথ যে অঞ্জলি পুরিয়া দানপ্রতিদান ও ভারতবর্ষীয় সমগ্রতা উপলব্ধি মানসে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করে ছিলেন, আশুতোষ সে স্বপ্ন দেখেছেন অন্ততঃ তার ত্রিশ বছর আগে থেকে। সেই স্বপ্ন সফল করতে তিনি প্রাচীন ইতিহাস সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ভাষা বিভাগে এতগুলি ভাষা চর্চার ব্যবস্থা করেছিলেন—

বাংলা, অসমিয়া, মৈথিলী, ওড়িয়া, উর্দু, হিন্দী, গুজরাটি, দ্রাবিড়ী, তামিল, মালায়ালাম, কানাড়ি এবং সিংহলী। তার এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আশুতোষ নিজেই বলেছেন—

"অন্যের যাহা ভাল, তাহা আমাকে লইতে হইবে, আমার যদি কিছু ভাল থাকে, তাহা অন্যকে অঞ্জলি পুরিয়া দিতে হইবে। এইরূপ আদন-প্রদান ছাড়া আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত অভ্যুদয়ের আশা নাই, পূর্ণত্ব লাভের সম্ভাবনা নাই। এমন একটি সাধারণ উপায় নির্ধারণ করিতে হইবে, যাহার আশ্রয়ে বঙ্গ, বিহার, উৎকল, মাদ্রাজ, গুর্জর, রাজপুতনা, গান্ধার, পাঞ্জাব সব এক সূত্রে গ্রথিত ও সাহিত্যের এক সমতটে সমবেত হইতে পারে"[১৬]

যে মহৎ ও উদার ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ ১৮৯০ খৃঃ 'মহাপুজা' নাটকে একতার ইঙ্গিত স্বরূপ লিখেছিলেন—

"পাঞ্জাব-প্রয়াগ, অযোধ্যা, কনোজ, মহারাষ্ট্র, মাড়োয়ার।
মাদ্রাজ-বোম্বাই, আসাম-নাগপুর, উৎকল বঙ্গ-বিহার॥

১৫. বিশ্বভারতী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৩ বৈশাখ, ১৩২৬

১৬. হাওড়া বঙ্গীয় সাহিত্যসম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ, ১৩২৬

হিন্দু বা খৃষ্টান, পার্শি মুসলমান, একপ্রাণ আজি সবে।
একতা-বিহীন ভারত-সন্তান, কেহ আর নাহি রবে॥"[১৭]

এবং তার বাইশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন—

"পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ,
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধি তরঙ্গ।"

তারই প্রতিধ্বনি কি আশুতোষের উদ্ধৃত বক্তব্যে পাওয়া যায় না? তিনি আরো বলেছেন—

"আমার মনে হয়···সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে সাহিত্যের ভিতর দিয়া যদি এক করিতে পারা যায় তবেই ভারতের প্রকৃত জাতীয় সাহিত্যের সৃষ্টি হইবে, অন্যথা নহে। এমন একটি সাধারণ সেতু নির্মাণ করিতে হইবে, যাহার উপর দিয়া ভারতের সকল দেশের অধিবাসীরা তাহাদের সর্ববিধ বাধাবিপত্তি পার হইয়া এক মুক্ত প্রান্তরে আসিয়া পৌঁছিতে পারে। সকলে সাহিত্যের অঙ্গনে এক হইবে, ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাঁই থাকিবে না।[১৮]

আশুতোষের প্রচেষ্টার মূল্যায়ন

আশুতোষের এই প্রচেষ্টার প্রকৃত মূল্যায়ন করেছেন বিপিনচন্দ্র পাল। বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের ভাষা-সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার মাধ্যমে বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য এবং ভাবগত সংহতি আনয়নের এই বাস্তব প্রচেষ্টায় অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশুতোষকে সাধুবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন—

"Indian Unity can only mean the Unity of the Indian Masses and not the Unity of a mere handful of English-educated Indians. If we are to work up a real cultural unity in India, we must help the masses to understand, to appreciate, to enjoy and assimilate this great Indian culture. And the first step in this direction has been taken by the Calcutta University in the institution of this new M. A. degree which raises Asutosh's claim from that of a clever and successful administrator to that of a constructive statesman, with as clear a

১৭. মহাপূজা—গিরীশচন্দ্র ঘোষ

১৮. বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনে প্রদত্ত ভাষণ থেকে, হাওড়া ১৩২৬

vision of the future as he has a strong grasp of the present."১৯

আপনি আচরি ধর্ম

বাংলায় এম.এ. পাঠক্রমে প্রথম পরীক্ষা নেওয়া হয় ১৯২০ সালে মোট ১২ জন ছাত্রের। বাংলা ভাষায় এম.এ. পাশদের নিয়ে নানা রঙ্গ ব্যঙ্গ কার্টুন প্রকাশিত হতে থাকে পত্রপত্রিকায়। নিজ মাতৃভাষার গৌরবে গৌরব বোধ না করে তাকে হেয় করার মনোবৃত্তিতে স্যার আশুতোষ দুঃখিত হলেন, কিন্তু দমলেন না। বাংলা বিষয়ের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁর মধ্যম পুত্র ইংরেজি ভাষায় বি.এ. অনার্সে সর্বোচ্চস্থান অধিকারী শ্যামাপ্রসাদকে বাংলা এম.এ. ক্লাসে ভর্তি করে দিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, বিদ্যাসাগর তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্রের বিধবা বিয়ে দিয়েছিলেন ; আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্য-শিল্পমনা পুত্র রথীন্দ্রনাথকে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা দিয়ে মাঠে নামিয়ে পল্লী ও কৃষির উন্নতির পথ দেখিয়েছেন। তাঁরা নিজের আদর্শ বা আরব্ধ কাজে আগে নিজ নিজ পুত্রদের দিয়ে প্রচার ও পরীক্ষা চালিয়ে পরে অন্যদের তা গ্রহণের পরামর্শ দিতেন। 'আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শিখায়' নীতি পুরোপরি মেনে চলতেন। এখনকার রাজনীতি-নির্ভর নেতাদের মতো 'আংরেজি হঠাও' বলে নিজ পুত্র পৌত্রকে নার্সারি, কে.জি. ইংলিশ মিডিয়ামে প্রেরণ করতেন না। আশুতোষ জীবনে রাজনীতির ছায়া মাড়ান নি। তথাপি জাতীয় ঐক্য, ভাবগত সংহতি ও জাতীয় শিক্ষানীতি নিয়ে যেমন গভীরভাবে ভেবেছেন এবং সুস্পষ্ট পথনির্দেশ করেছেন, দেশের রাজনীতির কর্ণধারগণ তার শতাংশের একাংশও যদি সততা ও আন্তরিকতার সঙ্গে অনুসরণ করতেন, তা হলে এদেশের ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হতো।

১৯. Character Sketches—Bipin Chandra Pal.

ত্রয়োদশ অধ্যায়

আশুতোষ পর্ব (গ)

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও পরীক্ষার সংগ্রাম ঃ ভাষা-শহীদ আশুতোষ

শিক্ষার মাধ্যম—ইংরেজি আবশ্যক, মাতৃভাষা অত্যাবশ্যক—মাধ্যমিক স্তরে মাতৃভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হোক—স্যাড্‌লার কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণে আশুতোষের কার্যকরী ব্যবস্থা—স্কুল শিক্ষক ও স্কুল পরিচালকদের সভা আহ্বান ও মাতৃভাষা মাধ্যমের প্রস্তাব অনুমোদন—সিণ্ডিকেটে প্রস্তাব পাস—প্রভাবশালী মহলের বিরোধিতা—আশুতোষের বক্তৃতা—মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম অর্থ ইংরেজি বর্জন নয়—শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আশুতোষের ঐতিহাসিক উক্তি ও ভাষণ—মাতৃভাষায় এম. এ. দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ—লোকসাহিত্য চর্চা ও গবেষণায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সর্বাগ্রগণ্য—বহির্বঙ্গে মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা—শিক্ষার মাধ্যম প্রস্তাব সরকারের নিকট প্রেরণ—সরকারের দীর্ঘ কপট নিদ্রা—আশুতোষের অকাল প্রয়াণ—সরকারের নিদ্রাভঙ্গ ও নেতিবাচক জবাব—ভাষা-শহীদ আশুতোষ।

* * * *

শিক্ষার মাধ্যম—ইংরেজি আবশ্যক, মাতৃভাষা অত্যাবশ্যক

এদেশে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হবার সময় থেকেই শিক্ষার বাহন কি হবে তা নিয়ে যথেষ্ট বাদবিতণ্ডা হয়েছে। আশুতোষ তাঁর একাধিক সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষার মাধ্যমের প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। প্রবোশকান্তরে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের তিনি অন্যতম উদ্যোক্তা। তবে মাতৃভাষা উচ্চশিক্ষার বাহন হবার মতো উন্নত না হওয়া পর্যন্ত উচ্চতর শিক্ষাক্ষেত্রে তিনি ইংরেজির মাধ্যমেই শিক্ষাদানের পক্ষপাতী ছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন—ইংরেজি ও মাতৃভাষা যুগপৎ চর্চা না করলে দুর্বল দেশীয় ভাষাগুলি কখনই ইংরেজির স্থান দখল করতে সমর্থ হবে না। তাই প্রারম্ভে ইংরেজির মাধ্যমে পড়াশোনার ব্যবস্থা স্থির করা হলেও কালক্রমে যাঁরা মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদানের

প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন, তাঁদের মতামত একেবারে উড়িয়ে দেননি। সমাবর্তন ভাষণে তিনি বলেন :

"The other fundamental doctrine, which lies at the root of our University system of education and to which I desire to make a brief reference, is the principle that European knowledge should be brought home to our students through the medium of English—that western light should reach us through western gates and not through lattice work in eastern windows. The validity of this principle which has been firmly settled for three quartars of a century has latterly been seriously questioned by people of culture and position whose opinion claims consideration."[১]

[ইংরেজির মাধ্যমেই আমাদের ছাত্রদের কাছে ইউরোপীয় জ্ঞানের দরজা খুলতে হবে—পশ্চিমের আলো পশ্চিমের দরজা দিয়েই পৌছাবে, প্রাচ্যের জানালার জাফরির ভেতর দিয়ে নয়। শতাব্দীর তিন চতুর্থাংশ কাল আগে এই নীতি পাকাপাকিভাবে গৃহীত হয়েছে ; তবে কিছুদিন থেকেই এই নীতির যথার্থতা নিয়ে অনেক সুধী ও চিন্তাশীল ব্যক্তি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের মতামত গভীরভাবে বিবেচনার যোগ্য।]

মাধ্যমিকস্তরে মাতৃভাষা শিক্ষার মাধ্যম হোক : স্যাডলার কমিশন

আশুতোষ মাতৃভাষায় বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ ডিগ্রী লাভের ব্যবস্থা করলেন, কিন্তু মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্ব নিম্ন পরীক্ষা দেবার পথে তখনো দুলঙ্ঘ্য বাধা। আশুতোষ কিন্তু চুপ করে বসে ছিলেন না। এই সম্পর্কে স্যাডলার কমিশনের সুপারিশে বলা হয়েছিল—

"...... the use of the English medium is at present excessive in the Secondary Schools to the detriment both of the pupils' education and of the rational use of both media and that a substantial change should be made and it would probably be desirable as a rule to use the vernacular as the medium

১. Convocation Addres, 1908.

throughout the Secondary Schools for all subjects other than English and Mathematics."[২]

অর্থাৎ মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজীর মাধ্যমে পড়াশুনার ফলে ছাত্রদের শিক্ষা ও শিক্ষার মাধ্যম দুটোই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। তাই মাধ্যমিক স্কুলে ইংরেজী ও অঙ্ক ছাড়া বাকি সব বিষয় মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠনপাঠন বাঞ্ছনীয়।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের কিছু কাল আগে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রবর্তনের সুপারিশ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এক প্রস্তাব আসে। পরিষদের উক্ত প্রস্তাব সিণ্ডিকেটের নির্দেশানুসারে কলা ও বিজ্ঞান (আর্টস্ এণ্ড সায়েন্স) ফ্যাকাল্টির এক যুক্ত বৈঠকে বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। ১৯১৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে অনুষ্ঠিত যুক্ত ফ্যাকাল্টির বৈঠকের কার্য বিবরণী থেকে দেখতে পাওয়া যায়—

The Joint meeting was convened, at the request of the Syndicate, to consider the following letter, dated 7th June, 1918, from the Hon. Secretary, Bangiya Sahitya Parishad, to the Registrar.

"For some time past the question of making Bengali Language the medium for imparting High Education in our University has been under the consideration of the Bangiya Sahitya Parishad. To discuss the question in all its bearings, the Executive Committee of the Parishad sent a circular letter to all its members and distinguished educationists and educational experts of our Province, inviting their opinion on the subject. When it had received their opinions it appointed a Sub-Committee to consider these opinions thoroughly and to formulate a scheme for making Bengali Language, the vehicle for imparting High Education in this Province. The Sub-Committee submitted their report which was duly considered by the Executive Committee of the Parishad and was accepted by them with only one slight alteration. I am now directed by the Executive Committee of the Bangiya Sahitya Parishad to forward to you the proposals unanimously adopted by the Committee in connection with the question of making Bengali

২. Hundred years of the University of Calcutta Vol. 1, P. 338

the medium of higher education in this country for laying this letter before the Senate and for taking such action upon it as the Senate may deem fit.

The proposals are annexed hereto.

Proposals for Making Bengali Language the Medium of Higher Education in this Province.

1. While discussing the question it must be considered first of all that in any attempt to inmprove the Bengali Language and literature no harm is done to the cause of high education of the Bengalis. For it may be apprehended that the greater use of the Bengali language in the matter of imparting education may prove an obstruction to the mastering of English language and may also throw some hinderance in the way of high education specially in those branches which are now being taught, and must for few years be taught, in English. But such fear is unfounded ; because it is not the object of these proposals to minimise the importance of teaching the English language. The learning of the English language and literature is not only necessary for our everyday work in life, but it is the best means for our access to the great store-house of the world's knowledge. The present proposal only demand that high education in the different branches of learning should be imparted in the Bengali language. This might lead some to think that the standard of proficiency in English, which is attainable when all subjects of learning are taught through the medium of English language cannot be expected to be attained if we teach them through the medium of Bengali language and English is taught as literature only. But this also does not stand to reason in as much as, if the different subjects are taught to the Bengali students in Bengali they would learn them with less labour and in shorter time, and the labour and time thus saved might be utilised by them in learning the English language.

2. Next it should be considered how far it is possible at the present moment to impart high education in Bengali and how and in what way the scope of imparting high education through Bengali language can be enlarged in the near future. It is a

truism to say that all kinds of education, primary or higher, should be imparted so far as practical through the medium of vernacular of the student. If this is done, the difficulty of learning a subject is not enhanced by the additional difficulty of learning the language in which it is taught and the subjects of study are also clearly mastered. It should, however be considered, whether or not, suitable text books in Bengali in the different branches of learning are at present available. So far as can be seen it may be said without any doubt that up to the Matriculation Examination of our University there is no want of suitable Bengali Text books in History, Geography, Mathematics and Mechanics or in other words in all subjects except English literature ; and since the foundation of the Patna University, the apprehension of any difficulty on account of different vernaculars has altogether vanished, because Bengali is practically the only vernacular of the examinees of the Calcutta University. For the Intermediate Examination also there is no dearth of suitable text-books in Bengali in most of the subjects. Text books in subjects for which no suitable books are available now, may be supplied very easily. At the same time it is highly desirable that one day Bengali students should be able (and there is no obstacle in the way of our attaining that end) to learn the different subjects in Bengali even up to the B. A. and M. A. Examination standards. If the authorities only announce that after five years all subjects of high education would be taught in Bengali, then within a short time suitable text books on various subjects will be written by eminent authors.

3. It may be here mentioned that at present the Bengali language only is required to be learnt for University Examination. It is necessary that instead of this, the Bengali language and literature should form separate subjects of study and also of Examination.

4. It is desirable that old Bengali literature, Philology of the Bengali language and the History of its gradual evolution should be subjects in the M. A. Examination.

5. We finally suggest that for the purpose of improving the Bengali language and literature, arrangement should be made

for University extention lectures to be delivered in Bengali on various higher subjects by eminent scholars. This arrangement will be a useful machinery for spreading higher thoughts in the country. We may note here with pleasure that some arrangement with the above view was attempted by our late worthy Vice-Chancellor who is a devoted lover of his mother tongue. What we desire now is that this arrangement should be made permanent and expanded."

Mr. J. R. Banerjea proposed that the consideration of the matter be postponed till the publication of the report of the Calcutta University Commission.

Rev. Dr. Urquhart seconded the motion.

The motion was put to the vote and carried unanimously.

(Confirmed.)

ASUTOSH MOOKERJEE,
Chairman.

K. L. DATTA,
Offg. Registrar.

সাহিত্য পরিষদের প্রস্তাবে আশুতোষের দীর্ঘদিন লালিত মনোভাবই যে ব্যক্ত হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। এর দুই বছর পর কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ হলে দেখা যায় আশুতোষের চিন্তাধারার হুবহু প্রতিফলন ঘটেছে রিপোর্টের পাতায় পাতায়।

কমিশনের সুপারিশ রূপায়ণে আশুতোষের কার্যকরী ব্যবস্থা

কমিশনের পূর্বোক্ত সুপারিশ অবলম্বন করে আশুতোষ কাজে নামলেন। প্রথমে যারা ম্যাট্রিক বা প্রবেশিকা স্তরে পঠনপাঠনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত, সেই হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকমণ্ডলী ও ম্যানেজিং কমিটিকে এই ব্যাপারে যুক্ত করলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত নয় শতাধিক হাইস্কুলের ৪০৭ জন প্রধান শিক্ষকের উপস্থিতিতে ১৯২১ সালের ৭ই মে সিনেট হাউসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেই সভায় ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার মাধ্যম ও পাঠক্রম সংশোধনের সুপারিশ করে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। জুন মাসে চারদিন ধরে স্কুলগুলির ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি/প্রতিনিধিদের আর একটি

সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভা প্রথমোক্ত সভায় গৃহীত প্রস্তাবটি সমর্থন ও অনুমোদন করে। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন এবং নতুন নীতি নির্ধারণে জনমত যাচাই ও সংগ্রহের এমন গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী এদেশে অভিনব, অভূতপূর্ব, নজিরবিহীন। এক্ষেত্রেও পথপ্রদর্শক আশুতোষ।

পূর্বোক্ত দুটি সভায় অনুমোদিত শিক্ষার বাহন বিষয়ক প্রস্তাব সিণ্ডিকেটে পেশ করা হল। সেখানে তো স্বয়ং আশুতোষ কর্ণধার। তিনি সে প্রস্তাব সিণ্ডিকেটে উত্থাপন করলে সিণ্ডিকেট তা আর্টস্ ও সায়েন্স ফ্যাকালটির যুক্ত বৈঠকে বিবেচনার জন্য পাঠাল। উভয় ফ্যাকালটির মিলিত বৈঠকে প্রবেশিকা পরীক্ষার নতুন খসড়া বিধানে নীতিগতভাবে সিদ্ধান্ত হল—

> "Instruction and examination in all subjects other than English shall be conducted in the Vernaculars, provided that the Syndicate may, in special cases make exception to this rule or postpone its operation for a prescribed time."[৩]

(ইংরেজি ছাড়া আর সকল বিষয়ে পড়ান এবং পরীক্ষা গ্রহণ দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই পরিচালিত হবে, অবশ্য বিশেষ ক্ষেত্রে সিণ্ডিকেট এই নিয়মের ব্যতিক্রম করতে বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তার প্রয়োগ স্থগিত রাখতে পারবে।)

প্রভাবশালী মহলের বিরোধিতা : আশুতোষের বজ্রপণ

কিন্তু মাতৃভাষাকে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার বাহন করার পথ মোটেই মসৃণ ছিল না। "কলকাতার ইংরেজি নকলনবীশেরা ছিলেন শক্তিশালী ও সক্রিয়। জাতীয় স্বার্থের চেয়ে গোষ্ঠী আধিপত্য কায়েম রাখাই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। সুতরাং তাদের বাধাদানে বঙ্গ-সরস্বতী কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশাধিকার লাভে বঞ্চিত হল।"[৪] ফ্যাকালটি ও সিনেটের প্রাচীন ও প্রভাবশালী সদস্যগণ এই সুপারিশের বিরোধিতা করতে থাকেন। এই বাধাদানকারীদের লক্ষ্য করে নর-শার্দুল আশুতোষ বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করলেন—

> "I will do everything in my power to train students in Bengali and send them forth in Bengal and make the people of Bengal realise that they are Bengalees and not Englishmen.

৩. Proceedings of the Faculty of Arts & Science, 8.4.1922.

৪. শিক্ষা ব্যবস্থা গণতন্ত্রীকরণ সংস্থা প্রচারিত পুস্তিকা

If they turn out to be Englishmen, I shall cry shame upon them. I do not wish to make secret about it. Bengal is mad. Bengali is to be taught in this fashion so that the rising generation may be saved. Is my friend sure that justice will never be administered in this country in my mother tongue? We may not live to see the day; I hope the day will come."[৫]

দীর্ঘ অর্ধ শতাব্দী কাল ধরে যে ভুল করা হয়েছিল, সে ভুল সংশোধনের আহ্বান জানিয়ে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান আহরণে ও দেশের ঐক্য সংরক্ষণে ইংরেজির অবদান স্বীকার করেও ম্যাট্রিকুলেশন স্তর পর্যন্ত মাতৃভাষাই শিক্ষার বাহন হবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন—

"We have been on the wrong track for more than half a century. Let us get to the other track. I regard English as of prime importance ...... as the gate-way to western knowledge ...... as the most potent instrument for the unification of India. But instruction and examination should be conducted in Vernaculars at any rate, upto the Matriculation standard at the present moment."[৫] (Proceeding of the Faculty of Arts & Science, dt. 8.4.1922).

ইতিমধ্যে নিজের হাতে গড়া স্নাতকোত্তর ভাষা বিভাগ সম্পর্কে ক্রমাগত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও বিরূপ সমালোচনায়, বিশেষ করে বাংলাদেশে, ক্ষুব্ধ ব্যথিত আশুতোষ সক্ষোভে বলেন—

"I have charges laid against us that we have developed an Indian side of the different Indian Vernaculars. This arrangement has been appreciated everywhere except in Bengal. The University has had offers from people of other provinces, such as a Chief of Orissa, Maharaja Holkar, and others for the development of this department. Where are the Bengali Zamindars? Where are the people of Bengal? We have heard nothing but calumnies against this University and the Post-graduate department. I hope that the day will come when the people of Bengal will wake up and realise the significance of the fact that youngmen have devoted

৫. Minutes of the Senate, 24.6.1922.

themselves to the work of this University under conditions of privation which to me seem to be inconceivable. We shall not be worth the name of the University if the Post-graduate department is not maintained on a better footing."[৬]

এই কুৎসাকারী ও নিন্দুকের দল যে একদিন ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হবে, কেউ তাদের কথা স্মরণ করবে না, সেকথাও তিনি জোর গলায় বলে গেছেন—

"Truly, it is always darkest under the lamp, the people of Bengal seem ignorant of the vast organisation for higher teaching and research which is in full operation in their University and which it is their paramount duty to expand and support to the utmost of their ability. I call upon all true friends of the University, not to be frightened by the Spectre of calumniators who in the whirlwind of time will to a certainty disappear into the limbo of oblivion, whatever their rank and status."[৭]

ইংরেজি ভাষা শেখা, আর ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে সকল বিষয়ে শিক্ষালাভ, সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস। দুই-এর পার্থক্য অনুধাবন না করতে পেরে অনেকেই অকারণ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। তাঁদের অমূলক আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে আশুতোষ বলেছিলেন—

"We shall learn English quite as well as an Englishman or even better. That will not prevent us from learning our mother tongue, thinking in our mother tongue, writing in our mother tongue."[৮]

এদেশের শিক্ষা পদ্ধতির মূল গলদ কোথায় তা শিক্ষাব্রতী আশুতোষ দক্ষ চিকিৎসকের মতো নির্ণয় করে ভবিষ্যৎ বাণী করেন—

"The truth is our whole system is fundamentally wrong. Once we set it right, 10 years hence people will look back and say why did you not do the right thing many many years ago. If we begin now the question will be asked what will happen to the Intermediate ? Time will come when in

৬. Minutes of the Senate, dated 23.6.1922.

৭. " " " "

৮. Minutes of the Senate, 17. 6. 1922.

the Intermediate also instruction will be imparted in Bengali and other Vernaculars. I am not a prophet, but that will come. I will tell you further, instruction will be given through the medium of the Vernaculars even in your B. A. Class."৯

বাংলা ভাষার ঘোর বিরোধী সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ আশুতোষ শাস্ত্রী মহাশয়কে লক্ষ্য করে তিনি বলেন—

"I was not surprised at the opposition that came from the Principal of the Sanskrit College. In 1891, I brought forward a motion to make study of Bengali compulsory. The strongest opponents were two distinguished men who were the predecessors of the present Principal of Sanskrit College. MM. Pandit Mahesh Chandra Nayaratna said—'If you carry this, you will destroy Sanskrit.' Pandit Nilmani Nyayalankar said, 'You will destroy English'. They combined and killed Vernacular."১০

শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কে আশুতোষের ঐতিহাসিক উক্তি ও ভাষণ মাতৃভাষায় এম. এ.-দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ

"মাতৃভাষার শিক্ষা ব্যতীত লোক-শিক্ষার চেষ্টা ব্যর্থ ইহা তিনি বুঝিয়াছিলেন। এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আশুতোষ বাঙ্গালা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।" অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় ভাষায় শত শত এম. এ. পাস শিক্ষক প্রয়োজন হবে এই ভবিষ্যদ্বাণী করে এবং বাঙালীরা ইংরেজি ভাষায় মহাপণ্ডিত এই মিথ্যা আত্মাভিমানে প্রচণ্ড ঘা মেরে আশুতোষ বলেছিলেন—

"In no distant future Bengal will require hundreds of M. A.'s in Indian Vernacular. One compunction I feel is that Bengal has not got teachers. Bengal imagines that she has got teachers in English. Delusion. Let me tell my friend—walk into the schools and see those who are teaching English. They know neither English nor the Vernacular. The former

৯. Minutes of the Faculty of Arts & Science, 8. 4. 1922.

১০. দীনেশচন্দ্র সেন—আশুতোষ স্মৃতিকথা

I do not consider a shame but the latter I do consider a shame."[১১]

মাতৃভাষাকে শিক্ষার বাহন করার প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সরকারের কাছে পাঠিয়ে দিয়েই আশুতোষ ক্ষান্ত ছিলেন না। সরকার নিযুক্ত কমিশনের সুপারিশের ভিত্তিতে রচিত নতুন বিধির গতি কি হবে, সে সম্পর্কে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তাই যখন যেখানে সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই তিনি মাতৃ ভাষার স্বপক্ষে দেশবাসীর কাছে আর্জি পেশ করেছেন, ওকালতি করেছেন, জনমত গঠনের চেষ্টা করেছেন। বাংলা সাহিত্যকে ভারত সাহিত্য তথা বিশ্ব সাহিত্যে উন্নীত করার জন্য আশুতোষ বড় উচ্চাশা পোষণ করতেন। তিনি দেশের জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের কাছে আবেদন জানিয়ে বলেন—

"বাংলার মধ্যে যাঁহারা কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হন, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আবিষ্কার, তাঁহাদের চিন্তালহরী ভাষান্তরে রূপান্তরিত না করিয়া স্ব স্ব মাতৃভাষাতেই প্রকাশ পূর্বক জন্মভূমির তথা জননী বঙ্গভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেন, তাহা হইলে জগতের অপরাপর শিক্ষিত সম্প্রদায় বাধ্য হইয়া বঙ্গভাষার আলোচনা করিবেন। ...বঙ্গভাষাও পৃথিবীর সমস্ত শিক্ষাকেন্দ্রে বিশেষজ্ঞগণের অন্যতম আলোচনীয় রূপে গৃহীত হইবে।"[১২]

এসকল চিন্তা আশুতোষের অলসমস্তিষ্ক প্রসূত নয়। ঐ বিশাল বক্ষ, বৃহৎ মস্তিষ্কে এরকম উদ্দীপ্ত আশা ও সুমহান পরিকল্পনাই মানায়—

"I fervently hope that time will come when you will have works of the best type in your mother-tongue. We want English to be taught better. At the same time we want our students to learn their mother-tongue. I want them to grow into men of Bengal. .... There will be other Rabindranaths under the new system.[১৩]

লোক-সাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণে আশুতোষের প্রেরণা

এই উপমহাদেশে লোক সাহিত্য সংগ্রহ, চর্চা ও গবেষণায় এবং রক্ষণা-বেক্ষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকা সর্বাগ্রগণ্য। বাংলা এম. এ.

---

১১. Minutes of the Senate, dated 24.6.1922.

১২. বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ : আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৩. Minutes of the Senate, dated 17.6.1922.

পাঠক্রমের শুরুতেই লোক সাহিত্য তার অন্তর্ভুক্ত হয়। এ সম্পর্কে দীনেশচন্দ্র সেনের আগ্রহ ও অবদান অসামান্য।

তাঁর সম্পাদিত "Mymensingh Ballads' বা 'মৈমনসিংহ গীতিকা' সম্পর্কে একটু উল্লেখ না করলেই নয়। মৈমনসিংহ গীতিকা বিশ্বের লোক-সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ। উক্ত গীতিকার সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে, সম্পাদক দীনেশচন্দ্র সেন এবং অর্থ ও উৎসাহদাতা স্যার আশুতোষ এই অমূল্য সম্পদ আবিষ্কার ও রক্ষা করে বাংলা সাহিত্যে অক্ষয় কীর্তি অর্জন করে গেছেন। পুস্তকাকারে গীতিকাগুলির প্রকাশ সম্পর্কে বঙ্গ ভাষার আশ্রয় কল্পতরু স্যার আশুতোষের সক্রিয় সহযোগিতার কথা উল্লেখ করে সকৃতজ্ঞচিত্তে দীনেশচন্দ্র গীতিকার ভূমিকায় বলেছেন—

"আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐকান্তিক দুরবস্থার সময়ে যিনি শত অন্তরায় সত্ত্বেও সুদক্ষ কাণ্ডারীর মত অটল পণে এই বিদ্যাপীঠকে পরিচালিত করিতেছেন, যিনি সরস্বতীর শতদল সিংহাসনটিকে অপঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন, সেই বিদ্যালোকোদ্ভাসিত, অজেয় শক্তিশালী স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সাহায্য না পাইলে এই পালাগানগুলি কিছুতেই সংগৃহীত অথবা প্রকাশিত হইত না।···দুঃসময়ে আমি মৈমনসিংহ গীতিকার কথা তাঁহাকে অতি কুণ্ঠার সঙ্গে জানাইয়াছিলাম। কোথা হইতে টাকা আসিবে, দুর্যোগের ঘনঘটা দেখিয়া তো আমরা তাহা জানিতাম না। সেই সময়েও তাঁহার সেই চিরশ্রুত অভয়বাণী শুনিয়াছিলাম···'ভয় কি দীনেশবাবু, ছাপিতে দিন, আমি চালাইব।"···এই জন্যই তো ইহাকে আমরা কাণ্ডারী করিয়াছি, আর কে বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কাণ্ডারী হইবেন? এরূপ একনিষ্ঠ, অটল, বীরব্রত ভারতীয় সেবক কোথায় পাইব? বৈষ্ণব কবিতার ভাষায় সরকার বাহাদুরকে জোর গলায় শুনাইয়া বলা যায়—"বিনা কড়িতে এমন নফর কোথা পাবি?"[১৪]

বহির্বঙ্গে মাতৃভাষায় পড়াশোনার ব্যবস্থা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কার্যকাল শেষ হয়ে এল। বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম আর্থিক সংকট চলছে। বর্ধিত হারে মাহিনা পেয়ে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণ একে একে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে অন্যত্র

১৪. মৈমনসিংহ গীতিকা—ভূমিকা : দীনেশচন্দ্র সেন

চলে যাচ্ছেন। এদিকে স্যার আশুতোষের সঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষানীতি ও আর্থিক প্রশ্ন নিয়ে প্রবল মতবিরোধ চলছে।

"আশুতোষ যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে আসীন হলেন, তখন সারা ভারতবর্ষ গান্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত অসহযোগ আন্দোলনের প্রবল তরঙ্গে টলমল করছে। তাঁর আহ্বানে হাজার হাজার ছাত্র ইংরেজি স্কুল-কলেজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে। তাদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় কলকাতা ন্যাশনাল ইউনিভারসিটি, বিহার বিদ্যাপীঠ, কাশী বিদ্যাপীঠ, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, মহারাষ্ট্র বিদ্যাপীঠ ইত্যাদি। অসহযোগ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ভারতের সর্বত্র শিক্ষা আন্দোলন ছড়িয়ে গেল। বে-সরকারী উদ্যোগে স্থাপিত জাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রণালী প্রবর্তিত হয়। কোন কোন প্রাদেশিক সরকার শিক্ষানীতি সংশোধন করতে বাধ্য হয় এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে স্কুলের সর্বোচ্চ পরীক্ষা দেবার অধিকার দেওয়া হয়। (বোম্বাই ১৯২২ খৃঃ) (পাঞ্জাব ১৯২৪ ও বিহারে ১৯২৫ খৃঃ) মাতৃ ভাষায় শিক্ষাদান ও ম্যাট্রিকুলেশন বা স্কুলের সর্বশেষ পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা প্রচলিত হয়।"[১৫] কিন্তু স্বরাজ ও স্বদেশীয়ানার এই প্রবল জোয়ারের মাঝেও শিক্ষার বাহন, পরীক্ষার মাধ্যমরূপে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ব্যবস্থা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্ভব হয় নি।

আশুতোষের অকাল প্রয়াণ ঃ
সরকারের নিদ্রাভঙ্গ ও নেতিবাচক জবাব

পূর্বোক্ত যুক্ত ফ্যাকালটি কর্তৃক রচিত প্রবেশিকা পরীক্ষার নতুন নিয়মাবলী ১১.৬.১৯২২ তারিখে সিনেটে অনুমোদিত হয় এবং ৬.৯.১৯২২ তারিখে অনুমোদনের জন্য তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা দপ্তরে প্রেরিত হয়। দীর্ঘ দুই বছরের মধ্যে সরকার পক্ষ থেকে কোন সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। ইতিমধ্যে ৩রা এপ্রিল, ১৯২৩ তারিখে আশুতোষের উপাচার্য পদের মেয়াদ শেষ হয়। সুবোধ বালকের মতো সরকার পক্ষের আদেশ নির্দেশ মেনে চললে তাঁকে উপাচার্য পদে পুনর্বহাল করা হবে—এরূপ শর্তাধীনে উপাচার্য পদের প্রস্তাব তিনি ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করে লর্ড লিটনকে যে ঐতিহাসিক

১৫. শিক্ষা ব্যবস্থা গনতন্ত্রীকরণ সংস্থা প্রচারিত পুস্তিকা

চিঠি লিখেছিলেন এবং সিনেটে যে জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়েছিলেন, সে সম্পর্কে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক, অবশেষে ২৮.৮.১৯২৪ তারিখে নানা ওজর আপত্তি তুলে শিক্ষামন্ত্রী আবুল কাসিম ফজলুল হকের (হক সাহেব) দপ্তর থেকে যখন নেতিবাচক জবাব এল, তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের আজীবন স্বেচ্ছাসেবী সংগ্রামী সৈনিক আর ইহলোকে নেই। ঠিক তিন মাস তিন দিন আগে ২৫.৫.১৯২৪ তারিখে সেই কম্বুকণ্ঠ চিরতরে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আশুতোষের আকস্মিক অন্তর্ধানের অব্যবহিত পরেই কুম্ভকর্ণ সরকারের হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ সত্যিই অর্থবহ। জাগ্রত ব্যাঘ্রের সামনে কেই বা কখন সজ্ঞানে সশরীরে দাঁড়াতে চায়!

বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর শেষের দিনগুলি অস্বস্তিকর করে তুলেছিলেন বিদেশী গভর্নর-চ্যান্সেলর লর্ড লিটন ও তাঁর স্বজাতি শ্বেতাঙ্গ আমলাবৃন্দ। আর তাতে ইন্ধন জুগিয়েছেন শিক্ষা প্রসার নীতির বিরোধী স্বদেশী মন্ত্রীবর্গ। আশুতোষের মৃত্যুর পরে সেই লর্ড লিটন সিনেট হলে অবনত মস্তকে 'বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ সন্তান' এর স্মৃতিসভায় শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছিলেন—

> "We have assembled under the shadow of a great disaster, we stand in the presence of death, and with bowed heads and heavy hearts we have come to mourn the loss of our University's greatest son. ***
>
> Let us pay homage to the man, who, year after year, whether as Vice-Chancellor or from any equally influential position in the background, controlled and guided the college and school system which the University, through its functions, as an examining body, is called upon to administer—the man, who above all others, in the eyes of his countrymen and in the eyes of the world, represented the University so completely that for many years Sir Asutosh was in fact the University and the University Sis Asutosh. As Louis XIV could say *Letat c' eat moi*, so with equal truth could Sir Asutosh have said "I am the University."[১৬]

"বাঙ্গালীর আর এক 'বাপের বেটা' আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। এখানে যতলোক উপস্থিত আছেন, —বাঙ্গলার অলিতেগলিতে যত উকিল দু'পয়সা রোজগার করিতেছেন, —বাঙ্গালী সমাজে বি. এ. ফেল, বি. এ. পাশ, —গল্প-

১৬. C. U. Senate Minutes, 14.6.1924

লেখক, সাংবাদিক, কেরাণী, মাষ্টার যত আছেন, তাহাদের অনেকেই আশুতোষের নিকট ঋণী। এই আশুতোষ বাঙ্গলার জন্য, বাঙ্গালীর জন্য, শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাহা করিয়া গিয়াছেন পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে আর কোনো ব্যক্তি একলা তেমনটি করিতে পারেন নাই। এইরূপই আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এঁকে গ্রীক পেরিক্লেষ বা ফরাসী নেপোলিয়নের মতই জবরদস্ত ছুঁছে কর্মবীর রূপে জগতের "পূজাস্থান" বিবেচনা করি। ***বিশ্ববিদ্যালয় আজ বাঙ্গালী জাতের অতি বড় দুরাকাঙ্ক্ষা প্রচার করিয়াছে। এই দুরাকাঙ্ক্ষার আসল এবং সকলের চেয়ে সেরা উৎস হইতেছেন আশুতোষ।"[১৭]

ভাষা-শহীদ আশুতোষ

আশুতোষ বাংলা ভাষার শিক্ষক ছিলেন না; বাংলা পুস্তক ব্যবসায়ী ছিলেন না; ছিলেন না বাংলায় কোন মৌলিক সাহিত্যস্রষ্টা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করে কোনরূপে লাভবান হবার মতো কোন ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন না। অথচ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এমন অকৃত্রিম সুহৃদ, সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক, অতন্দ্র অভিভাবক দ্বিতীয় আর কেউ ছিলেন কি? আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের কথায়,—

"বঙ্গ-সাহিত্যের আশ্রয় কল্পতরু স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ কক্ষের দ্বার বঙ্গভাষার জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। নিজেকে আবিষ্কার করা হইতে বড় আবিষ্কার আর কিছু হইতে পারে না। স্যার আশুতোষ আমাদিগকে ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে দিয়া সেই সুমহান আবিষ্কারের পথ প্রদর্শন করিয়া জাতীয় ধন্যবাদের পাত্র হইয়া রহিলেন।"

তাঁর জীবনাবসানের পর তাঁর অতি স্নেহের পাত্র ছাত্র ও শিক্ষকদের স্বেচ্ছাপ্রদত্তদানে দ্বারভাঙ্গা ভবনের দ্বিতলে স্থাপিত (অধুনা ভগ্ন ও অপসৃত) আবক্ষ প্রস্তরমূর্তির গাত্রদেশে খোদিত নিম্নোধৃত স্তবকটি আশুতোষের মহান কীর্তির বাঙ্ময় স্বীকৃতি—

"His noblest achievement, surest of all,
The place for his mother-tongue, in step-mother's hall."

---

১৭. নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন—অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার

চতুর্দশ অধ্যায়

শ্যামাপ্রসাদ পর্ব

সৈনাপত্যে শ্যামাপ্রসাদ ঃ প্রবেশিকা স্তরে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ঃ কবিগুরুর স্বস্তি ও প্রশস্তি

সৈনাপত্যে শ্যামাপ্রসাদ : তাঁর প্রস্তাবক্রমে ম্যাট্রিকুলেশন রেগুলেশন কমিটি গঠন—ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নতুন বিধান—পরীক্ষার বাহন রূপে মাতৃভাষা—বিরুদ্ধবাদীদের জন্য রক্ষাকবচ—সরকারী হুমকী—সরকারের বিরূপ ও অসহযোগী মনোভাবে উপাচার্য মিঃ গ্রীভসের বিরক্তি ও ক্ষোভ—সংশোধিত আইন প্রণয়নে শ্যামাপ্রসাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা—সুধীজন কর্তৃক শ্যামাপ্রসাদের প্রশস্তি—উপাচার্য পদে শ্যামাপ্রসাদ—বাংলা ভাষা উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প—রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ—বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ছায়া—বঙ্গভূমির অঙ্গচ্ছেদ—ভাষার বন্ধন ছিন্ন—দেশ বিভাগোত্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—স্বাধীনোত্তর কালে বাংলার মাধ্যমে পড়াশোনা ও পরীক্ষাদানের পাকা ব্যবস্থা।

* * * *

পিতার হল সারা, পুত্রের হল শুরু। বাংলা ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার সংগ্রামে সৈনাপত্য গ্রহণ করলেন পরলোকগত পিতার স্থানে পুত্র শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এসব কাহিনী শতবর্ষের যুদ্ধ 'Hundred years' War' বা গোলাপের যুদ্ধ 'War of Roses' ইত্যাদি থেকে কম রোমাঞ্চকর নয়। উপাচার্য পদে নিয়োগের অনেক আগেই সিনেট সিণ্ডিকেটের সদস্যরূপে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নিয়মাবলী পরিবর্তনের কাজে হাত দিলেন। শিক্ষা ও পরীক্ষার মাধ্যমরূপে মাতৃভাষার স্বীকৃতির ইতিহাসে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার রেগুলেশন সংশোধন এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। সিণ্ডিকেট, বোর্ড অফ স্টাডিজ, উপসমিতি, যুক্ত কমিটি, সাব-কমিটি, ফ্যাকালটি, সিনেট জড়িয়ে সে এক বিরাট জবড়জং ব্যাপার। শ্যামাপ্রসাদ এই জট থেকে মূল বিষয়টি খুলে আনতে কোমর বাঁধলেন। এই একটি বিষয়ে আশুতোষের শূন্যস্থান পূরণে তিনি যত্নবান হলেন।

২৩ আগষ্ট ১৯২৪ তারিখে বঙ্গীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই বছর আগেকার চিঠির যে বিলম্বিত জবাব এল, তা ২৭শে সেপ্টেম্বর সিনেটে উত্থাপিত হয়। সেই চিঠিতে প্রস্তাবিত নতুন ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষাবিধি অনুমোদনের বিপক্ষে নানা গুরুতর আপত্তি তোলা হয়। নিচে দীর্ঘ বার পৃষ্ঠাব্যাপী চিঠির প্রারম্ভ এবং শিক্ষার মাধ্যম সম্পর্কিত খানিকটা অংশ উদ্ধৃত হল :

"21. The Registrar placed before the Senate the following letter from the Secretary to the Government of Bengal, Education Department in reply to this office letter No. G . 19 dated the 9th September 1922 regarding the proposed new regulations for the Matriculation Examination."

GOVERNMENT OF BE NGAL

EDUCATION DEPARTMENT

Education

No. 2820 *Edn.*

From : J. A. L. Swan Esq., I. C. S.,
Secretary to the Government of Bengal.

To the Registrar,
University of Calcutta
Calcutta, the 23rd August, 1924

Minister-in-Charge : The Honble Mr. Abul Kasim Fazlul Huq, M. A., B. L.

Sir,

I an direted to invite a reference to letter No. G-19, dated the 6th September, 1922, from the Registrar, University of Calcutta, to the Secretary to the Government of Bengal, Education Department on the subject of the amendment of the present Matriculation Exan.ination Regulations. The letter

was acknowledged in this Department letter No. 354T-Edn., dated the 27th October, 1922.

2. I am directed, in reply, to express at the outset the regret of the Government of Bengal in Ministry of Education that the University has been left for so long a period without orders from the Government upon this communication. It will be within the recollection of the Hon'ble the Vice-Chancellor and the Syndicate that it was during 1923 the policy of the late Ministry to introduce a Secondary Education Bill, establishing a Board or rather two Boards for the control of Secondary education up to the Matriculation stage. The introduction of the Bill was eventually found impossible ; but throughout the period during which the Secondary Board was under discussion, consideration of the University's proposals now under reference was dominated by the view that issues of such far reaching importance as those raised by the University's proposals should not be decided prior to the foundation of the Board, but should be passed on for decision to the Body immediately upon its creation. ....

* * * * *

ইত্যাদি ইত্যাদি সাতকাহন কথা পর শিক্ষার মাধ্যম ও পরীক্ষার মাধ্যম প্রশ্নে সরকার পক্ষ বেশ কড়া সুরেই বললেন :

"The Government of Bengal are impressed, as were the Commission, with the difficulties in the way of what they recognise to be the theoretically sound proposal of the University to make the Vernacular the medium of examinations as well of instruction upto the Matriculation stage. They are willing to co-operate with the University in bringing about the change desired in a gradual manner but they are not willing to invest the University with power to compel this fundamental change by according sanction to a regulation to the effect that examination should be in the Venracular unless otherwise permitted by the University. They therefore, desire to suggest to the University that it should at an early date take steps to frame a regulation to the effect recommended by the Commission *viz.* that candidates at

glad that I voice the opinion, not of the majority or of the minority but of all, for practically the report contains unanimous recommendation of the Committee."[২]

নতুন ম্যাট্রিকুলেশন বিধান : পরীক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষা

দীর্ঘ বিতর্কের পর উক্ত রিপোর্ট সিনেটের অনুমোদন লাভ করে এবং তার ভিত্তিতে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার নতুন নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে সিণ্ডিকেটকে নির্দেশ দেয়। সেই নির্দেশানুসারে সিণ্ডিকেট যে নতুন বিধান তৈরী করে তা নিম্নরূপ :—

"Instruction and examination in all subjects other than English shall be conducted in the Vernacular :
Provided that the Syndicate may, in special cases or class of cases, make exceptions to this rule or postpone its operation for a prescribed time."[৩]

বিরুদ্ধবাদীদের জন্য রক্ষাকবচ

পরিবর্তিত পরীক্ষা বিধানে পরীক্ষা-মাধ্যম সম্পর্কীয় উপরোক্ত ধারার সঙ্গে সরকারী চিঠির মর্মানুসারে আরও একটু লেজুড় জুড়ে দেওয়া হল :—

"Provided further that whenever the Managing Committee of a School, supported by at least one half of the parents or guardians concerned, desire that the medium should be a language other than the Vernacular, the Syndicate shall exempt the candidates of such School from the operation of the general rule."[৪]

তাছাড়া আসাম, দার্জিলিং ও পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুলসমূহের ছাত্রদের জন্য নিয়ম বিধি আরো শিথিল করে বলা হল—

"......examination shall be conducted in the language of instruction, or in English."

---

২. C. U. Senate Minutes, 8. 8. 1925

৩, ৪. C. U. Syndicate Minutes, 28- 5. 1926

সরকারী হুমকী

সিণ্ডিকেট নতুন নিয়মাবলী তৈরী করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য সিনেটে প্রেরণ করে ; কিন্তু নতুন পরীক্ষা বিধি সিনেটে গৃহীত হবার আগেই শিক্ষা-বিভাগ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "Report of the Committee on the teaching of English" অর্থাৎ স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা সম্পর্কে তদন্ত কমিটির রিপোর্ট পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, এবং সেই রিপোর্টে সরকারের মনোমত পরিবর্তন সাধন না করলে ম্যাটি্কুলেশন পরীক্ষার সংশোধিত নিয়মাবলী অনুমোদন করা হবে না বলে বিশ্ববিদ্যালয়কে এক চিঠিতে শাসিয়ে দেয়। সেই চিঠির ভাষা এমনই আপত্তিকর যে, সাহেব উপাচার্য স্যার ডব্লিউ. ই. গ্রীভস্ পর্যন্ত তাঁর উষ্মা চেপে রাখতে পারেন নি। নতুন পরীক্ষা বিধি ২৬. ৬. ১৯২৬ তারিখে সিনেটে গৃহীত হয়। এটিই ছিল মিঃ গ্রীভস্-এর সভাপতিত্বে শেষ সিনেট সভা। উপাচার্য হিসেবে তাঁর কার্যকাল শেষ হয়ে এল। তাঁকে সদস্যগণ আন্তরিক বিদায় সম্ভাষণ জানান। সেই বিদায় সম্ভাষণের জবাব দিতে গিয়ে মিঃ গ্রীভস্ বলেন—

"......but there is another matter which indeed I am very sorry has not been brought to fruition in my time, I mean the Matriculation Regulations. I cannot hold the Government free from blame so far as this is concerned. The regulations were practically agreed when we were told that we must lay before Government, before they would sanction them, a scheme for the improvement of the teaching of English in the Schools. I offered His Excellency the Chancellor an assurance that a scheme would be worked out but he insisted that a scheme should be placed before Government, before sanction was given. We worked out a scheme during Easter. That came before Syndicate and they quite legitimately made certain alteration, really rather minor alteration so far as I can see in the report of the Committee on the teaching of English. Imagine our surprise when we found that the Government told us in somewhat curt terms that those alteration made the report unacceptable to them and that the regulations would not be accepted until the alteration objected to are removed. That is a question that must go forward to an issue. I have worked for peace

so far as University is concerned with the Government but I am afraid that during the past few months I have found it somewhat difficult. There has been exhibited a callous indifference to the feelings of the University during the past few months and there has been a meticulous interference in many of the matters which the University itself should control, and which it is impossible.—I speak it here and I am sure with the concurrence of the ex-Vice-Chancellors who sit on my left—to control from the Secretariate."[৫]

সিণ্ডিকেট ও উপাচার্যের পক্ষ থেকে রেজিষ্ট্রার অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সরকারের দীর্ঘসূত্রতা, অনুদার দৃষ্টিভঙ্গী, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে গায়ে পড়ে সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হওয়ার মনোবৃত্তি ও অকারণ কুঁতুলেপনার সমালোচনা করে সেই চিঠির জবাব পাঠান।

আশা হতাশার দোলায়

ধৈর্যচ্যুত না হয়ে শ্যামাপ্রসাদ এই ব্যাপারে অনন্যচিত্তে লেগে রইলেন। ১৬.৬.২৬ তারিখের সিনেটে গৃহীত নতুন নিয়মাবলী সরকারের অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হলে তারা ১৪.১.২৭ তারিখে লিখিত এক চিঠিতে নতুন নিয়মাবলীতে আরো কিছু পরিবর্তনের পরামর্শ দেয়। সেই চিঠি ২১.১.২৭ তারিখের সিণ্ডিকেটে নিম্নোক্তরূপে পেশ হয়—

"39. Read a letter (No. 161-Edn. dated the 14th January, 1927), from the Secretary to the Government of Bengal, Department of Education, referring to certain clauses in the proposed new regulations for the Matriculation Examination as passed by the Senate, on the 26th June, 1926, and requesting that the proposal modified on the lines suggested may be submitted to Government.

Ordered— that the letter be printed and circulated to the members of the Syndicate, in the first instance, and brought up before the Syndicate a fortnigh hence."[৬]

---

৫. C. U. Senate Minutes, 26. 6. 1926

৬. C. U. Syndicate Minutes, 21. 1. 1927 & 2. 2. 1927

২.২.২৭ তারিখে যখন ঐ চিঠি বিবেচনার জন্য পুনরায় সিণ্ডিকেট সভায় এল, তখন সিদ্ধান্ত হল—

"*Resolved*— that the various Boards of Studies be invited to submit reports defining the limits of their subjects."[৭]

আবার সেই গোলকধাঁধা

এই সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে আবার শুরু হল বোর্ড অফ ষ্টাডিজ, ফ্যাকালটি, কমিটি, সিণ্ডিকেট ও সিনেটের গোলকধাঁধা, এবং প্রতিপদে বিরুদ্ধবাদীদের বিরোধিতা। আর তাদের প্রতিহত করতে শ্যামাপ্রসাদের সুদৃঢ় মনোবল ও প্রচণ্ড কর্মনিষ্ঠার কাহিনী।

১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে 'বোর্ড অফ স্টাডিজ' গুলি তাদের রিপোর্ট প্রদান করে। সেই সমস্ত রিপোর্ট বিবেচনা করে যথাবিহিত রেগুলেশন বা নিয়মাবলী প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩১ সালের ২১শে জানুয়ারী উক্ত কমিটি সিণ্ডিকেটের কাছে তাদের রিপোর্ট পেশ করে। সিণ্ডিকেট তখন সেই রিপোর্ট কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকালটির এক যুক্ত সভায় বিবেচনার জন্য প্রেরণ করেন। যুক্ত ফ্যাকালটির সুপারিশ ১৯৩২ সালের ২৩শে জুলাই অনুমোদনের জন্য সিনেটে উত্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় তথা বাঙালী ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই তারিখটি 'রেড লেটার ডে'—এক স্মরণীয় শুভ দিবস।

সংশোধিত আইন প্রণয়নে শ্যামাপ্রসাদের গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

কলা ও বিজ্ঞান ফ্যাকালটি তাদের যুক্ত রিপোর্টে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের ইংরেজি ব্যতীত সকল বিষয়ে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পঠন-পাঠন ও পরীক্ষাদানের অনুমতি দানের সুপারিশ করে। তিন দিন ধরে তুমুল বিতর্কের পর সামান্য সংশোধন সহ ১৯৩২ সালের ১৩ আগষ্ট প্রবেশিকা পরীক্ষার নতুন নিয়মাবলী গৃহীত হয়। নতুন নিয়মাবলীর বিরুদ্ধবাদীদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা কালে শ্যামাপ্রসাদ ধৈর্য, নিষ্ঠা, নেতৃত্ব ও বাগ্মিতা এবং সাংগঠনিক ক্ষমতার অনন্য-সাধারণ পরিচয় প্রদান করেন। 'Tiger begets tiger'—'বাঘের বাচ্চা বাঘ' বলে শ্যামাপ্রসাদ তখন থেকেই অভিহিত হতে থাকেন। এই রিপোর্ট

৭. C. U. Syndicate Minutes, 21. 1. 1927 & 2. 2. 1927

অলোচনা প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদের ঐতিহাসিক ভাষণ মাতৃভাষার ভাবী সম্ভাবনার শুভ যাত্রার সূচনা করে—

"The regulations have been long overdue. We trust that the good effects which we hope will emanate from their introduction, will be to the lasting benefit of our province. Let us recall to-day the great idealism which was behind the scheme when it was first brought forward in 1921 and let us declare that the time has come to bring this long and heated controversy to an end. This is not exactly the end, but I feel it is the beginning of the much desired policy of introducing the Vernacular as the medium of instruction and examination. You have taken a great step forward by inviting our National poet to come and help the University in the great task which lies in front of us. I am sure that we would take the fullest advantage of that co-operation and there is no reason why in time we should not reach our goal, which is nothing more or less than to give our national tongue its rightful place in the University. Let us not falter but let us go forward looking ahead to the time when our mother-tongue will be the medium not only of our Matriculation Examination but also of the highest examination of the University." ৮

শ্যামাপ্রসাদের প্রশস্তি

প্রাক্তন উপাচার্য দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এই বিষয়ে যাঁরা নেতৃত্ব দান করেছেন—তন্মধ্যে অন্যতম প্রবক্তা শ্যামাপ্রসাদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেছেন—

"Advantage must be taken of this occasion to congratulate those who are responsible for piloting this Regulation through, on the happy termination of their labours. These Regulations have been long over due and the least that we can do is to offer our heartiest congratulations to those who have been working towards this end, and among them must be mentioned the name of Mr. Syamaprasad Mookerjee who has

৮. C. U. Senate Minutes, 13. 8. 1932

done exceedingly good work in this connection as well as in connection with the Post-gtaduage Regulations.'[৯]

সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন ডাঃ হাসান স্থরাবর্দী। শ্যামাপ্রসাদকে অভিনন্দন জানিয়ে স্থরাবর্দী সাহেব বলেছিলেন—

"I should like to join my voice to that of Sir Devaprasad Sarbadhikary and the other members of the Senate who have offered their congratulations to Mr. Syamaprasad Mookerjee .... It is a great thing that we have at least made a beginning.
We know that Mr. Mookerjee is very much in the picture now-a-days and that he makes things hum. But for him, these Regulations would not have been passed to-day and we are very grateful to him for what he has done. I think he himself will derive great pleasure from the fact that he is carrying on the good work started by his father, the late Sir Asutosh Mookerjee. It must be a matter of pride to him."[১০]

নতুন ম্যাট্রিকুলেশন বিধি

যা হোক, সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা তথা দেশীয় ভাষার ব্যবহারের যে নব বিধান শেষ পর্যন্ত তৈরী হল, তা নিম্নরূপ :

"6 ...... All papers other than those on a Vernacular shall be set in the English language.

7. (1) ....

(2) Unless otherwise provided answer papers in all subjects other than English and other European languages shall be written in one or other of the Major Vernaculars, *viz.* Bengali, Urdu, Assamese and Hindi :

---

৯. C. U. Senate Minutes, 13. 8. 1932

১০. C. U. Senate Minutes, 13. 8. 1932

Provided that—

(*a*) the Syndicate may in special cases or class of cases including schools and indivisuals make exceptions to this rule or postpone its operation either in whole or in part for a prescribed time :

(*b*) candidates, whose Vernacular is a language other than a Major Vernacular, shall have the option of writing their answers in all papers other than the Vernacular paper, if any, either in English or in one of the Major Vernaculars and they shall state in their application form the language chosen :[১১]

এই সঙ্গে দার্জিলিং, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং বাংলার বাইরের অনুমোদিত স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষার মাধ্যম কি হবে তা নির্ণয়ের ক্ষমতা ঐ সব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির হাতে দেওয়া হয়। কমিটির আবেদন পেলে সিণ্ডিকেট আইনের আওতা থেকে তাদের রেহাই দেবার সিদ্ধান্ত নেবেন বলে স্থির হল।

উপাচার্য পদে শ্যামাপ্রসাদ

ইতিমধ্যে ১৯৩৪ সালের ৮ আগষ্ট শ্যামাপ্রসাদ অনধিক ৩৪ বছর বয়সে বিশ্বের বৃহত্তম বিশ্ববিদ্যালয়ের কনিষ্ঠতম উপাচার্যরূপে যোগদান করেন। প্রায় এক বছর পরে ১৯৩৫ সালের জুন মাসে অর্থাৎ সিনেটে গৃহীত হবার প্রায় তিন বছর পর নতুন প্রবেশিকা পরীক্ষা আইন সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং আরো পাঁচ বছর অর্থাৎ ১৯৪০ সাল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা নতুন আইন অনুসারে পরিচালিত হতে থাকে। এভাবে ৫০ বছর ব্যাপী অবিশ্রাম আন্দোলন শেষ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিরাশিতম বর্ষে শিক্ষার মাধ্যমরূপে প্রবেশিকা পরীক্ষায় বাংলা ভাষা স্বীকৃতি পেল।

বাংলা ভাষার উন্নয়নে শ্যামাপ্রসাদের বিভিন্ন প্রকল্প

নতুন আইন মোতাবেক শিক্ষাবিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়নের পথ সুগম করতে বিজ্ঞান ও কারিগরি শব্দের বাংলা পরিভাষা তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

---

১১. Chapter XXX-Regulatien for Matriculation Exam.

শ্যামাপ্রসাদ এই উদ্দেশ্যে নিজের সভাপতিত্বে "পরিভাষা পুস্তকাগার সমিতি" এবং চলন্তিকা-খ্যাত রাজশেখর বসুর সভাপতিত্বে "পরিভাষা কেন্দ্রিয় সমিতি" গঠন করেন। বাংলা ভাষা গল্প উপন্যাসের সীমা ছাড়িয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বাহনরূপে বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদচারণা শুরু করে।

বাংলা বানানের নৈরাজ্যে শৃঙ্খলা আনয়নের নিমিত্ত শ্যামাপ্রসাদ পরিভাষা সমিতির সঙ্গে আরো নতুন সদস্য যোগ করে কমিটি সম্প্রসারিত করেন। তাঁরা বাংলা বানানের যথাসাধ্য সংস্কার করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে "বাংলা বানানের নিয়ম" নামে পুস্তিকা প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র নতুন বানান পদ্ধতিকে স্বীকৃতি জানান ও তাঁদের রচনায় ব্যবহার করতে থাকেন। সে সময় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্বল্প মূল্যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে আনুমানিক এক শত পৃষ্ঠার গ্রন্থ রচনার এক পরিকল্পনা করেছিলেন শ্যামাপ্রসাদ।

শ্যামাপ্রসাদের উপাচার্যকাল বাংলা ভাষার উন্নয়ন ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আরো অনেক ক্ষেত্রে "প্রথম" হয়ে আছে। ১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদ বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান ও কলা বিষয়ে গ্রন্থ প্রকাশের পরিকল্পনা করেন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উপর বাংলা হরফে লিখিত গবেষণা পত্র অনুমোদনের সিদ্ধান্তও শ্যামাপ্রসাদের ইচ্ছানুসারে এই সময় থেকে কার্যকরী হয়।

১৯৩৭ সালে শ্যামাপ্রসাদের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ (ডিগ্রী বিচারে নন ম্যাট্রিক) পি. এইচ. ডি. গবেষণা পত্রের পরীক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দান

১৯৩৭ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত বার্ষিক সিনেট সভায় শ্যামাপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথকে বাংলায় সমাবর্তন ভাষণ দিতে অনুরোধ করেন। কবিগুরু সেই অনুরোধ রক্ষা করেন। "বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮০ বৎসরের ইতিহাসে ইতিপূর্বে কেহ বাংলায়, বা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষায় কেহ সমাবর্তন বক্তৃতা করেন নাই।" এই সমাবর্তন ভাষণে রবীন্দ্রনাথ মাতৃভাষাকে প্রাপ্য মর্যাদা দানে পিতা-পুত্রের নিরন্তর এবং নিরলস সাধনার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে বলেছেন—

"আমার এবং বাংলাদেশের লেখকবর্গের হয়ে আমি একথা বলব যে, আমরা নবযুগের সংস্কৃতিকে দেশের মর্মস্থানে প্রতিষ্ঠিত করবার কাজ করে আসছি। বর্তমান যুগের নূতন বিদ্যাকে দেশের প্রাণ নিকেতনে চিরন্তন করবার এই স্বতঃসক্রিয় উদ্যোগকে অনেক দিন পর্যন্ত আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় আপন আমন্ত্রণক্ষেত্র থেকে পৃথক ক'রে রেখেছেন, তাকে ভিন্নজাতীয় ব'লে গণ্য করেছেন। আশুতোষ সর্বপ্রথমে এই বিচ্ছেদের মধ্যে সেতু বেঁধেছিলেন যখন তিনি আমার মতো বাংলাভাষাচর লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক্তার উপাধি দিতে সাহস করলেন। সেদিন যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন ছিল। কারণ, ইংরেজি ভাষা সম্পর্কে কৃত্রিম কৌলিন্যগর্ব আদিকাল থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তরে অন্তরে সংস্কারগত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরভাষাশ্রিত আভিজাত্যবোধকে অকস্মাৎ আঘাত করতে কুণ্ঠিত হলেন না, বিশ্ববিদ্যালয়ের তুঙ্গ মঞ্চচূড়া থেকে তিনিই প্রথম নমস্কার প্রেরণ করলেন তাঁর মাতৃভাষার দিকে। তারপরে তিনিই বাংলা-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ধারাকে অবতারণ করলেন, সাবধানে তার স্রোতঃপথ খনন করে দিলেন। পিতৃনির্দিষ্ট সেই পথকে আজ প্রশস্ত ক'রে দিচ্ছেন তাঁরই সুযোগ্য পুত্র বাংলাদেশের আশীর্ভাজন শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ। বিশ্ববিদ্যালয়ের দীক্ষামন্ত্র থেকে বঞ্চিত আমার মতো ব্রাত্য বাংলা লেখককে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি দিয়ে আশুতোষ প্রথম রীতি লঙ্ঘন করেছেন; আজ তাঁরই পুত্র সেই ব্রাত্যতেই আজকের দিনের অনুষ্ঠানে বাংলা ভাষায় অভিভাষণ পাঠ করতে নিমন্ত্রণ করে পুনশ্চ সেই রীতিরই ছুটো গ্রন্থি এক সঙ্গে যুক্ত করেছেন। এতে বোঝা গেল বাংলাদেশে শিক্ষা জগতে ঋতু পরিবর্তন হয়েছে, পাশ্চাত্য-আবহাওয়ার শীতে আড়ষ্ট শাখায় আজ এল নব পল্লবের উৎসব।"[১২]

এভাবে পিতার আরব্ধ হোমানলে পূর্ণাহুতি দান করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে রয়েছেন।

১২. সমাবর্তন ভাষণ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৭. ২. ১৯৩৭

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বাধীনোত্তরকালে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা

* * * *

বাংলার ভাগ্যাকাশে দুর্যোগের ছায়া

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস রাজনৈতিক দুর্যোগ ও দুর্বিপাকের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে জড়িত। এর প্রতিষ্ঠা সিপাহী বিদ্রোহের ঘোরতম দুর্যোগের মাঝে ১৮৫৭ সালে। স্যার আশুতোষ যখন ১৯০৬ সালে প্রথমবার এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে নিযুক্ত হলেন, তখন সারা বাংলাদেশ বঙ্গ ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে উত্তাল। তার মাঝে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের হাল ধরে তাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে এগিয়ে নিয়ে যান। আশুতোষ দ্বিতীয় দফায় উপাচার্য পদে আসীন হলেন ১৯২১ সালে। তখন আবার সমগ্র ভারতবর্ষ অসহযোগ আন্দোলনের ঢেউতে টালমাটাল। ১৯৪০ সালে বাংলা ভাষার মাধ্যমে প্রবেশিকা পরীক্ষা চালু হবার পূর্বেই সারা পৃথিবী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারণ যজ্ঞে পরিত্রাহি ডাক ছাড়ছে। তারই বিষময় প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৩ সালে (বাংলা ১৩৫০) বাংলাদেশের আকাশ বাতাস হা-অন্ন হা-অন্ন, ফ্যান দাও ফ্যান দাও রবে বিদীর্ণ হতে থাকে। পঞ্চাশ লক্ষ নরনারী অকালে অনাহারে প্রাণ হারায়। সুতরাং যে আশা উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে প্রবেশিকা পাঠক্রম ও পরীক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ব্যবহারের দীর্ঘ আন্দোলন চলেছিল, সে সিদ্ধান্ত কার্যকরী হবার কালে বাংলাদেশের শিক্ষা, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক আকাশ ভয়াবহ দুর্যোগের ঘনঘটায় এমন আচ্ছন্ন হতে শুরু করে যে, তা নিয়ে উল্লাস প্রকাশের মানসিকতা কারো ছিল না। বরং ইতিমধ্যে মাধ্যমিক শিক্ষা বিল (Secondary Edncation Bill) মারফৎ হাই স্কুলগুলিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে নেওয়ার প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে বাদ-প্রতিবাদ ও রেষারেষির দরুণ শিক্ষা জগতে গভীর মনোমালিন্য ও তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল।

বাঙালী জীবনে এই দুঃস্বপ্নময় অমানিশার অশুভ সূচনার কিছুকাল আগে থেকেই একই ভাষাভাষী বাংলাদেশের দুই প্রধান জাতি—হিন্দু ও

মুসলমানের মধ্যে সুপ্রতিবেশীসুলভ সম্পর্কে চিড় ধরতে শুরু করেছে। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধানে তথাকথিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ছিটেফোঁটা উচ্ছিষ্টের স্বাদ পেতে না পেতেই লোভাতুর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বল্গাহীন জিহ্বায় অবিরল ভেদবুদ্ধি ও বিদ্বেষের গরল উদ্গীরণে বাংলার কমনীয় আবহাওয়া বিষাক্ত হতে শুরু করে। তার বিষাদময় পরিণতি ঘটে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগষ্ট। ভাষার বন্ধন ছিন্ন করে ধর্মের ভিত্তিতে বাংলাদেশ খণ্ডিত হল। বাংলা ভাগের ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল অপুরণীয় ক্ষতি—আকারে এবং প্রকারে উভয়তঃ। তার বিশাল এক্তিয়ার সঙ্কুচিত হয়ে বনগাঁ-বানপুর সীমান্ত থেকে আসানসোলের মধ্যবর্তী সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডে সীমিত হয়ে পড়ে। অবশ্য এই ঘটনার কিছুকাল আগেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতীক চিহ্নে বাংলায় "শ্রী" অক্ষরের বিরুদ্ধে একশ্রেণীর লোক তুমুল কোলাহল শুরু করে এবং প্রতীক চিহ্ন থেকে "শ্রী" অক্ষর দূর করে ছাড়ে। বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের শ্রী এবং সৌন্দর্যও লুপ্ত হতে শুরু করল তখন থেকে।

দেশ বিভাগোত্তর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

"The University was left with 57 colleges of all denominations. The number of schools shrunk from 2300 to 795."[১]

যে সমস্ত স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্তিয়ারের বাইরে চলে গেল তার মধ্যে অনেকগুলিই গৌরবে, ঐতিহ্যে, পঠন-পাঠনের সুনাম, কৃতিত্ব ও মর্যাদায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অলঙ্কার বলে গণ্য হতো। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কার্যতঃ শহুরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হল। বিশ্ববিদ্যালয় এতদিনে প্রকৃতই 'শ্রী' হীন হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা হল উরুভঙ্গ কুরুপতি সদৃশ।

স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে বাংলা মাধ্যম

স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম ভারতীয় আচার্য শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ১৯৪৮ তাঁর ভাষণে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষা প্রদানের প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সেই সময়ে উপাচার্য ছিলেন অধ্যাপক প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১. Convocation Address : P. N. Banerjee, 1949

—স্যার আশুতোষের জামাতা। তিনি তাঁর সমাবর্তন ভাষণ বাংলায় দেবার কথা ভেবেছিলেন শোনা যায়। যদিও কার্যক্ষেত্রে তা ঘটেনি, তবে তাঁর সমাবর্তন ভাষণ ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষাতেই প্রকাশিত ও বিতরিত হয়েছিল। তাঁর চেষ্টায় ১৯৪৯ সালে আই.এ., আই.এস.সি., বি.এ. পাঠক্রমের ইংরেজি ব্যতীত সকল বিষয় এবং বি.এস.সি. পরীক্ষার সকল বিষয় বাংলায় পঠন-পাঠন ও পরীক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

বাংলা মাধ্যমে আই. এ., আই. এস. সি., বি. এ., বি. এস. সি., বি. কম., প্রভৃতি পরীক্ষা দানের বিধান

"Candidates for the I.A., I.Sc., B.A. Pass, B.Com., L.T. and B.T. Examinations are given *the option* of writing their answer only in Bengali. English technical terms may, however, be used. The option will not be allowed in the case of answer papers in English (the answers in which must be written in English), and also in cases where there may be specific instructions in the question-paper as to the language in which the answer is to be written.

If a candidate chooses to answer any paper in Bengali he must write the whole paper in Bengali. He may, however answer one paper in Bengali and another in English in the same subject."[২]

তারপর ১৯৭২ সালে উপাচার্য ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ সেনের আমলে বি. এ., বি. এস. সির অনার্স এবং এম. এ. ও এম. এস. সি. পরীক্ষা বাংলায় দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং তদনুসারে পরীক্ষাবিধি যথোচিত সংশোধিত হয়ে নিম্নোক্ত নির্দেশ প্রচারিত হয়—

"13. Candidate for the Pre-University (Arts & Science), B.Mus., B.A. (Pass & Hons.), B.Sc. (Pass & Hons.), B.Com. (Pass & Hons.), B.Ed., M.A., M.Com. and M.Sc. Examinations shall be given the option of writing their answers in Bengali or in English.

Provided that the above option shall not be allowed in the case of answer papers in English (the answer in which must

২. Vide C.U. Regulations, 1951.

be written in English) and also in cases where there may be specific instructions in the question papers as to the language in which the answer is to be written.

Provided further that in the cases of examinations other than those mentioned above, English shall be the medium of examination in all subjects except where otherwise specifically indicated."

English technical terms shall, however, be allowed to be used when the answers are written in Bengali."

এগুলি অতি সাম্প্রতিক ঘটনা এবং স্বাধীন দেশের শিক্ষা পদ্ধতির স্বাভাবিক পরিণতি। এ ব্যাপারে পক্ষে ও বিপক্ষে যে সমস্ত কথা কাটাকাটি হয়, তা পুরনো আলোচনারই পুনরাবৃত্তি মাত্র। সুতরাং বিশদ বিবরণ নিরর্থক। তবে একথা অবশ্যই উল্লেখ্য যে ১৮৯১ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল, দীর্ঘ ৮০ বছর নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের পর ১৯৭২ সালে ঘটল তার সফল ও স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি।

জয়তু বাঙালী জাতি!
জয়তু বাংলা ভাষা ও সাহিত্য !!
জয়তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় !!!

সমাপ্ত

সহায়ক পত্রপত্রিকা ও সূত্রগ্রন্থ

১. জাতীয় সাহিত্য—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
২. আশুতোষ স্মৃতিকথা—দীনেশচন্দ্র সেন
৩. ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য—" "
৪. আশুতোষের ছাত্রজীবন—অতুলচন্দ্র ঘটক
৫. আশুতোষের শিক্ষাচিন্তা—অনিল বিশ্বাস
৬. ছাত্রদের আশুতোষ—মণি বাগচি
৭. শিক্ষাগুরু আশুতোষ—" "
৮. শিক্ষানায়ক আশুতোষ—বিনোদবিহারী চক্রবর্তী
৯. মহাপুরুষ আশুতোষ—রাখালদাস কাব্যানন্দ
১০. মনীষী আশুতোষ—অমরনাথ রায়
১১. বাংলার বাঘ আশুতোষ—ভবেশ বিশ্বাস
১২. বাংলার উচ্চ শিক্ষা—যোগেশচন্দ্র বাগল
১৩. বাংলার জন শিক্ষা— " "
১৪. বেথুন সোসাইটি— " "
১৫. বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ—বিনয় ঘোষ
১৬. বাংলার বিদ্বৎসমাজ— " "
১৭. সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র—" "
১৮. বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ
১৯. বঙ্কিম রচনা সংগ্রহ
২০. রবীন্দ্র রচনাবলী
২১. বিবেকানন্দ গ্রন্থাবলী
২২. বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা—তামসরঞ্জন রায়
২৩. নবীন সেন গ্রন্থাবলী
২৪. মাইকেল মধুসূদন গ্রন্থাবলী
২৫. পুরাতন প্রসঙ্গ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য)—বিহারীলাল সরকার
২৬. সাহিত্য সাধক চরিতমালা (রাজনারায়ণ বসু)—যোগেশচন্দ্র বাগল
২৭. বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা—বিনয় ঘোষ
২৮. মৈমনসিংহ-গীতিকা—দীনেশচন্দ্র সেন
২৯. বঙ্গবাণী—আশুতোষ সংখ্যা, ১৯২৪

৩০. সুবর্ণলেখা (বাংলা বিভাগের সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা)
৩১. শতবর্ষ স্মরণিকা—বিদ্যাসাগর কলেজ, ১৮৭২-১৯৭২
৩২. সাহিত্য ও সংস্কৃতি (আমাদের ভাষা ও সাহিত্য)
—ডঃ মুহম্মদ আবদুল হাই
৩৩. মানসী ও মর্মবাণী, আষাঢ়-শ্রাবণ, ১৩৩১
৩৪. কবির ঝঙ্কার—হরিচরণ আচার্য
৩৫. দেশ—১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৮, ২৫ মার্চ ১৯৮৯, ২৪ জুন ১৯৮৯,
৫ মে ১৯৯০
৩৬. কুশাঙ্ক (সাহিত্য ত্রৈমাসিক) ১৩৭৭—সঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ
৩৭. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ—মদনমোহন কুমার
৩৮. নয়া বাঙ্গলার গোড়া পত্তন—বিনয়কুমার সরকার
৩৯. A Nation in the Making—Sir Surendranath Banerjee
৪০. Character Sketches (Asutosh Mookerjee)
—Bipin Chandra Pal
৪১. Representative Indians—Syamaprasad Mookerjee
৪২. Sir Asutosh Mookerjee : A Study
—Prabodh Chandra Sinha
৪৩. Asutosh Memorial Volume—J. N. Samaddar
৪৪. Asutohs Mookerjee : A Biographical Study—N. K. Sinha
৪৫. Asutosh Mukhopadhyay—Sasadhar Sinha
৪৬. Asutosh Mukhopadhyay—A. P. Dasgupta
৪৭. Calcutta Review—Asutosh Number—1924
৪৮. Hundred Years of the University of Calcutta
—1857—1957
৪৯. The High Court at Calcutta Centenary Souvenir,
1862—1962
৫০. History of Education in India—S. Nurullah and
J. P. Naik
৫১. History of Bengali Language and Literature
—Dinesh Chandra Sen
৫২. Students History of India
৫৩. Sir Asutosh Mookerjee Annual Lecture—1980
—R. K. Dasupta
৫৪. Calcutta University Calendars
৫৫. Convocation Addresses

৫৬. Minutes of the Calcutta Corporation
৫৭. Report of the Calcutta University Post-graduate Enquiry Committee
৫৮. Report of the Raleigh Commission
৫৯. Report of the Sadler Commission
৬০. Proceedings of the Bengal Legislative Council. 1903
৬১. Proceedings of the Imperial Legislative Council. 1904
৬২. Speeches of Lord Macaulay with his Minutes on Indian Education—G. M. Young.
৬৩. Minutes and Proceedings of the relevant bodies of the Calcutta University viz. Senate, Syndicate, Academic Council, Faculties etc. etc.

—— * ——